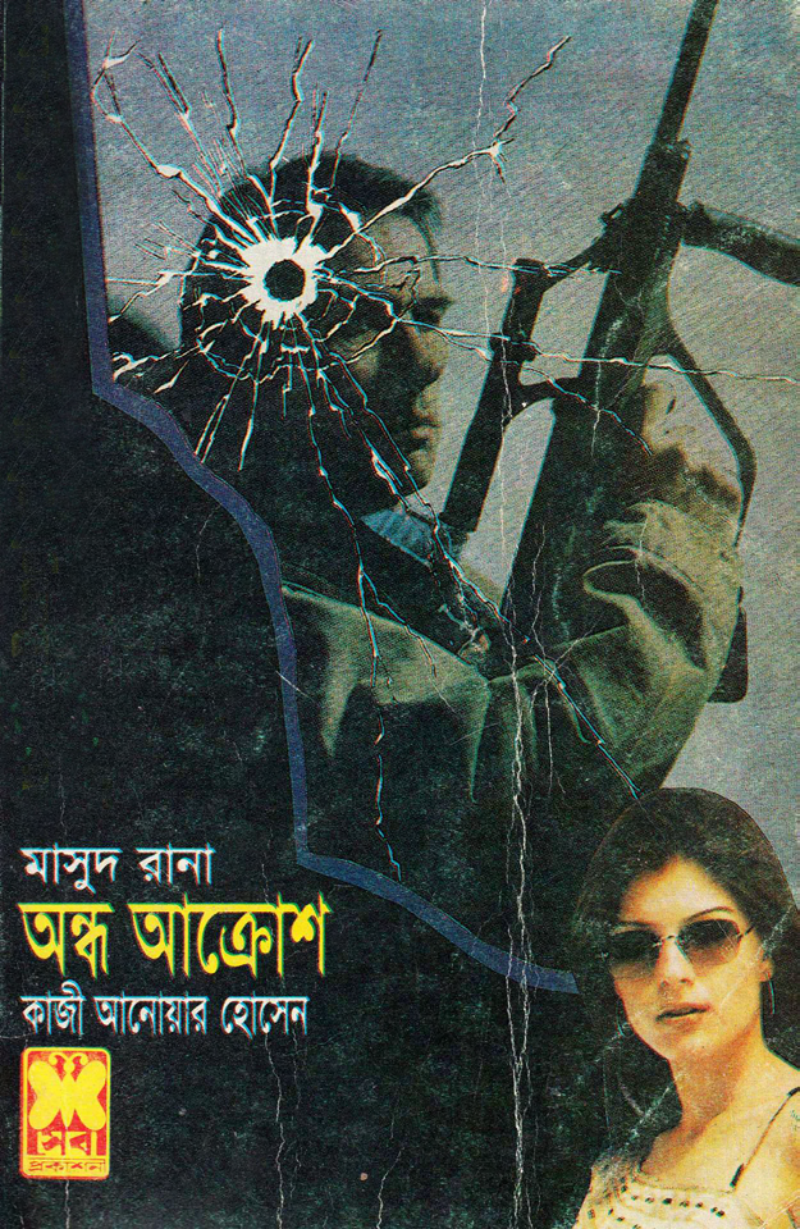


মাসুদ রানা

অন্ধ আক্রোশ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সবা প্রকাশনা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক

চাট্টিখানি কথা নয়, সব মিলিয়ে এক হাজার বিলিয়ন টাকা। একের পিঠে বারোটা শূন্য! হিসাবটা আনুমানিক, কমবেশি হতে পারে; তবে বাংলাদেশ সরকার পরিষ্কার ভাষায় পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছে যে এবার আর কোন রকম টালবাহানা করে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না–সচিব, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং সবশেষে প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে আলোচনায় বসে এর একটা চূড়ান্ত ফয়সালা অবশ্যই করতে হবে, এবং পাওনাটাও পরিশোধ করতে হবে নগদ মার্কিন ডলারে।

স্বাধীনতার পর গত দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে যৌথ সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে আলোচনায় বসার জন্যে পাকিস্তানের ওপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে আসছে বাংলাদেশ। উত্তরে ওরা বরাবরই চুপ করে থেকেছে, মুখ লুকিয়ে মুচকি মুচকি হেসেছে; যেন বলতে চায়, বুঝতেই তো পারছ দেব না, আদায় করতে পারবে না শত চেষ্টা করলেও, খামোকা লজ্জা দেয়া কেন।

কৃতিত্বটা বিসিআই-এর, প্যাঁচ কষে পাকিস্তানকে বাধ্য করার মত মোক্ষম একটা অস্ত্র বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দিয়েছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। সংশ্লিষ্ট কারও মনে আর কোন সন্দেহ থাকল না যে এবার বাংলাদেশের পাওনা মিটিয়ে দিতে রাজি হবে পাকিস্তান।

ঘটনাটা সংক্ষেপে এরকম:

মুখে যাই বলুক, এমন কি মিছিমিছি পরীক্ষার নামে আকাশে যতই মিসাইল ছুঁড়ুক, পাকিস্তান আসলে সত্যিকার অর্থে পারমাণবিক বোমা বহনে সক্ষম দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে আজও সফল হয়নি।

তবে তা না পারলেও, এর বিকল্প এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছে যার সাহায্যে ইচ্ছে করলেই চিরশত্রু ভারত সহ পৃথিবীর যে-কোন রাষ্ট্রের যে-কোন শহরে তারা পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে।

জিনিসটা হলো, হাতে বহন করা যায় এমন ছোট আকৃতির পারমাণবিক বোমা; ব্রিফকেসে ভরা যায়, ফাটানো যায় দূর থেকে লেযার বীম বা সিগন্যাল পাঠিয়ে। কিন্তু এই প্রজেক্টের কাজ পাকিস্তান বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। প্রযুক্তি তাদের নখদর্পণে, পরিমাণে কম হলেও অন্তত দশটা ব্রিফকেস-বোমা বানাবার মত ইউরেনিয়ামও মজুদ ছিল, এমন কি দুটো মোবাইল বোমা বানানোও হয়ে গেছে, ঠিক এই সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত সদ্য তৈরি ওই বোমা দুটো সহ মজুদ করা সবটুকু ইউরেনিয়াম কে বা কারা ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। সিকিউরিটি? পাকিস্তানী সিকিউরিটি সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। আগে শোনা যেত পাকিস্তান সেনাবাহিনী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী, নিজ ভাইয়ের বুকে গুলি চালাতে যে ওস্তাদ সে তো গোটা দুনিয়া দেখেছে একাত্তরে; অথচ আজ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে একটা যুদ্ধেও তারা জিততে পারেনি। ওই একই কথা ওদের সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কেও সত্যি–বলা হয় কড়া নিরাপত্তা বিধানে আইএসআই (ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স)-এর জুড়ি নেই, অথচ তাদের বিশ-বাইশজন এজেন্ট ও গার্ড সহ মিলিটারি পুলিশের একটা দলকে কচুকাটা করে ডাকাতরা দুটো ব্রিফকেস বোমা আর সমস্ত ইউরেনিয়াম নিয়ে নিরাপদে পালিয়ে গেছে।

ডাকাতি করেছে, পালিয়েও গেছে, কিন্তু এখনও পাকিস্তান ভূখণ্ড ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি; ডাকাতরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উত্তর ও উত্তর-পুবে পার্বত্য এলাকা গিলগিটের কাছাকাছি রামা-র একটা সেফ হাউসে লুকিয়ে আছে, কারাকোরাম হাইওয়ে থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে।

ঘরের মানুষই যে বিভীষণ হয়ে উঠতে পারে, বা হিংস্র বাঘকে পোষ মানাতে গেলে যে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে এই শিক্ষা আইএসআই বা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এখনও পায়নি। শোনা যায়

উলফা ছাড়াও ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী বেশ কয়েকটা গ্রুপকে আইএসআই ও পাকিস্তানী মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স দীর্ঘদিন ধরে সাহায্য করে আসছে। এই গ্রুপগুলো বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে ভারতীয় এলাকাতে অত্যন্ত তৎপর।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন পর থেকেই এরকম একটা গ্রুপকে আইএসআই রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে আসছে–বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম আর ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরার কিছু অংশ নিয়ে স্বাধীন একটা রাষ্ট্র গঠন করে দেয়া হবে। আইএসআই-এর মূল উদ্দেশ্য ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করা, সেই সঙ্গে বাংলাদেশকেও আকারে ছোট ও যতটা পারা যায় দুর্বল করা। কাজেই বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স যে সীমান্ত এলাকায় অত্যন্ত কড়া নজর রাখবে, তা না বললেও চলে। এই নজর রাখতে গিয়েই গোপন একটা তথ্য জানার সুযোগ হয় বিসিআই এজেন্টদের। বিচ্ছিন্নতাবাদী ভারতীয় বিদ্রোহীদের প্রধান নেতারা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অসম্ভব দেরি হচ্ছে দেখে সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে–অবিশ্বাস্য মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ দিয়ে আইএসআই ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কিছু অফিসারকে বিশেষ একটা কাজের জন্যে কিনে নেবে তারা। কাজটা হলো, ব্রিফকেসে ভরা অ্যাটম-বোমা চুরি করে তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। হাতে পারমাণবিক বোমা থাকলে ভারত ও বাংলাদেশকে হুমকি দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নেয়া পানির মত সোজা হয়ে যাবে। ঘুষ দেয়ার টাকা ওরা সংগ্রহ করবে ইউরেনিয়াম কিনতে এক পায়ে খাড়া একাধিক রাষ্ট্র থেকে অগ্রিম নিয়ে।

এই মূল্যবান তথ্যটা বিসআই রানা এজেন্সির ইসলামাবাদ আর কোয়েটা শাখাকে জানায়। আইএসআই ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কোন্ কোন্ ফিল্ড অফিসারের ওপর নজর রাখতে হবে তারও একটা তালিকা পাঠায়।

পাকিস্তান মিলিটারি পুলিস ও আইএসআই এজেন্টদের নিয়ে তৈরি একটা সিকিউরিটি টীমের সদস্যদের প্রহরায় বেলুচিস্তানের দুর্গম এক সামরিক ঘাঁটিতে মিনি অ্যাটম-বোমা বানানো হচ্ছিল। সিকিউরিটি টীমের সদস্যদের কিভাবে হত্যা করা হলো তা দেখার সুযোগ না

পেলেও, রানা এজেন্সির সদস্যরা তালিকাভুক্ত আইএসআই এজেন্ট ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের বেরিয়ে আসতে দেখল ওই সামরিক ঘাঁটি থেকে, সঙ্গে ছিল দুটো ব্রিফকেস আর বড় আকৃতির তিনটে স্টীল কন্টেইনার। সঙ্গে রেডিয়েশন সনাক্তকরণ ও পরিমাপক গাইগা কাউন্টার যন্ত্র থাকায় রানা এজেন্সির অপারেটররা বুঝতে পারল ব্রিফকেস দুটোয় মিনি পারমাণবিক বোমা আর কন্টেইনারগুলোয় পারমাণবিক বোমা তৈরির উপকরণ মূল্যবান ইউরেনিয়াম রয়েছে। ঢাকা থেকে পাঠানো নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল তারা–সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বোমা বা ইউরেনিয়াম ছিনিয়ে নিল না, চুপিসারে অনুসরণ করে চলে এলো পাকিস্তান-চীন ও পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি গিলগিটের রামা-য়। কারাকোরাম হাইওয়ে থেকে মাত্র তিন মাইল দূরের একটা সেফ হাউসে আশ্রয় নিল ডাকাতরা। এই বিশ্বাঘাতক আইএসআই ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসারদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়, কারণ তারা সেফ হাউস হিসেবে বেছে নিয়েছে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটা মঠকে। সন্ন্যাসীরা সবাই বৃদ্ধ, বাইরে থেকে দেখে বোঝারও উপায় নেই যে তাদেরকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে। দূরত্ব বজায় রেখে আড়াল থেকে অনুসরণ করছিল বলেই রানা এজেন্সির এজেন্টরা জানে পাকিস্তানের গৃহশত্রুরা এখানে লুকিয়ে আছে। পাকিস্তান সরকারের কোন সংস্থা বা এজেন্সি এখনও ওদের কোন হদিশ বের করতে পারেনি। তা না পারলে কি হবে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারত, চীন ও আফগানিস্তান সীমান্ত আক্ষরিক অর্থেই সীল করে দিয়েছে, ফলে সেফ হাউসে অনির্দিষ্টকাল লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে ছিনতাইকারীরা। এদিকে রানা এজেন্সির অপারেটরদেরকে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ডাকাতরা বেরুলেই যে-কোন মূল্যে ব্রিফকেস দুটো আর কন্টেইনার তিনটে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেদের সেফ হাউসে লুকিয়ে রাখতে হবে। এই নির্দেশ পাবার পর গিলগিট ও রামা-য় রানা এজেন্সির অপারেটরের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রায় তিন গুণ করা হয়েছে।

যৌথ সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারায় রাজি নই, পাকিস্তান সরকারের এই মনোভাব বলতে গেলে রাতারাতি বদলে গেল। এখন তারাই জোর

তাগাদা দিয়ে বলছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই সমস্যার মীমাংসা হওয়া দরকার। বাংলাদেশে তাদের হাই-কমিশনারকে ইসলামাবাদ নির্দেশ দিয়েছে, বাংলাদেশকে অনুরোধ করা হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তারা যেন প্রথমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন সচিবকে ইসলামাবাদে পাঠায়, তিনি এসে আলোচনার মাধ্যমে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরসূচি ও আলোচ্যসূচি চূড়ান্ত করে যাবেন; তারপর, পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে, স্থির করা হবে বাংলাদেশী প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচি—দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা একসঙ্গে বসে আলোচনার মাধ্যমে একটা মীমাংসায় পৌঁছে চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, বাংলাদেশের হাজার বিলিয়ন টাকার দাবি নিয়ে আলোচনায় বসতে হঠাৎ এমন উৎসাহী হয়ে উঠল কেন পাকিস্তান? সংক্ষেপে এর উত্তর হলো: পাকিস্তানী হাই-কমিশনারকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠিয়ে জানানো হয়, ওদের ব্রিফকেস-বোমা আর ইউরেনিয়াম কোত্থেকে কারা ডাকাতি করেছে, তারপর কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, বিসিআই তা জানে। মুখে তো বলা হয়েছেই, কিছু ফটোগ্রাফও সরবরাহ করা হয়েছে, সে-সব ফটোর একটায় দেখা গেছে বেলুচিস্তানের দুর্গম সামরিক ঘাঁটি থেকে ডাকাতরা একজোড়া ব্রিফকেস ও তিনটে স্টীল কন্টেইনার নিয়ে বেরিয়ে আসছে। জনাব হাইকমিশনারকে এ-ও জানানো হয় যে বাংলাদেশ যৌথ সম্পদের ন্যায্য ভাগ চায়, এবং আলোচনার মাধ্যমে ন্যায্য পাওনা পাবার পর ডাকাতি হয়ে যাওয়া ব্রিফকেস-বোমা ও ইউরেনিয়াম কোথায় আছে তা পাকিস্তানকে অবশ্যই অবহিত করা হবে।

যাই হোক, পাকিস্তানের উপর্যুপরি তাগাদায় পরিতৃপ্ত বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের সচিব জনাব শওকাতুল বারিকে ইসলামাবাদে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল। আর এখান থেকেই শুরু হলো একাধারে শ্বাসরুদ্ধকর ও মর্মান্তিক সম্পূর্ণ নতুন এক কাহিনী।

শুরু থেকেই কি এক রহস্যময় কারণে প্রোটোকল ও কূটনৈতিক বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে উদ্ভট আচরণ শুরু করল পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ। সব আগে থেকেই ঠিক করা ছিল: বাংলাদেশের বিমানের একটা অনিয়মিত

ফ্লাইটে সচিব শওকাতুল বারি ঢাকা থেকে সরাসরি ইসলামাবাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছাবেন; সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবেন পাকিস্তান ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এর সেক্রেটারি তৈয়াবুর রহমান।

কিন্তু প্লেনটা পাকিস্তানের এয়ারস্পেসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। প্লেনের ক্যাপটেনকে রাওয়ালপিণ্ডি এয়াপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ার জরুরী মেসেজ পাঠাল, তিনি যেন ইসলামাবাদের দিকে না গিয়ে দয়া করে পাহাড়ঘেরা চাকলালা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেন। এর কারণ জানতে চাইলে জবাব দেয়া হলো, পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, এর বেশি তারা কিছু জানে না।

ভিআইপি প্যাসেঞ্জার শওকাতুল বারির সঙ্গে আলাপ করে ক্যাপটেন চাকলালা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার আগে ইসলামাবাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ওখান থেকেও তাঁকে একই অনুরোধ করা হলো, সেই সঙ্গে জানানো হলো পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে কোন সেক্রেটারি নন, ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এর স্টেট-মিনিস্টার আশিক মেহফুজ শওকাতুল বারিকে চাকলালা এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনা জানাবেন। এ শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, অভূতপূর্বও বটে, এর আগে একজন সেক্রেটারিকে কোন প্রতিমন্ত্রী এয়ারপোর্টে এসে অভ্যর্থনা জনিয়েছেন এমন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শওকাতুল বারি শুধু বিস্মিত নন, খানিকটা উদ্বিগ্নও বটেন; ধারণা করলেন, হয়তো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির গুরুতর কোন অবনতির আশঙ্কা দেখা দেয়াতেই এত সব পরিবর্তন আনা হয়েছে। বলা যায় না, আবার হয়তো পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে।

তবে না, পাহাড়ী এলাকা চাকলালা এয়ারপোর্টে প্লেন ল্যান্ড করার পর তেমন কোন আলামত শওকাতুল বারির চোখে ধরা পড়ল না। দীর্ঘ রানওয়ে ধরে ছুটে এসে টার্মিনাল ভবনের কাছাকাছি থামল বাংলাদেশী বোয়িং। পাকিস্তান ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এর স্টেট মিনিস্টার আশিক মেহফুজ সিঁড়ির গোড়ায় স্বাগত জানালেন মেহমানকে–প্রথমে

হ্যান্ডশেইক, তাতে মন না ভরায় প্রোটোকল অগ্রাহ্য করে রীতিমত আলিঙ্গন; এ যেন অব্যক্ত বেদনার প্রকাশ, বলতে চাওয়া যে একদিন আমরা এক এবং অভিন্ন ছিলাম, ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও হৃদয়ের ভালবাসা আর আত্মার সম্পর্ক এতটুকু ম্লান হয়নি। শুধু যে আলিঙ্গন, তাও নয়, স্টেট-মিনিস্টার আশিক মেহফুজ শওকাতুল বারির গালে আরবী কায়দায় চুমোও খেতে যাচ্ছিলেন; তবে শওকাতুল বারি দু'জনের মাঝখানে দ্রুত একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে তাতে বাদ সাধছেন লক্ষ করে তাঁর মনে পড়ে গেল, একাত্তর সালে এই ভদ্রলোক শুধু ভারতে চলে যাননি, মুক্তিযুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। একটা বিরাট নিঃশ্বাস চেপে প্রতিমন্ত্রী (সাবেক মেজর) আশিক মেহফুজ বললেন, 'এদিকে, মিস্টার বারি।' ইঙ্গিতে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা ঝকঝকে কালো একটা সিতারা রোড মাস্টার কার দেখালেন, পাকিস্তানে তৈরি শক্তিশালী ও অত্যন্ত জনপ্রিয় গাড়ি।

সেদিকে পা বাড়িয়ে শওকাতুল বাড়ি জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ঘটছে বলুন তো, মিস্টার মেহফুজ? আমার ল্যান্ড করার কথা ইসলামাবাদে...'

'খুঁটিনাটি কিছু পরিবর্তন ঘটায় আমরা দুঃখিত,' গাড়ির পাশে থেমে বললেন স্টেট-মিনিস্টার আশিক মেহফুজ। 'আসলে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, বিষয়টা যেহেতু অত্যন্ত স্পর্শকাতর, আমাদের সেক্রেটারি পর্যায়ের কাউকে আলোচ্যসূচি সম্পর্কে কিছু জানানো হবে না—আমরা যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, আপাতত শুধু তারাই এ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারব। আসলে, এটা আমাদের একটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার...'

অমায়িক হেসে শওকাতুল বারি বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝলাম। তবে আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু পেলাম না। আমি রাওয়ালপিণ্ডিতে কি করছি? আমার তো ইসলামাবাদের কন্সটিটিউশন অ্যাভিনিউ-এ, আপনাদের মিনিস্ট্রি অভ ফরেন অ্যাফেয়ার্স-এ পৌঁছানোর কথা।'

হেসে উঠে দরাজ গলায় আশিক মেহফুজ বললেন, 'আরে, ভাইসাব, ওখানেই তো যাচ্ছি আমরা। বাই রোডে মাত্র আধঘণ্টা লাগবে, জনাব।'

শওকাতুল বারিও পাল্টা হেসে বললেন, 'তারমানে আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে চান না।'

আশিক মেহফুজের চোখ-মুখ একটু ম্লান দেখাল। বললেন, 'আসলে এটাও আমাদের একটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, জনাব...'

তাঁর কথা একটা পর্যায় পর্যন্ত সত্যি বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। আশপাশের পাহাড় থেকে ছুটে আসা হাই-পাওয়ারড্ স্নাইপার বুলেটটা যখন তাঁর এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল তখন সেটাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে চালিয়ে দিতে চাইলে কারও কিছু বলার থাকে না। কিন্তু এক সেকেন্ড পরই দ্বিতীয় বুলেটটা যখন শওকাতুল বারির খুলি উড়িয়ে দিল, তখন আর সেটা কেবল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার থাকে কি করে!

দু'মিনিটও পার হয়নি, সাইরেন বাজিয়ে এয়ারপোর্টের নিজস্ব অ্যামবুলেন্স ছুটে এলো। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, গুলি লাগার বিশ সেকেন্ডের মধ্যে মারা গেছেন ওঁরা। সিতারা রোড মাস্টারের সরকারী ড্রাইভারকে দেখা গেল লাশ দুটোর দিকে পিছন ফিরে বসে টারমাকের ওপর হড়হড় করে বমি করছে।

এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির এজেন্টরা জীপ নিয়ে ছুটল, একজোড়া হেলিকপ্টারও আকাশে উঠল, উদ্দেশ্য পাহাড়ে তল্লাশী চালিয়ে দেখা স্নাইপারকে ধরা যায় কিনা। তবে গুলি হবার প্রায় পনেরো মিনিট পর তাদের এই তৎপরতা কোন কাজে এলো না, ইতিমধ্যে পালিয়ে গেছে খুনী।

দুই

অ্যালেকজান্দ্রিয়া বন্দর থেকে সাত মাইল পুবে নীলনদের মোহনায় এই ডক এরিয়া সন্ধের পর দুনিয়ার সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাগুলোর একটা। এদিকের স্বাভাবিক নিয়মই হলো, সারাদিন ধরে শ্রমিক নেতাদের মধ্যে যে বিবাদ ও বিরোধ সৃষ্টি হবে তার সমাধান করা হয় সেদিনই অন্ধকার গাঢ় হবার পর–যে যাকে পারে ছুরি মেরে। অন্ধকার বলেই অনেক সময় সেমসাইড হয়ে যায়, তবে সেটাকেও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয় না–জীবন এখানে এতটাই মূল্যহীন।

নীলনদের বহু শাখা এদিকে এসে সাগরে মিশেছে, তারই একটার কিনারায় দাঁড়িয়ে ভূমধ্যসাগর দেখছে মাসুদ রানা: রেন্ট-আ কারের ক্যাডিলাকটা রেখে এসেছে মাইল খানেক পশ্চিমে। এদিকটায় আলো আছে, মোহনায় জাহাজ-স্টীমার-লঞ্চ আছে, পুব পাশে আকাশছোঁয়া বাতিঘরের মাথায় ঘুরছে সার্চলাইট, কিন্তু নদী বা সাগরে এক ফোঁটা বাতাস নেই। আজ রাতটা খুব গরম যাবে। রানার শার্ট ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে, তবু জ্যাকেটটা খুলতে পারছে না ও: ঘাড়ে সুড়সুড়ে একটা অনুভূতি ওকে মনে করিয়ে দিল, শোল্ডার হোলস্টারে রাখা ওয়ালথারটা আজ ওকে ব্যবহার করতে হতে পারে।

লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলি থেকে বেশি দূরে নয়, মরুভূমির মাঝখানে মরুদ্যানে ফেলা একটা তাঁবুতে প্রেসিডেন্ট মোয়াম্মার গাদ্দাফির সঙ্গে ছিল রানা–ছুটি কাটাতে নয়, বিসিআই-এর বিশেষ একটা প্রস্তাব ব্যাখ্যা করার কাজে; এই সময় ইসলামাবাদ থেকে প্রিয় বন্ধু সোহেল আহমেদের এক লাইনের ইমার্জেন্সী ফ্যাক্স বার্তা পৌঁছাল তাঁবুতে: 'অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে পাবলিক বুদ থেকে ঢাকায় বসকে

ফোন করো।'

সোহেল শুধু বন্ধু নয়, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরও, কাজেই তার বার্তা গুরুত্বহীন মনে করার প্রশ্নই ওঠে না। ভাগ্যিস প্রস্তাবটা ব্যাখ্যা করার কাজ আগেই সেরে ফেলেছিল রানা, মেজবান প্রেসিডেন্টের আন্তরিক আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করে বিদায় চাইতে তাই কোন বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হলো না। প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি তাঁর একজন এইডকে নির্দেশ দিলেন, সরকারী কার পুল থেকে রানাকে যেন নতুন একটা গাড়ি বের করে দেয়া হয়।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে খেজুর গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে রানা, ঝকঝকে নতুন একটা গাড়ি এসে থামল সামনে। ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এসে এইড বলল, 'একদম ব্র্যান্ড নিউ কার, সার। এরকম বহু গাড়ি বিভিন্ন কোম্পানি ও রাষ্ট্র থেকে উপহার হিসেবে আসে, কিন্তু মহামান্য প্রেসিডেন্ট খুব কমই ব্যবহার করার সময় পান। এটা মাত্র গত হপ্তায় পাকিস্তানের সরকারপ্রধান প্রেজেন্ট করেছেন।' সবিনয়ে হাসির সঙ্গে গাড়িটার চাবি বিড়সহ রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'আপনি, সার, ত্রিপোলি এয়ারপোর্টের কার পার্কে এটা রেখে গেলেই হবে, কার পুল থেকে কেউ একজন গিয়ে নিয়ে আসবে।'

বাড়ানো চাবিটার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা। ভাবছে, এত থাকতে কপালে পাকিস্তানী গাড়ি জুটল! একটা দেশের প্রেসিডেন্ট তাঁর মেহমানকে সম্মান করে জিনিসটা ব্যবহার করতে দিচ্ছেন, কাজেই প্রত্যাখ্যান বা বাছবিচার করার প্রশ্ন উঠতে পারে না; অগত্যা চাবিটা নিল রানা। নেয়ার পরও খোলা মুঠোয় পড়ে থাকা চাবিটার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে। যাই ভাবুক, চাবির গায়ে খোদাই করা বিন্দুগুলো ওর অজান্তেই অবচেতন মনে একটা ছাপ ফেলল। বিন্দুগুলোর মাঝখানে যে ফাঁক আছে, সেগুলো কল্পিত রেখা দিয়ে জোড়া লাগালে একটা বিশেষ আকৃতি তৈরি হয়। কিন্তু সেই আকৃতিটা রানার চর্মচক্ষে ধরা পড়ল না।

সেদিনই অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে পাবলিক টেলিফোন বুদ থেকে বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় ফোন করল রানা। বস্ ওকে জানালেন, সাইফুল রব্বানি নামে ছোট মাপের একজন স্মাগলার ও গ্যাম্বলারের

সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে ওকে। রব্বানির অতীত ইতিহাস, আসলে সে কোথাকার নাগরিক ইত্যাদি কিছুই জানা যায়নি। লোকটা মিশরের অ্যালেকজান্দ্রিয়া থেকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে, সরাসরি বাংলাদেশী দূতাবাসে ফোন করে হাই-কমিশনারকে একটা মেসেজ দিয়েছে। মেসেজে সে বলেছে: 'আমার কাছে বিক্রি করার মত এমন একটা তথ্য আছে যার সাহায্যে আশিক মেহফুজ ও শওকাতুল বারির হত্যা রহস্যের সমাধান পাওয়া সম্ভব...'

মেসেজটা সরাসরি হাইকমিশনারকে ছাড়া আর কাউকে দিতে রাজি না হওয়ায় সাইফুল রব্বানিকে দীর্ঘক্ষণ ফোন ধরে রাখতে হয়েছে, সে-কারণে দূতাবাস কর্মীদের ধারণা পাকিস্তানীদের আড়িপাতা যন্ত্রে নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে বা পড়বে কলটা ঠিক কোত্থেকে করা হয়েছে–অর্থাৎ মেসেজটা লিক হয়ে খুনীর কানেও পৌঁছে যেতে পারে। রাহাত খান তাঁর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্টকে রব্বানির অন্যান্য শর্তের কথাও বর্ণনা করেছেন। রব্বানি বলেছে, মাত্র একজন লোক তার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারবে। কোথায় সাক্ষাৎ হবে, এটা সে টেলিফোনে জানিয়ে দেবে। অ্যালেকজান্দ্রিয়ার থ্রী স্টার হোটেল ফিনিক্স-এ ফোন করে এস.সি.সি-র কমান্ডার ইলিয়াস মোস্তাফাকে চাইবে সে। অর্থাৎ রানাকে এই নাম নিয়ে হোটেল ফিনিক্সে উঠতে হবে। এস.সি.সি হরফ তিনটের কি অর্থ জানা যায়নি। কোন একটা সংগঠন বা বাহিনীর নামের সংক্ষেপ হতে পারে, তা না হলে হরফ তিনটের পর কমান্ডার শব্দটা যোগ হত না। তবে না, অনেক অনুসন্ধান চালিয়েও ইলিয়াস মোস্তাফা নামটা কার বা এই নামের সঙ্গে সাইফুল রব্বানির কি সম্পর্ক, কিছুই জানা যায়নি। যাই হোক, হোটেল ফিনিক্সে ফোন করে এস.সি.সি-র সেই কমান্ডার ইলিয়াস মোস্তাফাকে লাইনে পেলে রব্বানি জানাবে কিভাবে কোথায় তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব।

সব কথা জানাবার পর রাহাত খান সাবধান করে দিয়ে রানাকে বলেছেন, 'কাছাকাছি আছ বলে তোমাকে পাঠানো হচ্ছে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। অন্যতম কারণ, শওকাতুল বারি খুন হবার পর দু'হপ্তা পার হয়ে যাচ্ছে, অথচ পাকিস্তানী পুলিস বা আমাদের এজেন্টরা তদন্ত করে কিছুই জানতে পারেনি। তাই, একটা ক্লু পাওয়া খুব জরুরী।

দ্বিতীয় কারণ, রব্বানি যেভাবে যোগাযোগ করেছে তাতে খুঁতের কোন অভাব নেই–তোমার আগে, কিংবা তোমার পিছু নিয়ে খুনী বা তার লোকজন রব্বানির কাছে পৌঁছে যেতে পারে।'

'জ্বী, সার,' বলল রানা। 'কথাটা আমারও মনে হয়েছে।'

'তবে আমি সম্ভাবনাটাকে খারাপ চোখে দেখছি না,' ঢাকা থেকে বললেন রাহাত খান। 'তুমি সতর্ক, কাজেই খুনী বা তার লোক এলে তুমি ধরতে পারবে।'

এতই সহজ?–ভাবছে রানা–যেন ছেলের হাতের মোয়া আর কি! মুখে বলল, 'জ্বী, সার।'

'আবার ভাবছি, এটা একটা ফাঁদও হতে পারে: অর্থাৎ রব্বানিকেও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। সবদিক চিন্তা করে তাই তোমাকেই পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ-কাজের যোগ্য বাকি সব ক'জন কোথাও না কোথাও ইনভলভড্ হয়ে আছে...'

ফোনে ইলিয়াস মোস্তাফা অর্থাৎ রানাকে সাইফুল রব্বানি জানিয়েছে, ডক এরিয়ার ভেতরই তেরো নম্বর সেকশন ধরে বাইশ নম্বর ওয়্যারহাউসের সামনে পৌঁছাতে হবে ওকে, রাত ঠিক বারোটায়। চেহারার বর্ণনা দিয়েছে, তাকে দেখলেই রানা যাতে চিনতে পারে।

খুদে বোতাম টিপে রোলেক্সের ডায়াল এক সেকেন্ডের জন্যে আলোকিত করল রানা, বারোটা বেজে পাঁচ মিনিট। ও নদীর মোহনায় দাঁড়িয়ে থাকলেও, ডক এরিয়ার তেরো নম্বর সেকশন এটা, বাইশ নম্বর ওয়্যারহাউসটা ওর কাছ থেকে মাত্র ত্রিশ গজ পিছনে। ওদিকটায় আলো নেই, তবে অন্ধকার পুরোপুরি গাঢ়ও নয়। রানা ওদিকে নজর রাখছে প্রায় আধঘণ্টা ধরে। ওদিকে তো নয়ই, গোটা সেকশনে এখন পর্যন্ত কাউকে আসা-যাওয়া করতে দেখেনি ও। বাইশ নম্বর ওয়্যারহাউসটা বিশাল, লোহার প্রকাণ্ড গেটে জং ধরে গেছে, গেটের গায়ে ছোট্ট দরজাতেও মরচে ধরেছে। ওটা বা আশপাশের অন্য কোন ওয়্যারহাউস থেকে কোন শব্দ হয়নি, এখনও হচ্ছে না।

গোটা ব্যাপারটা সন্দেহজনক লাগছে রানার। রব্বানির আচরণে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। রানা যে সাবধানতা অবলম্বন করবে, এটা তো তার বোঝা উচিত। নদী ও সাগরের সঙ্গমস্থলে একজন নিঃসঙ্গ

লোকের দাঁড়িয়ে থাকাটা নিশ্চয়ই তার চোখে পড়ার কথা। আর চোখে পড়লে তার যাচাই করে দেখা উচিত এই লোকই হোটেল ফিনিক্স থেকে আসা ইলিয়াস মোস্তাফা কিনা। ঝুঁকি না নিয়ে যাচাই করার অনেক উপায় আছে। সে শব্দ করে ওয়্যারহাউসের দরজা খুলতে পারে। শব্দটা শুনে রানা যদি না এগোয়, কাশি দিতে পারে। এমনকি, 'মোস্তাফা!' বলে ডাকও দিতে পারে।

নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে; ঝুঁকি নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গার ত্রিশ গজের মধ্যে আসতে পেরেছে রানা, এখনও যদি সাহস করে রব্বানি বেরিয়ে না আসে, ওর ফিরে যাওয়া উচিত। তবে গরজটা যেহেতু ওদের, আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। সেটা এখানেই, ত্রিশ গজ দূরে; কাউকে দেখতে না পেলে প্রায় গাঢ় অন্ধকারে ঢুকতে রাজি নয় ও।

নদী ও সাগরের দিকে পিছন ফিরল রানা, দেখতে চায় কিছু ঘটে কিনা। লাইটার জ্বালল, অভ্যাসটা ছেড়ে দিলেও একটা সিগারেট ধরাল। কাশি পেতে কাশতেও হলো একবার।

আর ঠিক এই সময় বাইশ নয়, একুশ নম্বর ওয়েয়্যারহাউসের গেটে তৈরি ছোট্ট লোহার দরজাটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল। মাথা নিচু করে রাস্তায় বেরুল এক লোক। দীর্ঘদেহী, মাথায় ঝুঁটিবিশিষ্ট ফেজ টুপি থাকায় আরও লম্বা দেখাচ্ছে। পেন্সিল টর্চ জ্বালল লোকটা, তাক করল নিজের মুখে। পনেরো গজ দূর থেকে তার উদ্ভাসিত চেহারাটা দেখতে পেল রানা। বর্ণনা মিলে যাচ্ছে, এই লোক সাইফুল রব্বানিই। চাক্ষুষ দেখে রানার মনে হলো, এ লোক আপাদমস্তক পাঞ্জাবী।

পিস্তলের অস্তিত্ব আরেকবার অনুভব করে নিয়ে সেদিকে পা বাড়াল রানা। সুটের রঙ ছাই বা হালকা নীলও হতে পারে, পেন্সিল টর্চের ক্ষীণ আলোয় ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না। তবে শোল্ডার হোলস্টার পরেনি, পিস্তলটা গুঁজে রেখেছে কোমরের বেল্টে–কোটের বোতাম খোলা থাকায় দেখাও যাচ্ছে। পুরানো সুট, সম্ভবত ঘুমাবার সময়ও খোলা হয় না। ধীর, সাবধানী পায়ে এগোচ্ছে রানা; জানে ঠিক এরকম বিপজ্জনক অন্ধকারেই একজন এসপিওনাজ এজেন্টকে চোখ জ্বালতে হয়।

রব্বানির পিছনে একাধিক উৎস থেকে চঞ্চল নড়াচড়া টের পেল ও, টের পেল তার বামদিকেও গাঢ় অন্ধকারে আরও গাঢ় একটা সরু লম্বাটে ছায়া ক্রল করে এগোচ্ছে। টম অ্যান্ড জেরিদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে রব্বানির চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। এমন লাল চোখ খুব কম দেখা যায়, অথচ লোকটা মাতাল নয়–মাতালের চোখ এরকম বিস্ফারিত হয়ে থাকে না। ডানে-বাঁয়ে বারবার তাকাচ্ছে সে, যেন চাইছে না তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিছু ঘটুক। এরকম চোখ আরও দেখেছে রানা, মৃত্যুর থাবা থেকে বড়জোর এক পা এগিয়ে থাকে তারা।

'ইলিয়াস মোস্তাফা?' ফিসফিস করল লোকটা।

'এস.সি.সি-র কমান্ডার,' বলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

দরজার কবাট পুরোপুরি খুলে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত করল লোকটা। ওর পিছু নিয়ে সে-ও ঢুকল। পেন্সিল টর্চের আলো নেভেনি। দরজার বোল্ট লাগাবার পর আলোর সুইচ অন করল সে। বালবটা সিলিং থেকে ঝুলছে, বিশাল ওয়্যারহাউসের অল্প একটু জায়গা উজ্জ্বল হলো। মেঝেতে দোমড়ানো-মোচড়ানো খবরের কাগজ, খয়েরি রঙের খালি ঠোঙা ও ব্যাগ, বিয়ারের ক্যান ইত্যাদি ছড়িয়ে রয়েছে। বাতাসে মশলা ও কাবাবের গন্ধ। পকেট থেকে ছোট একটা বোতল বের করে দু'ঢোক ব্র্যান্ডি খেলো রব্বানি। ছিপি লাগিয়ে বোতলটা পকেটে ভরল আবার। একটু পর রানার দিকে আবার যখন তাকাল, আগের চেয়ে শান্ত আর অনেকটাই স্বাভাবিক লাগল দেখতে। রানা আন্দাজ করল পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর মত বয়স হবে তার।

'তথ্যটা, রব্বানি,' বলল ও, একটু অধৈর্যই। 'কি সেটা?'

'চাইলে আর দিয়ে দিলাম, ব্যাপারটা এত সোজা মনে করেছ?' হঠাৎ খেপে উঠল লোকটা, অন্তত দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে কথা বলার ভঙ্গি দেখে তাই মনে হলো। 'প্রথমে নগদ ত্রিশ হাজার মার্কিন ডলার চাই, আর চাই খার্তুমে পৌঁছে দেয়ার জন্যে প্রাইভেট একটা প্লেন–চার্টার করা হলেও চলবে–তারপর তথ্যটা পাবে তুমি। তার আগে নয়।'

প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবল রানা, তবে বেশিক্ষণ নয়। শওকাতুল বারির খুনীকে চিহ্নিত করতে রব্বানির তথ্য কাজে লাগলে ত্রিশ হাজার ডলার

কোন টাকাই নয়। অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় প্লেন চার্টার করতেও কোন সমস্যা হবে না। তবে খার্তুমে নিরাপদে পৌঁছানোর পর তথ্যটা দেবে রব্বানি, এটা শুনে খুশি হতে পারল না। অবশ্য তার শর্তে রাজি না হয়ে উপায়ও নেই। 'ঠিক আছে, তাই হবে,' বলল ও। 'তবে কোন রকম চালাকি করলে তার পরিণতি ভাল হবে না।'

তিক্ত হাসল রব্বানি। 'আমি এখন জান বাঁচাতে এত ব্যস্ত যে বেঈমানী করারও ফুরসত নেই।'

'টাকা দেব, প্লেনের ব্যবস্থা করব–কাজেই তথ্যটা সম্পর্কে একটা ধারণা অন্তত পেতে পারি, কি বলো?'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'না। আগে আমাকে খার্তুমে পৌঁছে দিতে হবে, তারপর অন্য কথা।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'কাল বিকেলের আগেই টাকা পাবে তুমি। তিনটের দিকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে যেয়ো...'

দ্রুত মাথা নেড়ে রানাকে চুপ করিয়ে দিল রব্বানি। 'কাল রাতে, এই সময়ে। তুমি এসে টাকা দেবে আমাকে, সঙ্গে করে এয়াপোর্টে নিয়ে যাবে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। রব্বানি বিপদের মধ্যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কি ধরনের বিপদ তা না জেনে তাকে সাহায্য করতে যাওয়াটা বোকামি হবে।

'কেন মানে?' পকেট থেকে বোতলটা বের করে আবার দু'ঢোক ব্র্যান্ডি খেলো রব্বানি। 'গোটা শহর বিছায় ভরে গেছে, দেখামাত্র কামড় দেবে আমাকে। তুমি কি পাগল হয়েছ, দিনের বেলা বাইরে বেরুব আমি?'

'বিছা মানে?' রানা বিমূঢ়। 'কাদের কথা বলছ তুমি? কি জন্যে তারা তোমার ক্ষতি করতে চায়?'

'সব প্রশ্নের জবাব এখুনি জানতে চেয়ো না,' আবার দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল রব্বানি। 'টাকা দাও, খার্তুমে নিয়ে চলো, সব জানতে পারবে।'

'ঠিক আছে, তুমি যেমন চাও।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে ঘুরতে গিয়েও রানা ঘুরল না। 'তবে কোন প্রশ্ন নয়, স্রেফ কৌতূহল।

এস.সি.সি-র মানে কি? কমান্ডার ইলিয়াস মোস্তাফাই বা কে?'

কথা না বলে হাত ইশারায় রানাকে চলে যেতে বলল রব্বানি।

দরজার বোল্টে হাত দিয়েছে রানা, পিছন থেকে রব্বানি ডাকল। 'ইলিয়াস মোস্তাফা, আরেকটা কথা। এখানে আমার যদি কিছু ঘটে, দার-এস-সালাম-এর গ্র্যান্ড মারহাবা হোটেলের হটহট বারে চলে যেয়ো। কেউ একজন যোগাযোগ করে তথ্যটা দেবে তোমাকে।'

'কোথায় খার্তুম, কোথায় দার-এস-সালাম! অনেক দূর হয়ে গেল না? তথ্যটা আসলে ঠিক কোথায়...'

'তথ্যটা যেখানেই থাক, আমার কথামত সেখানে গিয়েই সেটা পেতে হবে তোমাকে।'

'আমি তাকে চিনব কিভাবে?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'চিন্তা কোরো না,' বলল রব্বানি। 'সে-ই তোমাকে চিনে নেবে। তুমি শুধু তাকে টাকাটা দিলেই হবে, সঙ্গে সঙ্গে তথ্যটা পেয়ে যাবে তুমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়্যারহাউস থেকে অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে এলো রানা।

হোটেল ক্লিওপেট্রায় উঠেছে রানা। সকালে একটু দেরিতে ঘুম ভাঙল। ব্যাংকে গিয়ে মাস্টার কার্ড ভাঙাবার আগে পাবলিক বুদ থেকে বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় ফোন করল। বসকে না পেয়ে সোহেলের সঙ্গে রব্বানির প্রস্তাব নিয়ে কথা বলতে ষাট সেকেন্ডের বেশি সময় নিল না। ব্যাংক থেকে টাকা তোলার পর এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এক সিলেটি ভদ্রলোকের ট্র্যাভেল এজেন্সিতে এসে একটা সেসনা প্লেন চার্টার করল। এ-সব কাজ সারার পরও রব্বানির ওয়্যারহাউসে যাবার আগে ওর হাতে আট ঘণ্টা সময় রয়েছে। হোটেলে ফিরে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল, তারপর কফির অর্ডার বাতিল করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অ্যালার্মের শব্দে রাত ন'টায় ঘুম ভাঙল রানার। ইন্টারকমে অর্ডার দেয়া রুম সার্ভিসের ডিনার খেতে সময় নিল পুরো এক ঘণ্টা। রিসেপশনে ফোন করে রেন্ট-আ-কার থেকে নতুন একটা গাড়ি আনিয়ে

রাখতে বলল–পাজেরো জীপ কিংবা ল্যান্ড রোভার হলে ভাল হয়।

ঠিক সাড়ে দশটায় পাজেরো নিয়ে রওনা হলো রানা। মাত্র সাত মাইল দূরত্ব পেরোতে হবে ওকে, হাতে সময় রয়েছে দেড় ঘণ্টা। শহরের ভেতরে ও বাইরে ঘোরাফেরা করে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নিল–না, কেউ ওকে অনুসরণ করছে না।

পাঁচশো গজ দূরে পাজেরো রেখে পায়ে হেঁটে রাত ঠিক বারোটায় একুশ নম্বর ওয়্যারহাউসের সামনে পৌঁছাল রানা। ওর হাতে একটা অ্যাট্যাশে কেস, তাতে ত্রিশ হাজার ডলার। আজও রানা পিস্তল নিয়ে এসেছে, তবে হোলস্টার পরেনি–কোমরের বেল্টে গুঁজে রেখেছে ওটা, শিরদাঁড়ার কাছে।

পার্থক্যটা চোখে লাগার মত। রাস্তাটা কালকের মত অন্ধকার নয় আজ। একুশ নম্বর ওয়্যারহাউসের গেটের কপালে ওটা দুশো পাওয়ারের বালব। দ্বিতীয় চমক, গেটের গায়ের ছোট্ট দরজা নয়, গেটটাই একটু খুলে গেল; এবং বাইরে পা রাখল রব্বানি নয়, অন্য এক লোক।

এই লোকটা রব্বানির মত লম্বা নয়, তবে চওড়া; পরনে ঢোলা সালোয়ার আর হাঁটু ছাড়িয়ে নেমে আসা শার্ট। নাক-চোখ আর চিবুক সাক্ষ্য দিচ্ছে, এ মিশরীয়।

লোকটা কোন কথা না বলে পরিচ্ছন্ন দাঁত বের করে হাসল, বাঁ হাত দিয়ে ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলছে; তার ডান হাত, রানা খেয়াল করল, বোতাম খোলা ঢোলা শার্টের ভেতর ঢুকে বগল চুলকাবার ভান করছে–আসলে শোল্ডার হোলস্টারে ভরা পিস্তলের বাঁট ধরে আছে। গেটের ভেতরটা অন্ধকার, সেখান থেকে আরেকজন বেরিয়ে এসে লোকটার পাশে দাঁড়াল। এ লম্বা, সালোয়ার আর শার্ট পরেছে, মাথায় সুতি ক্যাপ। সঙ্গে হোলস্টার নেই, তবে কোমরে জড়ানো বেল্টে আটকানো খাপে বড় আকৃতির ছোরা আছে। এও স্থানীয়।

দ্বিতীয় লোকটাই কথা বলল, 'জনাবের নাম কি মোস্তাফা?-ইলিয়াস মোস্তাফা?'

কথা না বলে লোক দু'জনকে আরও কয়েক সেকেন্ড খুঁটিয়ে দেখল রানা, তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'এস.সি.সি-র কমান্ডার।' খুঁটিয়ে দেখার

জন্যে সময় নেয়াটা ভান, রানা আসলে কান পেতে একটা শব্দ শুনতে চেষ্টা করছে। একটু সন্দেহ জেগেছে, কান পাতার ফলে নিশ্চিত হতে পারল। প্রায় নিঃশব্দ পায়ে ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে আরেক লোক।

তবে একই সঙ্গে এ-ও রানা লক্ষ করল যে নিজেকে এস.সি.সি-র কমান্ডার বলে উল্লেখ করায় লোকগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।

'আপনি সাইফুল রব্বানির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।'

দ্বিতীয় লোকটাই কথা বলছে। এটা তার প্রশ্ন নয়, স্রেফ উল্লেখ। 'হ্যাঁ,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে প্রথম অর্থাৎ মোটা লোকটার দিকে, যার একটা হাত এখনও শার্টের ভেতর বগল চুলকাবার ভান করছে। 'কোথায় সে?'

দ্বিতীয়, অর্থাৎ লম্বা লোকটা হাসল। 'রব্বানি আছে, জনাব। আপনার সঙ্গে তার দেখা হবে। ইতিমধ্যে আসুন নিজেদের আমরা চিনি। আমি আকমল বিন কাইউম।' তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো, বোঝাই যায় জোরাল কোন প্রতিক্রিয়া আশা করছে। 'আর ও হচ্ছে আমার ডান হাত, ফাহিম। আর আমার বাঁ হাত, নাসির, আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে...'

'রব্বানি যদি থাকে,' বাধা দিয়ে বলল রানা, পরিচয়-পর্বটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, 'কোথায় সে?'

কাইউম বদলা নিল রানার প্রশ্নটাকে গুরুত্ব না দিয়ে। নিজের বুকে একটা আঙুল ঠেকাল সে। 'ডক এরিয়ার তেরো নম্বর সেকশনের বাদশা আমি। এক হাজার ডক শ্রমিক, ওয়্যারহাউসের একশো মালিক, দেড়শো স্মাগলার আমাকে হররোজ নজরানা দেয়। আমি বলতে চাইছি, আমাকে আপনি হালকাভাবে নিলে ভুল করবেন।'

'আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা, আচরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে লোকটাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে রাজি নয়। 'রব্বানি কোথায়?'

কাইউম ভান করল রানার প্রশ্ন শুনতে পায়নি। 'রব্বানি আমার সেকশনে ছোটখাট মাল টানাটানির কাজ করে খাচ্ছিল, ভালই ছিল; হঠাৎ শুনি কি, ব্যাটা ছুপা রুস্তম! আমার ধারণা ভুল, শালা খুব গভীর জলের মাছ! আমার এখানে আসার আগে দার- এস-সালামে সে নাকি

বিরাট বড় একটা দাঁও মারার তালে ছিল। দাঁও মারবি, ভাল কথা, মার–কিন্তু তাই বলে এক লাফে মিলিওনেয়ার হতে হবে? বিশ লাখ মার্কিন ডলার! কেউ বিশ লাখ খেতে চাইলে তাকে দু'লাখ খরচা করে মেরে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, তাই না? কিন্তু বোকাটার মাথায় এই চিন্তা আসেনি। যখন এলো, পালাতে দিশা পেল না। সোজা এখানে।'

'বিশ লাখ ডলার একা খেতে চাইল রব্বানি–কার কাছ থেকে?' রানার দরকার তথ্য।

'খেতে চাইলেই কি খাওয়া যায়, পুঁটি মাছের মুখ কি অত বড়!' হাসল ডক এরিয়ার কুলি-সর্দার। 'কার কাছ থেকে খেতে চেয়েছিল জানি না। কেন খেতে চেয়েছিল তা-ও জানি না। রব্বানির মত ব্ল্যাকমেইলার খুব কমই দেখা যায়–কাশে, কিন্তু ঝেড়ে কাশে না। বলছে, ঠিকমত কায়দা করতে পারলে বিশ লাখ কেন, আরও বেশি কামাতে পারত। কিন্তু মোটা টাকার প্রতি এখন নাকি তার লোভ নেই–হা-হা-হা!'

'এখনকার পরিস্থিতিটা কি?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি রব্বানির সঙ্গে দেখা করতে পারব, না কি পারব না?'

'এখনকার পরিস্থিতি পানির মত সোজা, রব্বানি যেখান থেকে টাকাটা কামাতে পারত সেখান থেকে আমার কাছে খবর পাঠানো হয়েছে। এস.সি.সি-র কমান্ডার ইলিয়াস মোস্তাফাকে রব্বানি একটা তথ্য বিক্রি করতে যাচ্ছে–আমি, আকমল বিন কাইউম, এই বেচাকেনাটা ঠেকাতে পারলে নগদ দু'লাখ ডলার পুরস্কার পাব।'

'রব্বানি টাকাটা কোত্থেকে কামাতে যাচ্ছিল?' এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরা সম্ভব কিনা সেটা পরের কথা, এই মুহূর্তে তথ্য সংগ্রহ করাটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে রানার।

''কোত্থেকে বা কার কাছ থেকে কামাতে যাচ্ছিল, এ-সব প্রশ্নের উত্তর তো, জনাব, আপনি দেবেন,' কর্কশ শব্দে হেসে উঠে বলল কাইউম। 'কারণ রব্বানি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আপনাকে জানিয়েছে।'

'রব্বানি আমাকে কিছুই জানায়নি,' বলল রানা, চেহারা ও কণ্ঠে ইচ্ছা করেই কঠিন ও বেপরোয়া একটা ভাব ধরে রাখছে।

'আমাকে যা জানিয়েছে সেটা বিশ্বাস করার মত নয়,' বলল কাইউম। 'বলছে সে ভারতীয় এজেন্টদের কাছে তথ্য বিক্রি করে। দূর, দূর!'

'তার সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি,' বলল রানা। 'এখুনি।'

কাইউমের মুখ থেকে হাসি-হাসি ভাবটা মুছে গেল। 'ঠিক আছে, জনাব,' গম্ভীর গলায় বলল। 'করুন দেখা।' ইঙ্গিত পেয়ে তার পাশের মোটা লোকটা গেটের ভেতর ঢুকে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

এক মিনিটও পার হলো না, মোটা লোকটার সঙ্গে জিনস ও টিশার্ট পরা আরেক লোককে দেখা গেল, দু'জন মিলে ধরাধরি করে গেট দিয়ে বের করে আনল রব্বানিকে। রানার পাঁচ ফুটের মধ্যে এনে পাকা রাস্তার ওপর ফেলে দেয়া হলো।

'পাকিস্তানী মাল, সাইফুল রব্বানি,' বলল কাইউম, ফিকফিক করে হাসছে, গলার স্বরে তৃপ্তি বা সন্তোষ।

পায়ের সামনে পড়ে থাকা ক্ষত-বিক্ষত লাশটার দিকে তাকাল রানা; মুখে কোন ভাব নেই, পেটের পেশিতে টান ধরেছে।

'দু'লাখ ডলার অনেক টাকা, জনাব মোস্তাফা,' বলল কাইউম। 'ওই টাকাটা কামাতে হলে রব্বানির বিক্রি করা তথ্যটা আপনার কাছ থেকে ফেরত নিতে হবে আমাকে। বিশ্বাস করুন, আপনার বিরুদ্ধে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি, শুধু বলা হয়েছে কেউ যেন তথ্যটা সংগ্রহ করতে না পারে।'

'আগেই বলেছি, রব্বানি আমাকে কোন তথ্য দেয়নি।'

'আমাকে অন্তত দেয়নি, মুখের ওপর বলে দিল–দেব না।' হাসছে কাইউম। 'কিন্তু আপনাকে দিয়েছে কিনা আমি জানি না। আপনি যদি স্বীকারও করেন যে তথ্যটা রব্বানি আপনাকে দিয়েছে, এবং সেটা যদি আমাকে আপনি জানানও, তা-ও আমি বুঝতে পারব না আপনি সত্যি বলছেন, না মিথ্যে–কারণ তথ্যটা যে কি তা আমি জানি না।'

'এর মানে হলো,' ধীরে ধীরে বলল রানা, 'দু'লাখ ডলারের বিনিময়ে তোমাকে তথ্য বেচাকেনা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, নির্দেশ দেয়া হয়েছে রব্বানি আর আমাকে খুন করার।'

ফিরে এসে পাশে দাঁড়ানো মোটা সাগরেদের পেটে কনুই দিয়ে

গুঁতো মারল কাইউম। 'জনাব মোস্তাফার খুলির ভেতর ঘিলু কিছু কমই আছে, তাই না? সারমর্ম বুঝতে দেরি করে। বললাম না, আমার ওপর শুধু তথ্য পাচার বন্ধ করার নির্দেশ আছে!'

'এই ইলিয়াস মোস্তাফাটা কে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এস.সি.সি-র কমান্ডার? এটা রব্বানির দেয়া আমার পরিচয়–কিন্তু ভুয়া।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল কাইউম, তবে তার দুই সঙ্গীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল। ভাব দেখে মনে হলো, এই তিনটে হরফ ও নামটার তাৎপর্য সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই।

'তা মেরে ফেলার নির্দেশ যখন পেয়েছ, বাকি অর্ধেক কাজ সেরে ফেলো–সময় নষ্ট করছ কেন?' এই প্রথম পিছনে তাকিয়ে তৃতীয় লোকটাকে দেখে নিল রানা। প্যান্ট-শার্ট পরা ডক শ্রমিক, বেল্টের সঙ্গে আটকানো খাপে ছুরি আছে। সতর্ক লোক, রানার কাছ থেকে দশ হাত দূরে দাঁড়িয়েছে।

'জনাব, আপনাকে দয়া করে একটু গেটের ভেতর ঢুকতে হবে যে,' বিনয়ের অবতার সেজে বলল কাইউম, আসলে বিদ্রূপ করছে। 'ওখান থেকে এই নির্দেশও এসেছে যে মাংস থেঁতলে, হাড় গুঁড়ো করে জেনে নিতে হবে ঠিক কি বা কতটুকু আপনি জানেন।'

প্রথম লোকটা, সর্দার কাইউমের ডান হাত, নড়ল না, আগের মতই বগল চুলকাচ্ছে। পিছন থেকে রানার পাশে চলে এলো ডক শ্রমিক নাসির, হাতে এরইমধ্যে ছুরি বেরিয়ে এসেছে। কাইউমের আরেক সঙ্গী, রব্বানির লাশ বের করে আনতে ফাহিমকে যে সাহায্য করেছিল, রানার আরেক পাশে এসে দাঁড়াল–হাতের ছুরি ঘন ঘন শূন্যে ছুঁড়ে মুঠোয় ধরছে হাতলটা।

রানা নিজের ছুরির কথা ভাবছে। এ পরিস্থিতিতে, ওর হিসেবে, ছুরি ব্যবহার করলে মাত্র দু'জনকে খতম করতে পারবে ও; কাইউমের কাছে পিস্তল না থাকলে তাকেও সামলানো যাবে, যদি তখনও ফাহিম গুলি করে ওর খুলিটা উড়িয়ে না দেয়। না দেয়ার কোন কারণ নেই, কাজেই ছুরির খেলা দেখানোর শো বাতিল।

আপাতত বাতিল পিস্তলের খেলা দেখানও; কারণ, কাইউমের সতর্ক বডিগার্ড ফাহিম শোল্ডার হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে

রানার দিকে তুলল।

নাসির আর সঙ্গী, জিনস ও টি শার্ট পরা লোকটা, রানার দু'পাশ থেকে এগিয়ে আসছে। হাতল ধরার ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে ছুরি মেরে ওকে তারা আহত করতে চায়, অন্তত এখুনি খুন করতে চায় না। মুখে যাই বলুক, কাইউমের ওপর হয়তো নির্দেশ আছে মেরে ফেলার আগে রানাকেও কথা বলাতে হবে–রব্বানির মত।

প্রথম হামলাটা চালাল নাসির, উদ্দেশ্য আড়াআড়িভাবে পেট চিরে রানার নাড়ীভুঁড়ি বের করা। ঝাঁকি খেয়ে এক পা পিছাল রানা, ছুরির ফলা জ্যাকেট চিরে বেরিয়ে গেল। ওর ধারণা ভুল, সরাসরি খুন করতে চাইছে ওরা। কিন্তু শিরদাঁড়ার কাছে হাত নিয়ে যাবার সময় পাওয়া গেল না, নাসিরের সঙ্গে টি শার্ট লাফ দিয়ে সামনে পড়ে ছুরি চালাল। এবারও একপাশে সরে আঘাতটা এড়াল রানা, পাশ ঘেঁষে ছুটে যাবার সময় হাতের ভারী অ্যাট্যাশে কেস দিয়ে ধাম করে লোকটার মুখে বাড়ি মারল। লোকটা গুঙিয়ে উঠে আছাড় খেলো, ছুরি ফেলে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে রাস্তার ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। রানার ভাগ্যই বলতে হবে, অ্যাট্যাশে কেসের একটা কোণা সরাসরি চোখে লাগায় ওটা ফেটে বা গলে গেছে।

নাসির দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই, সঙ্গীর সঙ্গিন অবস্থা দেখে প্রচণ্ড একটা রণহুংকার ছাড়ল সে, তারপর খেপা মোষের মত তেড়ে এলো। এবার সে ছুরি চালাল পেট লক্ষ্য করে আড়াআড়ি নয়, হৃৎপিণ্ডে গাঁথার জন্যে সরাসরি বাম বুকে।

হাতের ঢাল অর্থাৎ অ্যাট্যাশে কেস দিয়ে আঘাতটা ঠেকাবার ভান করল রানা, তবে হঠাৎ সেটা ছেড়ে দিয়ে হকচকিয়ে দিল শত্রুকে, পরমুহূর্তে তার ছুরি ধরা হাতের কব্জি ধরে নিচের দিকে টান দিল, একই সঙ্গে রাস্তায় একটা হাঁটু গেড়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে চালান করে দিল লোকটাকে। যেন ডানা গজাল, উড়ছে; এক চোখ হারানো সঙ্গীর পেটে মাথা দিয়ে পড়ল। তবে পতনটা কায়দা মত হয়নি, ঘাড় মটকানোর পরিচিত শব্দটা স্পষ্টই শুনতে পেল রানা।

'কিল! কিল হিম!' ফোঁস-ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলছে কাইউম, পনেরো হাত দূর থেকেও শুনতে পাচ্ছে রানা। 'কিল!' রানার দিকে একটা হাত

তুলে রেখেছে সে, নির্দেশ দিচ্ছে ফাহিমকে।

রিভলভারটা নিয়ে খেলছিল ফাহিম, ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি। সর্দারের নির্দেশ শুনে লক্ষ্যস্থির করছে।

গুলিটা রানার মাথায় তাক করা হয়েছে, লাগবেও; এক চোখ হারিয়ে আক্রোশে অন্ধ লোকটা ক্রল করে এগিয়ে এসে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল রানার একটা পা, ধরেই হ্যাঁচকা টান দিল। পড়ে যাচ্ছে রানা, শিরদাঁড়ায় গুঁজে রাখা পিস্তল হাতে চলে আসছে। ফাহিমের বুলেট দিক বদল না করে ওর মাথার চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

তবে পরবর্তী দৃশ্যটাকে জ্যামিতিক একটা ডিজাইন বা নকশার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

টি শার্ট রাস্তায় পড়ে ছিল, তার পাশে এখন রানাও পড়ল। তবে দু'জনেই দাঁড়াল, এবং একসঙ্গে। রানার হাতে পিস্তল, রিভলভার ফাহিমের হাতেও। শব্দ মাত্র একটা শোনা গেলেও, গুলি ওরা দু'জনেই করেছে–একই সঙ্গে। টি শার্ট নিরস্ত্র, তার সম্বল দুটো হাত; কিন্তু কাইউম নিরস্ত্র নয়, তার হাতে ছুরি আছে, সেই ছুরি সে ছুঁড়তেও ইতস্তত করল না। পিছন থেকে রানার পিঠে চড়ল টি শার্ট, দুই হাত দিয়ে গলা টিপে ধরেছে। পিঠে বোঝা, রানা সামনের দিকে ঝুঁকল, কাজেই ফাহিমের দ্বিতীয় বুলেটটাও ওর মাথার চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল–বেরিয়ে বেশি দূর আর যায় কি করে, দু'ইঞ্চি দূরে টি শার্টের চওড়া কপাল পেয়ে যাওয়ায় ফুটো তৈরি করে সেখানেই ঢুকে পড়ল। কাইউমের হাতটা ঝাঁকি খেতে দেখেছে রানা, তাই পিঠের বোঝা নিয়ে তার দিকে দ্রুত পিছন ফিরতে যাচ্ছিল–পারলও ফিরতে। ঘ্যাঁচ করে একটা শব্দ হলো–টি শার্টের পিটে গেঁথে গেছে ছোরাটা।

আর রানার গুলি? ফাহিম সরে গিয়ে নিশ্চয়ই সেটা এড়াতে পেরেছে?

রানা আসলে লক্ষ্যস্থির না করেই ট্রিগার টেনেছে। বুলেটটা ফাহিমকে লাগবে না; কিন্তু লাফ দিল সে, বুলেটটার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। ঝাঁকি খেলো শরীর, হাতের অস্ত্র ছুটে গেল, অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে খালি হাতটা তুলে নিজের বাম বুকটা ঢাকল সে, যেন গোপন একটা জিনিস চেপে রাখছে, কাউকে দেখতে দেবে না। কিন্তু আঙুলের

ফাঁক দিয়ে তাজা রক্ত ঠিকই বেরিয়ে এলো।

রানার পিঠ থেকে হড়কে নেমে গেল লাশটা, ইতিমধ্যে পুরোপুরি ঘুরে গেছে ও–ফাহিমের রিভলভার উড়তে দেখেই ডাইভ দিয়ে সেটাকে ধরে ফেলল দীর্ঘদেহী কাইউম–মাটিতে পা পড়ার আগেই রানার দিকে লক্ষ্যস্থির করছে।

রানার সমস্যা, কাইউম মারা গেলে কথা বলার আর কেউ থাকে না। ডাইভ দিয়ে শরীরটা গড়িয়ে দেয়ার সময় গুলির শব্দ গুণছে–তিন, চার···

তৃতীয় ও চতুর্থ কাইউমের করা গুলি। প্রথম ও দ্বিতীয় গুলি মরহুম ফাহিম করেছিল। গড়িয়ে দেয়া শরীর থামেনি, নিজেও একটা গুলি করল রানা, কাইউম গুঙিয়ে উঠে হাঁটু আঁকড়ে ধরল। রিভলভারটা যেহেতু ফাহিমের কাছে ছিল, স্পেয়ার বুলেট কাইউমের কাছে থাকতে পারে না, তাই রানার হিসেবে কাইউম বড়জোর আর মাত্র দুটো গুলি করতে পারবে।

মাটিতে শুয়ে কাইউমকে দাঁড়াতে দেখছে রানা। পা টলছে, তারপরও রিভলভার তুলে আরও একটা গুলি করল। রানা গুণল, পাঁচ। এগিয়ে আসছে কাইউম, খোঁড়াচ্ছে, তবে শেষ গুলিটা খরচ করছে না। রানা তার অক্ষত হাঁটু লক্ষ্য করে ট্রিগার টানল। তখুনি ঢলে পড়ল কুলি সর্দার, হাঁটুর বদলে পাঁজরে লাগল বুলেটটা।

'শিট্!' নিঃশ্বাসের সঙ্গে হিসহিস করল রানা, ছুটে এসে হাঁটু গাড়ল কাইউমের পাশে। গুলিটা ফুসফুসেই লেগেছে, তবে জোর করে বলা যায় না যে হার্টের প্রধান শিরাগুলো ছিঁড়ে দেয়নি।

'কিছু বলো,' রানার সুর নরম। 'যদি ইচ্ছে হয়।'

কাইউমের ঠোঁটের কোণে রক্ত, ঢুলু ঢুলু চোখে পলক নেই, রানার দিকে তাকিয়ে আছে।

'রব্বানি আমাকে বলেছিল–গোটা শহর বিছায় ভরে গেছে, দেখামাত্র কামড় দেবে ওকে। এর মানে কি?'

কাইউম জানে এখুনি মারা যাবে সে, তারপরও ক্ষীণ হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'আমিও তো একটা বিছা।' কাশির সঙ্গে আরও খানিকটা রক্ত বেরুল গলা থেকে। 'আসলে এই কাজটা আন্ডারওয়ার্ল্ডের

সবাইকে করার সুযোগ দেয়া হয় না। রব্বানি আমার নাগালে ছিল, আর আপনিও তার কাছে আসবেন, তাই কাজটা করার সুযোগ আমি পাই।'

'তুমিও বিছা মানে?'

'প্রস্তাবটা এভাবেই আসে–বিছা হয়ে কামড় দাও, দু'লাখ ডলার কামাও...বিছার হয়ে কামড় দাও...'

কাইউমের কাঁধ ধরে ঝাঁকাল রানা। তার চোখ নিষ্প্রাণ, স্থির হয়ে যাচ্ছে। 'বিছা হয়ে...বিছার হয়ে–কথাটা দু'রকম হয়ে যাচ্ছে না?'

'এভাবেই...শুনেছি...'

আবার ঝাঁকি দিতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা, কাইউমের মাথা একদিকে কাত হয়ে গেছে।

তিন

পরদিন ইউনাইটেড আরব এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ধরে কায়রো, সেখান থেকে প্লেন বদলে দার-এস-সালামে পৌঁছাল রানা। গ্র্যান্ড মারহাবা ফাইভ স্টার সাগরের কিনারায় মুসলিম স্থাপত্য রীতির অনুকরণে তৈরি ঠিক যেন একটা প্রাচীন দুর্গ, সমস্ত আধুনিক ফ্যাসিলিটি ও এনটারটেইনমেন্টের যাবতীয় পশ্চিমা আয়োজন সহ। এই হোটেলেরই হট হট বার-এ ওকে যেতে বলেছে রব্বানি, ও উঠলও এখানে।

দুনিয়ার প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ শহরে রানা এজেন্সির শাখা থাকায় নকল অথচ নিখুঁত কাগজ-পত্র সংগ্রহ করতে কখনোই কোন সমস্যায় পড়তে হয় না রানাকে। ত্রিপোলী থেকে অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে ইয়াসিন মোস্তাফার নামে জাল পাসপোর্ট ও ভিসা সংগ্রহ করতে হয়েছিল ওকে। তা না হলে হোটেলে ওই নামে উঠতে পারা যেত না।

রব্বানি খুন হলো, তারপর রানার হাতে মারা গেল গুপ্তা সুর্দার কাইউম আর তার তিন সাগরেদ; এরা সবাই ওকে ইয়াসিন মোস্তাফা হিসেবে চিনত, জানত অত্যন্ত গুরুতর কোন অপরাধ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে চায় ও। এরপর এই নাম ব্যবহার বা এই নামের পাসপোর্ট বহন করা একেবারেই বোকামি হবে, কারণ বিছা নিজে বা বিছার প্রতিনিধি হয়ে ভাড়াটে খুনীরা অবশ্যই নিশ্চিত হবার চেষ্টা করবে রব্বানি মারা যাবার পর তথ্যটা যাতে মোস্তাফা না পায়, বা এরই মধ্যে পেয়ে থাকলে সে যাতে প্রাণ নিয়ে আফ্রিকা মহাদেশ ত্যাগ করতে না পারে।

কিন্তু নামটা ঝেড়ে ফেলে দেয়াতেও সমস্যা আছে। মারহাবার হট হট বারে রব্বানির প্রতিনিধি হয়ে যে-ই ওর সঙ্গে দেখা করুক, সে ওর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে পাসপোর্ট দেখতে চাইতে পারে, কিংবা খোঁজ নিয়ে জানতে চেষ্টা করতে পারে কোন হোটেলে কি নামে উঠেছে ও।

সব দিক চিন্তা করে মারাত্মক ঝুঁকি আছে জেনেও রব্বানির দেয়া নামটাই ব্যবহার করছে রানা। টেলিফোনে আলাপ করার সময় সোহেলও তাই করতে বলেছে ওকে। তবে প্রতি মুহূর্তে সজাগ ও সতর্ক থাকতে বলেছে, বিপদ আসার আগেই যাতে টের পায়। খুব ভাল হতো দার-এস-সালামেও যদি রানা এজেন্সির একটা শাখা থাকত; এখানে রানা ব্যাকআপ হিসেবে কাউকে পাবে না।

নিজের সাততলা স্যুইট থেকে বেরিয়ে গ্র্যান্ড মারহাবার তিনতলায় নেমে হট হট বারে রানা ঠিক সন্ধের আগে পৌঁছাল। এক সারিতে ফেলা ফোম লাগানো একটা টুলে একটু বাঁকা হয়ে বসল ও, লক্ষ করল টেবিলগুলো শুধু ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আসা ট্যুরিস্টরা দখল করেনি, আরবী পোশাক ও ফেজ টুপি পরা আফ্রিকান মুসলমানের সংখ্যাও কম নয়। যেহেতু এটা একটা বার, সবাই কোন না কোন ধরনের লিকার পান করছে। বারটেন্ডার লোকটার দিকে তাকাবার পর হতভম্ব রানা চোখ ফেরাতে পারছে না। সেই কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, সেই রকমই মোটা, চোখ-নাক-ভুরু-কপাল-চুল থেকে শুরু করে উচ্চতা পর্যন্ত সব হুবহু এক—ইথিওপিয়ার প্রাক্তন সম্রাট ইদি আমিন।

মিলল না শুধু বত্রিশ পাটি দাঁত বের করা পরিচ্ছন্ন, সকৌতুক হাসিটা।

'জ্বী,' মাথা নত করে রানার বিস্ময় ও সংশয়কে সমর্থন জানাল লোকটা, 'আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি ইথিওপিয়ার সম্রাট–ওই যে, যে-লোকটা গর্ব করে বলেছিল মানুষের মাংস খেয়েছি; তারপর আন্দোলনের মুখে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থায় লম্বা এক ট্রেন ভর্তি করে কয়েকশো টন সোনা নিয়ে পালাচ্ছিল–তার ছেলে।'

রানা শিস বাজাল।

'সার, বললে বিশ্বাস করবেন না, লোকে আমাকেও খুন করতে চেয়েছে–তার ছেলে হবার অপরাধে। হোটেল কর্তৃপক্ষকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছে, গেটে নোটিশ সাঁটতে হয়েছে, এমনকি বেশ কিছুদিন আমার জন্যে বডিগার্ডের ব্যবস্থাও করতে হয়েছে–অবশেষে, এতদিনে মানুষ বিশ্বাস করেছে আমি প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল।' ঠকাস করে রানার সামনে শ্যাম্পেনের বোতল আর গ্লাস রাখল। 'নই সম্রাট, নই তার সন্তানও, আমি এক আফ্রিকান ভিস্তিওয়ালা বাপ আর গোয়ালিনী মায়ের সবেধন নীলমণি খুররম সাবরি...'

'খুররম সাবরি!' রানা পুনরাবৃত্তি করল, চোখজোড়া কপালে উঠে যাবার হুমকি দিচ্ছে।

জিভ দেখিয়ে কানে হাত দিল খুররম সাবরি। 'না, সার, না! যা ভাবছেন তা না। মা দুধ বেচত, বাপ বেচত পানি, তাই আমিও মানুষকে কিছু পান করাবার পেশাই বেছে নিয়েছি। কিন্তু খোদার কসম, সার, নিজে এক ফোঁটাও খাই না...'

রানা কিছু বলতে যাবে, এই সময় এলো মেয়েটা। লম্বা ও স্বাস্থ্যবতী, তবে বয়স বোঝার কোন উপায় নেই। পরনে ওটা বোরকা নয়, তবে কালো মখমল দিয়ে চোখ ছাড়া আপাদমস্তক সবটুকুই ঢাকা। পায়ের জুতো জোড়াও কালো, হাইহিল লাগানো। মখমলের বাইরে পিঠে ছড়িয়ে আছে ঘন ও কোঁকড়ানো কালো চুল, প্রায় কোমর পর্যন্ত লম্বা। মেয়েটা সুন্দরী কিনা বলা মুশকিল, তবে রহস্যের একটা অদৃশ্য জাল তাকে যেন ঘিরে রেখেছে। হেঁটে আসার ভঙ্গিটা মার্জিত হওয়া সত্ত্বেও, তার ভেতর কি যেন একটা আছে–হাত বাড়িয়ে ছুঁতে প্রলুব্ধ হবে মানুষ। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় তাকিয়ে থাকল রানা। ওর দিকে

তাকাল না, লক্ষ করল ও–ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছেও স্বীকার করবে না, তবে ক্ষীণ একটু হতাশা ছুঁয়ে গেল ওকে। বাতাসে ছড়ানো মিষ্টি সেন্টের গন্ধটা অবশ্য প্রশান্তিতে ভরে তুলল মন। বেশি দূর গেল না মেয়েটা, মাত্র একজোড়া টুল ছেড়ে তৃতীয়টায় বসল সে, কাউন্টারে ঠক করে মৃদু একটা টোকা মারল।

মেয়েটা কোন অর্ডার দিল না, তবে তাকে শেরী সার্ভ করল বারটেন্ডার সাবরি।

আবার রানার কাছে ফিরে এলো সে। রানার কৌতূহলী দৃষ্টি বারবার মেয়েটার দিকে ছুটছে, লক্ষ করে হাসল ইদি আমিনের কার্বন কপি। 'রোজ ঠিক এই সন্ধেবেলা, ঠিক এই ড্রেসে আসবে,' গলা খাদে নামিয়ে বলল রানাকে। 'টেবিলে টোকা দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আগেই বলে রেখেছে শেরী পছন্দ করে। মাত্র এক গ্লাস। তারপরই চলে যাবে।'

'রহস্যময়ী, তাই না? তুমি ওকে চেনো?'

'ওকে যারা দেখেনি, মানে, ওর পুরো চেহারা যারা দেখেনি তারা ভাগ্যবান,' কাতর খেদ প্রকাশ পেল সাবরির বলার সুরে। 'কারণ মেয়েটা এত সুন্দরী, এতই সুন্দরী, দেখলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে।'

রানার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো না দেখে সাবরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না? ঠিক আছে, এক-দেড় ঘণ্টা পর চারতলার ডান্স ফ্লোরে উঠে যান, নিজের চোখেই প্রমাণ পাবেন আমার কথা সত্যি কিনা।'

'চারতলার ডান্স ফ্লোরে···কি?'

'কি মানে?' সাবরি হাসল। 'পিয়াসা নাচে ওখানে।'

'তুমি ওর নাম জানো? সত্যি নাচে ও?' রানা এবার বিস্মিত। 'নাচেই যদি, তাহলে ঘোমটা কেন?'

'সার, ছোটমুখে বড় কথা হয়ে গেলে মাফ করে দেবেন।' খুররম সাবরি হাসছে না। 'যে যেভাবে চায় তাকে সেইভাবেই বেঁচে থাকতে দিন, প্রশ্ন তুলবেন না, বিচারও করবেন না। বলেন তো আপনার সঙ্গে পিয়াসার পরিচয় করিয়ে দিই–ও-ও তো চোরা চোখে আপনাকে বারবার দেখছে।'

হাসি চেপে রানা বলল, 'তুমি সত্যি বুদ্ধিমান, মিস্টার সাবরি। ধন্যবাদ। তবে না, আবারও ধন্যবাদ—আমি একা এগোতে চাই।'

উঠে এসে পাশের টুলে বসতে ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখল মেয়েটা। 'তোমাকে এক পেগ শেরী খাওয়াতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেন?' ঠাণ্ডা সুরে পাল্টা প্রশ্ন এলো।

'কারণ তুমি আমাকে মাল্টা দ্বীপে আনন্দে ভরা পাঁচটা মধুর দিন মনে করিয়ে দিয়েছ,' রানার জবাব। 'এবং, তোমার কাছাকাছি থাকার ইচ্ছেটাকে আমি দমন করতে পারছি না।'

সরাসরি চোখে চোখ রেখে দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত রানাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল পিয়াসা। 'ঠিক আছে,' হঠাৎ বলল সে। 'তুমিও আমাকে আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরা জিব্রাল্টারের তিনটে খুশির দিন মনে করিয়ে দিয়েছ।'

দু'জন এক সঙ্গে হেসে উঠল ওরা; রানার পুরুষালি কণ্ঠস্বর যেমন ভরাট ও ভারী, পিয়াসার সুরেলা গলায় তেমনি নূপুরের রিনিঝিনি। নিজেদের নাম বলল ওরা, দার-এস-সালামকে নিয়ে টুকটাক আলাপ করল। এই সময় রসিক বারটেন্ডার সাবরি বেরসিকের মত কাছে চলে এলো। 'সার, আপনার ফোন।'

রানার ভেতরটা গুঙিয়ে উঠল। এ সোহেল, জানে ও। ভাবল, শালার প্লেন নিশ্চয়ই আগে পৌঁছেছে। পিয়াসাকে অপেক্ষা করতে বলে টুল ছাড়ল ও, টেলিফোন বুদে ঢুকে রিসিভ করল কলটা।

'রানা?' সোহেলেরই গলা, তবে প্রায় কর্কশ ও তীক্ষ্ণ।

'বলছি। কি হয়েছে?'

'দার-এস-সালামে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারছি না,' বলল সোহেল। 'তুই আমার সঙ্গে কিং'স হর্‌ম্ রেস্টুরেন্টে দেখা কর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এয়ারপোর্টের কাছেই, চিনিস তো?'

'হ্যাঁ, চিনি।'

'তাহলে চলে আয়,' বলেই কানেকশন কেটে দিল সোহেল।

বুদে দাঁড়িয়ে থাকল রানা দশ সেকেন্ড, ভাবছে—আবার কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটেছে, কিন্তু কোথায়? প্রধানমন্ত্রীর সফর শুরু হবার আগে

কূটনীতিক ও মন্ত্রী-মিনিস্টাররা অনেকেই পাকিস্তানে আসবেন পরিবেশ পরীক্ষা ও আলোচ্যসূচি চূড়ান্ত করতে। তাঁদের কারও ওপর আবার কোন হামলা হয়নি তো?

চিন্তিত, ধীর পায়ে পিয়াসার কাছে ফিরে এলো রানা। 'দুঃখিত, আমাকে চলে যেতে হচ্ছে,' ম্লান সুরে বলল ও। 'কাজ।'

'ওহ্! আহ্!' কৃত্রিম অভিমানে সুন্দর একটা ভঙ্গিতে ঠোঁট ফোলাল পিয়াসা। 'দুঃখিত–ব্যস?'

'না, ব্যস নয়।' হেসে ফেলল রানা। 'ডান্স ফ্লোরে তোমার নাচ দেখার জন্যে ফিরে আসব আমি–মানে, যদি বিশেষ কোন কারণে আটকা না পড়ি আর কি।'

'ফিরে এলে আমার ভাল লাগবে, ইলিয়াস মোস্তাফা।' রানার চোখে চোখ রেখে হাসল পিয়াসা, হাত তুলে মুখের আবরণ খুলে ফেলল।

এক পা পিছাল রানা। এ শুধু চোখ ধাঁধানো রূপের ধাক্কা, তা নয়। 'আমি তোমাকে আমার নাম বলেছি মোস্তাফা। তুমি জানলে কি করে আমি ইলিয়াস?'

'সাইফুল রব্বানির কাছ থেকে আমি খবর পেয়েছি তুমি এখানে আসবে,' জবাব দিল পিয়াসা।

'কিন্তু তা কি করে...'

পিয়াসার চোখ-মুখ ম্লান ও বিষণ্ন হয়ে উঠল। 'কাল আমি তার ফোন পেয়েছি অ্যালেকজান্দ্রিয়া থেকে। বলল তুমি কেমন দেখতে। তারপর হুকুম করল, তার যদি কিছু ঘটে, আমি যেন সুটকেসে রাখা ফটোটা তোমার হাতে তুলে দিই।'

'সুটকেস...'

'আমাদের ফ্ল্যাটে ওর যে সুটকেসটা আছে, সেটার কথা বলছিল।'

কারণটা ব্যাখ্যা করা কঠিন, তবে পিয়াসার মত বিরল একটা সুন্দরী ও স্মার্ট মেয়েকে সাইফুল রব্বানির মত একজন লোক পেয়েছে, এটা বিস্ময়ের একটা ধাক্কার মতই লাগল রানাকে। ওর মনের ভাব নিশ্চয় চেহারাতেও প্রকাশ পেয়েছে। কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিয়াসা ওকে থামিয়ে দিল।

'তাহলে সত্যি কিছু ঘটেছে। কি?' জানতে চাইল সে।

ধীরে ধীরে সবটাই বলল রানা। ধৈর্য ধরে, শান্তভাবে শুনল পিয়াসা। চোখ দুটো ছলছল করলেও, কান্নাটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে। 'তাহলে আমাকে ফোন করার সময়ই ঘটেছে,' বিড় বিড় করে বলল সে।

'ফোন করার সময় কি ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তখনই তাকে খুন করা হয়। সে বলছিল, "ইলিয়াস মোস্তাফাকে বোলো···" এই সময় কানেকশন কেটে গেল।'

'আর কোন শব্দ পাওনি?' জনতে চাইল রানা।

মাথা নাড়ল পিয়াসা।

'এখানে টাকাটা আছে, ত্রিশ হাজার ডলার।' টুলের পাশে রাখা অ্যাট্যাশে কেসে টোকা মারল রানা। 'ফটোটা দাও আমাকে।'

'ওটা তো আমার ফ্ল্যাটে,' বলল পিয়াসা। 'শো-র পর আমার সঙ্গে দেখা কোরো তুমি। তখন দেব।'

'এখন আমি জানি, তোমার নাচ দেখতে আসতেই হবে আমাকে,' বলল রানা।

'এসো, আমার ভাল লাগবে।' স্মিত একটু হাসল পিয়াসা, মুখ ঢাকল, হড়কে টুল থেকে নেমে দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল বার থেকে।

এয়ারপোর্টের কাছাকাছি কিং'স হর্‌ম্ রেস্টুরেন্ট বাইরে প্রশস্ত চাতাল পর্যন্ত বিস্তৃত; চাঁদোয়ার নিচে রানা একটা টেবিল দখল করে বসার পাঁচ মিনিট পর অপর খালি চেয়ারটায় এসে বসল সোহেল। ধূসর রঙের কমপ্লিট সুট পরেছে, সঙ্গে একটা ব্রিফকেস, মনের উদ্বেগ-উত্তেজনা চেহারায় কোন ছাপ ফেলতে পারেনি।

'অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় কপালটা খুলল না, এর বেশি কি আর বলা যায়,' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বলল সে। 'এখন দেখ মেয়েটার কাছ থেকে কিছু পাস কিনা।'

'তুই আমার রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার জন্যে ইসলামাবাদ থেকে এখানে আসিসনি,' বলল রানা। 'ওখানে কিছু ঘটেছে।'

'খবরটা এখনও চেপে রাখা হয়েছে, মিডিয়ায় আসেনি,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সোহেল। 'ইসলামাবাদে আরও একজন খুন হয়েছেন।' রানার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে তাকিয়ে আছে।

'আমাদের, না ওদের?'

'ওদেরই, তবে আমাদেরজন ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছেন,' বলল সোহেল।

'আবার সেই এয়ারপোর্টে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কে কে ছিল?'

মাথা নেড়ে কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করল সোহেল। 'এয়ারপোর্টে নয়, খাইয়াবান-ই-সোহরাওয়ার্দি-তে। শহরের জিরো পয়েন্ট ওটা। মিলিটারি পুলিস এসকর্ট করে নিয়ে যাচ্ছিল ওদের ডিফেন্স মিনিস্টার সাহেদ কামরান খানকে। ঘটনাচক্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মিনহাজুল ইসলাম চৌধুরীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। বুলেটপ্রুফ সরকারী গাড়িতে। গাড়িটা ত্রিশ মাইল স্পীডে যাচ্ছিল। জিরো পয়েন্টের চারধারে উঁচু বিল্ডিঙের অভাব নেই, তারই একটা থেকে শর্ট-রেঞ্জ অ্যান্টি-ট্যাংক উইপন, রকেট-লঞ্চার, অর্থাৎ বাজুকা ব্যবহার করা হয়। রকেটটা লাগে পিছন থেকে, গাড়িটাকে চিরে প্রায় দু'ভাগ করে ফেলে– প্রথম ভাগে পাকিস্তানী ডিফেন্স মিনিস্টার ছিলেন, তাঁর লাশ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কারণ গাড়ির ওদিকটায় সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গিয়েছিল। দ্বিতীয় অংশেও আগুন ধরে, তবে সঙ্গে সঙ্গে নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী সাহেব অলৌকিকভাবে অক্ষত ছিলেন, হামাগুড়ি দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার সুযোগ পান। বর্তমানে তিনি সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'এরপর তো আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আর তারপরই প্রধানমন্ত্রীর ইসলামাবাদে আসার কথা, এ-সব প্রোগ্রাম নিশ্চয়ই বাতিল করা হয়েছে?'

মাথা নাড়ল সোহেল। 'ও-সব কথা পরে।' ওয়েটার কফি দিয়ে চলে গেল। 'প্রথম বারের মত এবারও ডাকযোগে একটা কমপিউটরে কম্পোজ করা মেসেজ দিয়েছে খুনী।'

কঠিন চোখে তাকাল রানা, তবে গলা শান্ত রাখল, 'আমাকে এভাবে অন্ধকারে রাখার মানে কি? শওকাতুল বারির খুনী মেসেজ

পাঠিয়েছে, আমাকে তো কেউ বলেনি।'

'বলা হয়নি ইচ্ছে করেই,' জবাব দিল সোহেল। 'বস্ তখনও সিদ্ধান্ত নেননি অ্যাসাইনমেন্টটা কাকে দেয়া হবে। কিন্তু সিচুয়েশন যেভাবে ডেভলপ করছে, বসের ধারণা তোকে ছাড়া এই ক্যাচাল থেকে আমরা বেরুতে পারব না।'

'থাক, আর ফোলাতে হবে না,' রানার গলায় ঝাঁঝ। 'মেসেজে কি বলা হয়েছে শুনি।'

কোটের পকেট থেকে ভাঁজ করা দু'টুকরো কাগজ বের করল সোহেল। 'নে। মেসেজ দুটো আমি ফটোস্ট্যাট করিয়ে এনেছি। ওপরেরটা প্রথম।'

ভাষাটা ইংরেজি, প্রথম মেসেজে খুনী যা লিখেছে তা ভাষান্তর করলে এরকম দাঁড়ায়: 'এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হলো শুধু এটা বোঝাবার জন্যে যে আমরা সিরিয়াস। অন্যান্য এম.পি, প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের অকাল মৃত্যু ঠেকাতে হলে পাকিস্তান সরকারকে পনেরো দিনের মধ্যে অবশ্যই দশ বিলিয়ন রুপি আমাদের হাতে তুলে দেয়ার সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে হবে। এই রুপি বাংলাদেশের দাবি এক হাজার বিলিয়ন টাকার তুলনায় খুবই কম, কাজেই আমাদের দাবি মেটাতে সরকারের গড়িমসি করাটা উচিত হবে না। এখানে স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে রাখা হচ্ছে, টাকা না পেলে প্রতি পনেরো দিন পর পর একটা করে লাশ পড়বে–এম.পি থেকে শুরু করে সরকারপ্রধান পর্যন্ত কেউ তালিকার বাইরে নন। এবং প্রতিটি খুনের পর দাবির পরিমাণ এক বিলিয়ন করে বাড়বে।

'আশা করা যায় আমাদের স্থাপিত দৃষ্টান্ত চাক্ষুষ করার এবং এই চিঠি পড়ার পর পাকিস্তান সরকার আমাদের দাবি এই মুহূর্তে মেনে নিয়ে দেশ ও বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ মানুষগুলোকে বাঁচতে দেবে। আমাদের দাবি মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর পার্লামেন্ট ভবনের মাথায় সাদা একটা পতাকা ওড়াতে হবে। ওই সংকেত দেখার পর ডাক বা ফ্যাক্সযোগে জানানো হবে কিভাবে আমরা টাকাটা ডেলিভারি নেব। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশী ভদ্রলোক শওকাতুল বারিকে আমরা বোনাস হিসেবে দেখছি। বোনাস পাওয়ার যে কি মজা, তা আসলে যে পায়নি তাকে

বোঝানো যাবে না।'

চিঠির শেষে কোন নাম নেই। 'বাস্টার্ড!' বিড়বিড় করল রানা। তারপর দ্বিতীয় মেসেজটা পড়ল।

সেটা হুবহু এরকম: 'সাবধান করা হয়েছিল, কিন্তু তোমরা আমাদেরকে সিরিয়াসলি নাওনি। তোমাদের ডিফেন্স মিনিস্টারকে খুন করতে হওয়ায় এখন আমাদের দাবিও বেড়ে এগোরো বিলিয়ন রুপি হয়ে গেল। ব্যাপারটা কি, নতি স্বীকার করতে পাকিস্তান সরকারের গর্বে আঘাত লাগছে বুঝি? আশা করা যাক, এ সত্যি নয়। এবার বোনাস পেলাম না...তা একটু খারাপ লাগছে বৈকি। সাদা পতাকা ওড়ে কিনা আমরা লক্ষ রাখছি।'

চেহারা থমথম করছে, চিঠি দুটো আবার পড়ল রানা। মুখ তুলে সোহেলের দিকে তাকাল। 'পাকিস্তান সরকার কি বলছে?' জানতে চাইল।

'কি বলবে, ওরা এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না,' বলল সোহেল। 'প্রথমে বলছিল, তালেবানদের কোন বিদ্রোহী গ্রুপের কাজ। এখন বলছে, এর পিছনে নিশ্চয়ই ভারতের হাত আছে। মারা যাচ্ছে মন্ত্রীরা, বিদেশী পদস্থ কর্মকর্তারা, কাজেই ওপর মহলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। বলাবলি হচ্ছে, ওদের প্রেসিডেন্ট আর প্রধানমন্ত্রী মোটেই নিরাপদ নন।'

'আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সফর বাতিল করব?' জানতে চাইল রানা।

'এই প্রশ্নই তোলা যাচ্ছে না,' বলল সোহেল, চাপা উত্তেজনা আর উদ্বেগে ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'প্রধানমন্ত্রী কেমন শক্ত আর দৃঢ় মানুষ জানিসই তো, কেউ কিছু বলার আগে নিজে থেকেই জানিয়ে দিয়েছেন—এত বছর চেষ্টার পর পাকিস্তানকে অন্তত আলোচনায় বসতে রাজি করানো গেছে, পাওনা আদায়ের এই সুযোগ হাতছাড়া করতে কোন অবস্থাতেই রাজি নন তিনি।'

'বস্ কি ভাবছেন?'

'বস্ বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর সফর শুরু হতে এখনও তো বেশ ক'টা দিন বাকি আছে, ততদিনে তুই আর আমি নিশ্চই এর একটা বিহিত

করে ফেলতে পারব।'

'তাহলে এক কাজ কর,' বলল রানা, সম্পূর্ণ শান্ত ও ঠাণ্ডা। 'এই শালা বুড়োকে ইসলামাবাদে পাঠা, আর আমরা ঢাকায় বসে টেলিফোনে ধমক দিয়ে জানতে চাই এখনও খুনী ধরা পড়ল না কেন।'

সোহেলও শান্ত ও নির্লিপ্ত একটা ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, ঢাকার ওই চেয়ারটায় কে বসবে, দোস্ত, তুই না আমি? তার পরিবর্তে আরও গম্ভীর হলো সে, রানার দিকে একটু ঝুঁকে বলল, 'আরও পিলে চমকানো খবর আছে। পরে বলছি। তার আগে বল চিঠি দুটো পড়ে তোর কী মনে হলো?'

'খুনী পাকিস্তানীদের খুন করে ক্ষমতার প্রমাণ দেখাচ্ছে,' বলল রানা। 'আর বাংলাদেশীদের খুন করে আনন্দ পাচ্ছে। এটুকু স্পষ্ট। বাংলাদেশ পাওনা টাকা চাইছে, এটা কি খুনীর রাগের কারণ হতে পারে? সে হয়তো বাংলাদেশের শত্রু।'

'টাকাটা দিতে চায় না, তাই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সফর ও আলোচনা বাতিল করানোর জন্যে পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্র নয়তো?'

মাথা নাড়ল রানা। 'পাকিস্তান সরকারের সবচেয়ে স্পর্শকাতর পার্টস্ ফাটা বাঁশের মাঝখানে আটকা পড়েছে, ভুলে গেলি? ওরাই বরং আলোচনায় বসার জন্যে তাগাদার ওপর তাগাদা দিচ্ছিল।'

'আইএসআই-এর বিদ্রোহী কোন গ্রুপ?'

'একটা বিদ্রোহী গ্রুপ তো ব্রিফকেস-বোমা ডাকাতি করে লুকিয়ে আছে, বাকি সবাই তাদেরকে খুঁজতে ব্যস্ত—বিদ্রোহ করার সময় বা সুযোগ কোথায় ওদের?' মাথা নাড়ল রানা। 'আমার ধারণা, ব্যাপারটা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র। শক্ত কোন শত্রু আছে এর পিছনে। সে বা তারা চায় না বাংলাদেশ হঠাৎ এত মোটা অঙ্কের একটা টাকা পেয়ে যাক।'

'এরকম একটা শত্রুর কথা পাকিস্তান সরকারও বলছে।'

'আচ্ছা!'

'ওরা খুব জোর দিয়ে বলছে, তাদের ধারণা খুনগুলো আইএসআই, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা করছে।'

'দূর!'

'ওদের যুক্তিগুলো আগে শোন,' বলল সোহেল। 'পাকিস্তান মন্ত্রীসভার যে-সব সদস্য সবচেয়ে বেশি ভারত বিদ্বেষী, তাদের মধ্যে স্টেট মিনিস্টার আশিক মেহফুজ ও ডিফেন্স মিনিস্টার সাহেদ কামরান খানের নাম সবার আগে আসত। পাকিস্তানীরা বলাবলি করছে, ভারত সম্ভবত স্লাইপারদের দিয়ে সরাসরি ইসলামাবাদ সরকারকে বদলাতে চাইছে। এর আগে নাকি মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার কোন কোন দেশে এই পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।'

'রাবিশ!' হাত ঝাপটে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল রানা।

'আমরা যতটা ভাবছি, ভারত হয়তো তারচেয়ে অনেক বেশি আতংকিত হয়ে আছে।' ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল সোহেল। 'সাহেদ কামরান খান পাকিস্তানে অতি উন্নতমানের ফাইটার এয়ারক্রাফট তৈরি করার প্রজেক্টে হাত দিতে যাচ্ছিলেন, ওই ফাইটার তৈরি হলে উপমহাদেশের আকাশে ভারতীয় এয়ারফোর্সের কর্তৃত্ব করার দিন নাকি শেষ হয়ে যেত।

'এ ছাড়াও, সাহেদ কামরান খান নাকি জীবাণুযুদ্ধের প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স তাঁকে বলতে শুনেছে, পাকিস্তান এমন জীবাণু তৈরি করতে যাচ্ছে, ভারতীয় যে-কোন বড় শহরের সমস্ত মানুষকে কমপক্ষে আটচল্লিশ ঘণ্টা অজ্ঞান করে রাখতে পারবে। এই দুটো প্রজেক্টই সাহেদ কামরান খানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে শুরু হতে যাচ্ছিল।

'এবার আয় খুনী বা খুনীদের পাঠানো কমপিউটার কম্পোজ করা মেসেজ প্রসঙ্গে। পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স চিঠির ভাষা আর যে কাগজে মেসেজগুলো কম্পোজ করে পাঠানো হয়েছে, এ-দুটোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। অন্য একটা কেসে ইণ্ডিয়ান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একজন এজেন্ট যে মেসেজ পাঠিয়েছিল সেটার কাগজ ওই একই রকম ছিল—এ কাগজ শুধু ভারতেই তৈরি হয়, ওরা তা কোথাও রপ্তানীও করে না। আর এবারে মেসেজ দুটোয় যেভাবে "আমরা"ও "আমাদের" ব্যবহার করা হয়েছে, ওই ভারতীয় এজেন্টের মেসেজেও এই শব্দ দুটো বারবার ব্যবহার করা হয়েছিল।

'সবশেষে, রানা, সত্যিকার একটা দুঃসংবাদ দিই তোকে। ওরা বলছে, বিভিন্ন সূত্র থেকে নিশ্চিত ভাবে জানা গেছে যে মাথুর চৌহানকে ইসলামাবাদে দেখা গেছে। কিন্তু হঠাৎ করে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।'

'মাথুর চৌহান?' চোখ-মুখই বলে দিল বিস্ময় ও অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে রানা। 'ইসলামাবাদে? অসম্ভব, তা কি করে হয়! আইএসএস-এর অন্যতম সেরা এজেন্ট চৌহান, সবাই জানে দেখামাত্র তাকে খুন করবে আইএসআই, ছদ্মবেশ না নিয়ে ইসলামাবাদে সে আসতেই পারে না।'

'তোর ধারণা ঠিক,' বলল সোহেল। 'তবে তুই আইএসআই-কে ছোট করে দেখছিস। চৌহান ছদ্মবেশ নিয়েই এসেছে, তা সত্ত্বেও ওদের ইনফর্মাররা তাকে চিনতে ভুল করেনি।'

'এ যদি সত্যি হয় তাহলে···,' কি বলবে ভাবছে রানা, '···চিন্তারই কথা। খুব বড় কোন কাজ না হলে আইএসএস মাথুর চৌহানকে পাকিস্তানে পাঠাবে না।'

মাথা ঝাঁকাল সোহেল। 'পাকিস্তানে আমাদের একজন সেক্রেটারি খুন হয়েছেন, একজন প্রতিমন্ত্রী ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছেন। ওখানে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসছেন, তারপরই আসবেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা পাকিস্তান সরকারকে জানিয়েছি, খুনীকে ধরার জন্যে তোমরা যা করছ করো, কিন্তু আমরা নিজেদের লোককে দিয়ে তদন্ত করাব। প্রথমে ওরা রাজি হয়নি, কিন্তু বসের সরবরাহ করা প্যাঁচ কষার যন্ত্রটা দিয়ে একটা টাইট দিতেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয়েছে।'

'ওরা জানে বিসিআই কাকে ইসলামাবাদে পাঠাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বস্ ওদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, তুই যাচ্ছিস,' বলল সোহেল। 'ওদের প্রতিক্রিয়া শুনে বোঝা গেছে, ওদের কাছ থেকে তেমন কোন সাহায্য তুই পাবি না। যা করার তোকে একাই করতে হবে।'

'কেন, রানা এজেন্সির অপারেটরদের ব্যাক আপ হিসেবে পাব না?'

আশপাশে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে সোহেল নিচু গলায় বলল, 'তোর কাজ রাওয়ালপিণ্ডি আর ইসলামাবাদে। এজেন্সির ওরা যে প্রায়

সবাই গিলগিটে, ভুলে গেলি নাকি?'

'হুম।' রানার চোখ দেখে মনে হলো অদূর ভবিষ্যতে কি ঘটবে দেখার চেষ্টা করছে।

'জিজ্ঞেস করলি না এত থাকতে বস্ তোকেই কেন পাকিস্তানে পাঠাচ্ছেন?' হঠাৎ জানতে চাইল সোহেল।

'বুড়োটার বোধহয় এটা একটা নেশা হয়ে গেছে—পরীক্ষা করে দেখবে আমার জানটা সত্যি কৈ মাছের কিনা।'

সিরিয়াস হতে গিয়েও হেসে ফেলল সোহেল। অবশ্য পরমুহূর্তেই আবার গম্ভীর। 'রব্বানির মাধ্যমে ব্যাপারটার সঙ্গে এরই মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিস তুই, এটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ, মাথুর চৌহান আর তার সহকারীরা তোকে চেনে না।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'তোর ব্রিফিং যদি শেষ হয়ে থাকে তো যেতে দে আমাকে। গ্র্যান্ড মারহাবার ডান্স ফ্লোরে আমার একটা ইনভিটেশন আছে।'

'তোর যা চরিত্র, জানি পিয়াসার বেলী ডান্স দেখতে গিয়ে পিয়াসায় বুক ফেটে যাবে তোর। তবে অনুরোধ করি, ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে সব ভুলে যাওয়ার আগে তুই ভাই ফটোগ্রাফটা একটু চেয়ে নিস।'

মুচকি হাসল রানা, কিছু বলল না।

চার

গ্র্যান্ড মারহাবার চারতলার ডান্স ফ্লোর-এর ডিজাইন করেছেন বিখ্যাত ফরাসী আর্টিস্ট জাঁ পল অঁনারি। তাঁর ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য হলো বেলী ড্যান্সারের দিকে সরাসরি না তাকালেও উপস্থিত দর্শকরা তার নাচ চাক্ষুষ করতে পারবে! তিন দিকের প্রতিটি দেয়াল পুরোপুরি আয়না।

মাথার ওপর সিলিঙে গ্রীক দেব-দেবীদের আয়েশী ভঙ্গিমার বহুরঙা ছবি আঁকা হয়েছে, তাদের কাউকে কিছু পরানো হয়নি। নগদ দু'হাজার ডলার খসিয়ে টিকেট কিনে ভেতরে ঢুকতে হয়েছে রানাকে, একটা টেবিল দখল করে বসতেই অর্ডার না দেয়া সত্ত্বেও ওয়েটার এক গ্লাস শ্যাম্পেন দিয়ে গেল, বলে গেল, 'অন দা হাউস, সার।'

প্রতিটি টেবিলে মোম জ্বলছে, বৈদ্যুতিক আলো আছে শুধু ডান্স ফ্লোরের স্টেজে–একজোড়া স্পট লাইট ছুটোছুটি করে ডান্সারকে সারাক্ষণ উদ্ভাসিত করে রেখেছে। দর্শকদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ ইউরোপিয়ান-আমেরিকান যেমন আছে, তেমনি আরবী শেখ-আমীরদের সংখ্যাও কম নয়।

মঞ্চে প্রথমে এলো একজন ফরাসী গায়িকা, প্রেমিককে হারিয়ে নায়িকার হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হয়, তার ব্যথা ও বেদনা ফুটিয়ে তোলার জন্যে করুণ রসের বন্যা বইয়ে দিয়ে গেল। তারপর এলো একদল জার্মান নর্তকী, বুনো ঘোড়ার মত লাফ-ঝাঁপ দিয়ে স্টেজ ভেঙে ফেলার অবস্থা করল। তারা চলে যেতে এলো বেলী ডান্সারদের একটা মিছিল। সবাই তারা পেটে যে তরঙ্গ তুলল, দেখার মতই।

অবশেষে পিয়াসার নাম ঘোষণা করা হলো। যেন সমীহ দেখিয়েই গোটা ডান্স ফ্লোর একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মিউজিশিয়ানরা বাড়ি দিল ড্রামে, উইংস থেকে ত্রস্ত পায়ে স্টেজে বেরিয়ে এলো পিয়াসা।

বেলী ডান্সাররা সাধারণত যে কস্টিউম পরে, পিয়াসাও তাই পরেছে, তবে তা এত পাতলা ও স্বচ্ছ যে শরীরে কিছু আছে কিনা সহজে বোঝা যায় না। তবে মিছিল করে এসে যারা বেলী ডান্স দেখিয়ে গেল তাদের কোন ভঙ্গিই পিয়াসা অনুকরণ করছে না–অর্থাৎ, সে প্রায় নগ্ন হওয়া সত্ত্বেও তার নাচটাকে অশ্লীল বলা যাচ্ছে না। সে যে আর সবার চেয়ে আলাদা, এটা শুরুতেই পরিষ্কার হয়ে গেল। তার পেট ও তলপেটের বিভিন্ন পেশির নিয়ন্ত্রিত কম্পন অবশ্যই কয়েক বছর ধরে চর্চার ফল। শরীর প্রায় না দুলিয়ে স্তনযুগলে তোলা আলোড়ন জাদুকর হুডিনির কোন আইটেম বলে সন্দেহ হয়।

খালি পায়ে চরকির মত গোটা স্টেজে পিয়াসা যেন একটা সোনালি প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে, মিউজিশিয়ানদের ক্ষিপ্র হয়ে ওঠার তাগিদ

দিয়ে, দর্শকদের মন মাতিয়ে। এত মোহনীয়, এত অবিশ্বাস্য, যেন বাস্তব নয়; একটা ঘোরের ভেতর ঘটছে সব, পুরোটাই বোধহয় মায়া। সঙ্গীতের সুর ম্লান হয়ে আসে, ক্রমশ গতি হারিয়ে পিয়াসাও স্থির পাথর হয়ে যায়, সেই নিষ্প্রাণ পাষাণে আবার প্রাণ সঞ্চারিত হয় ধীরে ধীরে, থেমে থেমে ড্রাম বেজে ওঠার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। রানা শুনতে পেল, ওর চারপাশে পুরুষ দর্শকরা শ্বাসকষ্টে ভুগছে, পিয়াসাকে আরও ভাল করে দেখার জন্যে সামনের দিকে ঝোঁকার সময়। অল্প কিছু নারী দর্শক যারা অপলক চোখে দেখছে, তাদের দৃষ্টিতে শুধু প্রশংসা নয়, খানিকটা ঈর্ষাও মিশে আছে।

অনুষ্ঠানের শেষ দিকে মিউজিক ঝড়ো হয়ে উঠল, তবে চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করে সেই ঝড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাচ্ছে পিয়াসা, মুখ থেকে ঘামের ধারা নেমে আসছে, গলার টান টান পেশি বেয়ে স্রোতটা নেমে যাচ্ছে গভীর উপত্যকায়, যে উপত্যকা তার দুই স্তনকে আলাদা করে রেখেছে। কয়েকটা ড্রাম একযোগে আর্তনাদ করে উঠল, সেই নিনাদের সঙ্গে ছিটকে স্টেজের মাঝখানে চলে এলো পিয়াসা, মেঝেতে হাঁটু গাড়ল, শরীর কোমরের কাছে দু'ভাঁজ।

ঝাড়া এক মিনিট সসম্ভ্রম নিস্তব্ধতা ভেসে থাকল কামরার ভেতর, তারপর যেন জোট বেঁধে উপস্থিত সমস্ত দর্শক উল্লাসে ফেটে পড়ল। কয়েকজন উৎসাহের আতিশয্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, তাদের হাততালিতে বোমা ফাটার আওয়াজ। অকুণ্ঠ প্রশংসার উত্তরে দর্শকদের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াল পিয়াসা, তারপর সাবলীল গতিতে স্টেজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল। হাততালির শব্দ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ল, শুরু হলো গুঞ্জন–পিয়াসার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সবাই।

টেবিল ছেড়ে স্টেজের পিছন দিকে যাচ্ছে রানা, উইং-এ পাহাড়সদৃশ এক আফ্রিকান সুমো কুস্তিগির তার মাংসল ডান হাতটা রানার বুকে ঠেকাল। হাতটা ধরে সরিয়ে দিল রানা, হাঁটা না থামিয়ে বন্ধ একটা দরজাকে পিয়াসার ড্রেসিংরুম ধরে নিয়ে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দরজায় নক করছে, অনুভব করল কুস্তিগিরের আধ মন ওজনের একটা হাত পড়ল কাঁধে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে যাবে, এই সময়

দরজা খুলে বাইরে তাকাল পিয়াসা।

'ঠিক আছে, সুলতান,' বলল সে, রানার কাঁধ খামচে ধরা হাত সরে গেল। চৌকাঠ পেরিয়ে ড্রেসিংরুমে ঢুকল রানা, কুস্তিগির সুলতানের মুখের ওপর আস্তে করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

একটা পর্দা তুলে ভেতরে হারিয়ে গেল পিয়াসা, বেরুল আবার সেই কালো মখমলে আপাদমস্তক ঢেকে, চোখ ইশারায় রানাকে পিছু নিতে বলে দরজা খুলল। গ্র্যান্ড মারহাবার পার্কিং এরিয়ায় হোটেলের নিজস্ব একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল তার জন্যে, রানাকে নিয়ে পিছনের সিটে উঠে বসল সে।

শহরের মধ্যবিত্তদের পাড়ায় একটা বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের এগারোতলা ফ্ল্যাটে থাকে পিয়াসা, জানালা ও ঝুল-বারান্দায় দাঁড়ালে ভারত মহাসাগর দেখা যায়।

ফ্ল্যাটের দরজা খুলে রানাকে প্রথমে ঢুকতে দিল পিয়াসা, তারপর নিজে ঢুকে পায়ের ধাক্কায় কবাট বন্ধ করল। আজ পূর্ণিমা, জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়া পূর্ণচন্দ্রের রোশনাই ধবধবে সাদা। পিয়াসা আলো না জ্বেলেই বাথরুমে ঢুকল, ব্লাউজ আর ঘাঘরা পরে ফিরে এলো যেন কিশোরী এক মেয়ে। ইতিমধ্যে এক কামরার ফ্ল্যাটে চোখ বুলিয়ে সাইফুল রব্বানির কোন প্রভাব বা ছাপ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে রানা। এখানে নিঃসঙ্গ একটা মেয়েই শুধু থাকে। দামী কিছু তেমন চোখে পড়ল না, তবে টেলিফোন আছে।

'চা, না কফি?' জিজ্ঞেস করল পিয়াসা, ছোট্ট কিচেনে ঢুকে দু'কাপ কফি বানিয়ে আনল। কামরায় একটা মাত্র আর্মচেয়ার, সেটায় বসল পিয়াসা, রানা ডুব দিল গভীর কাউচে। দু'তিনটে চুমুক দিয়ে কফির কাপটা পাশের ছোট্ট টেবিলে নামিয়ে রাখল ও। 'রব্বানি যে ফটোটা আমাকে দিতে বলেছে, কোথায় সেটা?'

ওয়ার্ড্রোব খুলে কালো মখমলের ড্রেসটা বের করল পিয়াসা, পকেটে হাত ভরে ফটোটা বের করল। তার বাড়ানো হাত থেকে ছবিটা নিল রানা। খুঁটিয়ে দেখছে। অনেক বছর আগের পুরানো একটা ফটো, কালের আঁচড় লেগে কাগজটা জীর্ণ আর ফটোর মানুষগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে। গুণে দেখল রানা–বিশজন তরুণ। সবার পরনে কালো

কাপড়ের ব্যাটল ড্রেস, প্রতি সারিতে পাঁচজন করে দাঁড়িয়ে পোজ দিয়েছে।

'ওর···মানে, রব্বানির পুরানো কমান্ডো ইউনিটের ফটো,' বলল পিয়াসা। 'ওকে তুমি দ্বিতীয় সারিতে দেখতে পাচ্ছ, বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়। ফটোটা তোলা হয় উনিশশো একাত্তর সালের মার্চ মাসে, লাহোর ক্যান্টনমেন্টে।'

'মার্চ মাসের কত তারিখে?' ছবিটা ঘোরাল রানা, উল্টোপিঠে কিছু লেখা আছে কিনা দেখছে। একটানে সই করার ভঙ্গিতে কেউ তার নাম লিখেছে, সম্ভবত ফটোগ্রাফার নিজে। কলমের কালি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর নামটা কোন রকমে পড়তে পারল রানা—**ক. শাহিন শিকদার**।

'কত তারিখ তা তো বলতে পারব না। ও আমাকে বলেনি। বা বললেও, মনে নেই।'

রব্বানি যা-ই রানাকে জানাতে চেয়ে থাকুক, সেটা এই ছবিতেই বলা আছে। সম্ভবত এই কমান্ডো ইউনিটের কোন একজন সদস্য সম্পর্কে। 'রব্বানি সম্পর্কে সব কথা বলো আমাকে।' মুখ তুলে পিয়াসার দিকে তাকাল রানা।

হাতের কাপটা নামিয়ে রাখল পিয়াসা। 'ওর ব্যবসা বা পেশা সম্পর্কে প্রায় কিছুই আমি জানি না। সোনা পাচার করার অপরাধে কয়েকবারই অ্যারেস্ট হয়। পুলিস একবার ওকে গাঁজা বা কোন ড্রাগস নিয়ে জেরা করেছিল। আমার তখন সন্দেহ হয়েছিল, ও হয়তো গোপনে আফিম বা গাঁজা বিক্রি করে। ব্যস, এর বেশি কিছু জানি না। বছরে দুই কি তিনবার আমাকে দেখতে আসত। কখনও কিছু টাকা দিয়ে যেত, আবার কখনও চাইতে আসত।'

'ফটোটা যে সুটকেস থেকে পেয়েছ, তাতে আর কি আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওর সুটকেসে? পুরানো কিছু কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছু নেই।'

'ওটা আমি একবার দেখতে পারি?'

পিয়াসার দৃষ্টি অনুসরণ করে একটা বুককেসের মাথায় তাকাতে সুটকেসটা দেখতে পেল রানা, খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কাউচ

ছেড়ে উঠল ও, সুটকেসের ভেতর থেকে কয়েকটা প্যান্ট-শার্ট আর খুব দামী অথচ পোকায় কাটা একটা পুরানো জামদানি শাড়ি বের করল।

শাড়িটা রানা দেখছে, পিছন থেকে পিয়াসা বলল, 'ওটা আমার মায়ের।'

তার দিকে ঘুরল রানা, চোখ দিয়ে প্রশ্ন করল।

'ওটা আমার মায়ের বিয়ের শাড়ি,' আবার বলল পিয়াসা। 'মা ছিল সাইফুল রব্বানির স্ত্রী।'

'রব্বানির কি?'

'ওয়াইফ। ওদের বিয়ের সময় আমার বয়স ছিল চার। রব্বানি ছিল আমার সৎ বাবা।' রব্বানির মৃত্যু সংবাদ শোনার পর এই প্রথম আবেগপ্রবণ হতে দেখা গেল পিয়াসাকে। দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে, কপালটা রানার বুকে ঠেকিয়ে ফোঁপাচ্ছে, হাত দিয়ে রানার বাহু খামচে ধরল।

যতটা পারা যায় সান্ত্বনা ও সহানুভূতি জানাল রানা। একসময় নিজেকে সামলে নিল পিয়াসা, বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে এসে আবার আর্মচেয়ারটায় বসল। 'আমার নিজের বাবা তানজানিয়ান, তবে আমার মা ছিল পাকিস্তানী। নিজের বাবার কথা আমার কিছুই মনে পড়ে না। মাকে বিয়ে করার পর সৎ বাবাই আমাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করল। আমরা তখন যেখানে থাকতাম, প্রতিবেশীরা কেউ বিশ্বাসই করত না যে রব্বানি আমার সৎ বাবা।

'আমার দশ বছর বয়সে মা মারা গেল, কিন্তু সে আমাকে মায়ের অভাব টেরই পেতে দেয়নি। যা রোজগার করত সব আমার পিছনেই খরচ করে ফেলত। নাচের স্কুলে ভর্তি করাল, ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া শেখাল। আমি আরেকটু বড় হতে স্কুলে আসা-যাওয়ার জন্যে ট্যাক্সির ব্যবস্থা করল। বুঝতে পারতাম এত খরচ সামলে উঠতে পারছে না। এ-ও বুঝতাম যে আমার সৎ বাবা অসৎ পথে পয়সা রোজগার করছে।

'সে বছর আমি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব। বেতন বাকি পড়েছে, পরীক্ষার ফি-ও যোগাড় হচ্ছে না। অথচ বাবার সেদিকে কোন খেয়াল নেই। জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিল, "কিছু দিনের মধ্যে মোটা টাকা হাতে

আসছে, তোমাকে নিয়ে আমেরিকা কিংবা কানাডায় চলে যাব। পরীক্ষা দেয়া না হলে মন খারাপ কোরো না"। এই ঘটনার মাত্র এক হপ্তা পর হঠাৎ এক রাতে বাড়ি ফিরে পাগলের মত আচরণ শুরু করল বাবা। বলল, বিছা তাকে খুন করার জন্যে লোক পাঠিয়েছে। পিঠে চেরা দাগ দেখলাম, কেউ ছুরি মেরেছিল, কিন্তু ঠিকমত লাগাতে পারেনি...'

'এই বিছাটা কে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তুমি জানতে চাওনি?' রানা বসেছে বিছানার ওপর পা ঝুলিয়ে।

'চেয়েছিলাম–সেদিনও, এবং পরেও,' বলল পিয়াসা। 'কিন্তু প্রতিবার "তুই চিনবি না" বলে এড়িয়ে গেছে। বাবা আসলে নিজের অতীত সম্পর্কে কোন কথাই বলতে চাইত না। জিজ্ঞেস করলে কেমন যেন শিউরে বা আঁতকে মত উঠত।'

'সেদিন রাতে তারপর কি ঘটল?'

'বাবা বলল, বিছা তাকে খুন করবে, তার সঙ্গে আমি থাকলে আমাকেও খুন করবে। শুধু কিছু কাপড়চোপড় নিয়ে গভীর রাতে বাড়ি ছেড়ে পালালাম আমরা। বাবা বলল, তানজানিয়ায় তার থাকা চলবে না। পালিয়ে অন্য কোন দেশে চলে যাবে। কিন্তু যেখানে যাবে সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে কিছু টাকা দিয়ে ট্যাক্সি করে পৌঁছে দিল মেয়েদের একটা হোস্টেলের সামনে। এরপর তিন বছর তার দেখা তো পাইইনি, জানতেও পারিনি সে বেঁচে আছে কিনা।'

'আঠারো-বিশ বছরের একটা মেয়ে, একা তুমি টিকে থাকলে কিভাবে?'

'মানুষ আসলে সব পরিস্থিতির সঙ্গেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল পিয়াসা। 'নাচ-গান ভালই শিখেছিলাম, বিশেষ করে নাচটা, সেটা কাজে লেগে গেল।'

আবার ছবিটার প্রসঙ্গে ফিরে এলো রানা। 'রব্বানি এটার দাম চেয়েছিল ত্রিশ হাজার ডলার। কিন্তু ছবিটায় এমন কি আছে যে আমার কাজে লাগবে?'

'তুমি কি কাজে লাগাতে চাও তাই তো আমি জানি না,' বলল পিয়াসা। 'জানলেও কোন সাহায্যে আসতাম বলে মনে হয় না। কারণ বাবা আমাকে ফটোটা রাখতে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ওটার বৈশিষ্ট্য বা

তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুই বলেনি।'

'কিছুই বলেনি?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'তাহলে তুমি জানলে কিভাবে এটা রব্বানির কমান্ডো ইউনিটের ফটো?'

'কিছুই বলেনি মানে, কিছু ব্যাখ্যা করেনি,' বিব্রত ভঙ্গিতে বলল পিয়াসা। 'ওটা যে পাকিস্তান আর্মির স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো ইউনিট-এর গ্রুপ ফটো, এটা আমি মা বেঁচে থাকতে তার মুখ থেকে শুনেছিলাম। মা এ-ও আমাকে বলেছিল যে ওই ইউনিটের মিশন-এর কোডনেম ছিল–কেএইচকেএল।'

'স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো ইউনিট,' পুনরাবৃত্তি করল রানা। মিশন: কেএইচকেএল। 'তোমার মা-ও কি রব্বানির অতীত ইতিহাস জানতেন না, বা যতটুকু জানতেন তোমাকে বলেননি?'

'জানত বলে মনে হয় না, কিংবা হয়তো গর্ব করার মত কিছু নয় বলে আমাকে জানায়নি।'

আরও প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে পিয়াসাকে জেরা করল রানা, কিন্তু কাজে লাগতে পারে এমন কোন সূত্র তার কাছ থেকে পাওয়া গেল না। ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে রব্বানির যোগাযোগ ছিল কিনা তাও সে জানে না।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে পিয়াসা রানাকে বলল, 'আজ আর রান্না করতে ইচ্ছে করছে না, বাইরে কোথাও খেতে যাব–তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

রানা ইতস্তত করছে।

পিয়াসা আবার বলল, 'সব কথাই তো রব্বানি আর আমাকে নিয়ে হলো, তাই না? তোমার সম্পর্কে কি কারও কোন কৌতূহল থাকতে পারে না?'

জবাবটা দু'সেকেন্ড পর পেল পিয়াসা–কৌতূহল থাকা উচিত নয়।

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠোঁটে আঙুল রেখে 'শ্‌শ্‌শ্‌' করল পিয়াসা, চোখ দরজার দিকে।

পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছে রানা, বিস্ফোরিত হলো দরজা, ভেতরে ঢুকল এক আফ্রিকান কাফ্রী। কোন কথা নয়, সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তল থেকে দুটো গুলি করল সে। ইতিমধ্যে রানার শরীরে বিদ্যুৎ

খেলে গেছে, বিছানার ওপর দিয়ে গড়িয়ে খাটের আরেক দিকের মেঝেতে নেমে এলো, হাতে বেরিয়ে আসা ছুরিটা ছুঁড়ে দিল লোকটা তৃতীয়বার ট্রিগার টানার আগেই। থুতনি ছুঁয়ে গলায় ঢুকল ওর ছুরির ফলা।

দেয়ালে হাত তুলে কামরার আলো জ্বালল রানা, মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকাতে বুঝতে অসুবিধে হলো না মারা যাচ্ছে সে। তারপর পিয়াসার দিকে তাকাল ও। তার বাম স্তনের নিচে থেকে বেরিয়ে লাল রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পড়ায় রানাকে করা গুলি দুটোর একটা অন্তত তাকে লেগেছে। আরেকটা সম্ভবত রানার মাথার ওপর দিয়ে জানালার দিকে ছুটে গেছে।

পিয়াসার মাথাটা দু'হাতে ধরে তুলল রানা। ঠোঁটের কোণ থেকে লাল একটা ধারা গড়াচ্ছে। একবার ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটা কি যেন বলছে। তার পাশে হাঁটু গাড়ল রানা। হ্যাঁচকা টানে ছুরিটা বের করে ক্ষতটায় রুমাল চেপে ধরল। 'কে তোমাকে পাঠিয়েছে?' তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। 'এই, কে?'

'ওদের কাছে আপনার ফটো নেই,' কথা বলার সময় লোকটার গলার ক্ষত থেকে রক্ত বেরুচ্ছে, ভিজে যাচ্ছে রুমালটা। 'তাই জানে না কোথায় আপনাকে পাওয়া যাবে…'

'ওরা কারা?'

'বিচ্ছুর লোক, ভাড়াটে খুনী,' বলেই চোখ বুজে যেন ঘুমিয়ে পড়ল লোকটা।

রানা তার পালস দেখল। কাঁধ ধরে ঝাঁকাল আবার। 'বিচ্ছুটা কে?'

'কাইউম আমার ভাই…খকখক–,' লোকটার কাশির সঙ্গে হড় হড় করে খানিকটা রক্ত বেরুল। 'আমি জানতাম রব্বানির একটা মেয়ে আছে দার-এস-সালামে, তাই ছাদে উঠে অপেক্ষা করছিলাম…'

'তুমি বাঁচতে চাও না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ডাক্তাররা অবশ্যই শেষ চেষ্টা করে দেখবে। আমি তোমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব, শুধু একটা প্রশ্নের জবাব দাও। বিচ্ছু কে?'

লোকটা মাথা নাড়ার চেষ্টা করে পারল না। 'জানি না।'

'সে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমাকে মারতে পারলে দু'লাখ ডলার পাবার কথা না তোমার? টাকাটা কিভাবে দিত?'

লোকটা জবাব দিল, 'কাইউম···আমার···ভাই···,' তার কথা এখন আর প্রায় শোনাই যাচ্ছে না।

'আমি টাকার কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'আমার ভাইপো···কাইউমের ছেলে জানে কিভাবে··· যোগাযোগ করতে···' লোকটার মাথা একদিকে কাত হয়ে গেল। রক্তে ভেজা রুমালটা পকেটে ভরল রানা, ছুরিটা ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

পকেট সার্চ করে ইজিপশিয়ান এয়ারলাইন্সের একটা রিটার্ন টিকেট, পাসপোর্ট আর কিছু ডলার ছাড়া আর কিছু পেল না রানা। লোকটা যদি সত্যি কাইউমের ভাই হয়ে থাকে, রানাকে খুঁজে বের করতে আসাটা তার জন্যে খুবই স্বাভাবিক। দুনিয়ার এদিকটায় এখনও খুনের বদলা খুন বহুল প্রচলিত। রানা তার ভাইকে খুন করেছে, কাজেই রানাকে খুন করা তার অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু প্রতিশোধ সে নিতে পারেনি। মাঝখান থেকে দুঃখিনী মেয়েটা অকালে প্রাণ হারাল।

পাঁচ

পরদিন দুপুরে বি.ও.এ.সি-র একটা ফ্লাইট ধরে নিরাপদেই পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে পৌঁছাল রানা। পুলিসে ফোন করার আগে পিয়াসার ঘরে বসেই যতটা সম্ভব নিজের চেহারা বদলে নিয়েছিল ও। সঙ্গে নিজের নামে আসল পাসপোর্টটাও ছিল, ফলে ট্র্যাভেল অফিসে বেশি পয়সা দিয়ে ভিসা ও প্লেনের টিকেট সংগ্রহ করতে খুব একটা

ঝামেলা পোহাতে হয়নি। ওর এজেন্সির এখানকার অপারেটররা সবাই যে গিলগিটে ডিউটি দিচ্ছে, তা নয়, তবে সোহেল নিষেধ করে দেয়ায় কেউ তারা এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে আসেনি ওকে। অ্যারাইভাল লাউঞ্জ থেকে কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন শেডে চলে এলো রানা, জানে বিশেষ কোন ঝামেলা পোহাতে হবে না।

কাল রাতে এবং আজ সকালে প্লেনে চড়ার আগে সোহেলের সঙ্গে দু'বার টেলিফোনে আলাপ করেছে রানা। জরুরী গোপন বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার জন্যে হোটেল গ্র্যান্ড মারহাবার শপিং আর্কেড থেকে একটা মোবাইল ফোন কেনে ও, তারপর রানা এজেন্সির মাধ্যমে কয়েক ধাপে সোহেলের নিজস্ব মোবাইলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ওর কিছু প্রশ্ন ছিল, সোহেল সেগুলো লিখে নেয়। আর সোহেল বসের কয়েকটা নির্দেশের কথা জানায় রানাকে, নিজেও কিছু সাজেশন দেয়।

কাল রাতেই রানাকে জানানো হয়, পাকিস্তানী পুলিস ও ইন্টেলিজেন্স সংস্থাগুলোর তদন্ত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মার্কটাইম করছে, কাজেই তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবে না ও। রাহাত খান নির্দেশ দিয়েছেন, আইএসআই-এর কোন এজেন্ট বা কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করারই দরকার নেই রানার, কারণ তিনি গোপন সূত্রে খবর পেয়েছেন, প্রতিপদে ওকে বাধা দেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে তারা। এয়ারপোর্টে ওকে রিসিভ করবে পাকিস্তান ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির একজন এজেন্ট, সে-ই ওকে পিপিএনএসএ-র হেড অফিস কলেজ রোডে নিয়ে যাবে। কাকতালীয়ভাবে, ওখানে একটা বাজার আছে, নাম রানা মার্কেট। পিপিএনএসএ-র চীফ ব্রিগেডিয়ার ইমরান কাজেমি নিজের চেম্বারে ওর সঙ্গে এই কেস ও সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবেন।

রাহাত খানের তরফ থেকে রানাকে আরও জানানো হয়েছে, উনিশশো একাত্তর সালে 'স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো' নামে কোন ইউনিট পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিল কিনা তা তাঁর জানা নেই। মিশনঃ কেএইচকেএল-এর কথাও আগে কখনও শোনেননি তিনি। এ বিষয়ে বিসিআই বা বাংলাদেশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের কাছে কোন তথ্য নেই।

তবে একটা প্রশ্নের জবাব পেয়েছে রানা। তাও এমন জবাব, না পেলেই যেন ভাল হত। রব্বানির দেয়া ফটোগ্রাফের পিছনে যার নাম

লেখা আছে তিনি সম্ভবত সে-সময়কার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন বাঙালী অফিসার, কর্নেল শাহিন শিকদার। ফটোটা হয়তো তিনিই তুলেছিলেন। না, ভদ্রলোক রাহাত খানের বন্ধু ছিলেন না, অনেক জুনিয়র, তবে পরস্পরকে তাঁরা চিনতেন। রাহাত খানের জানামতে ইনিই সম্ভবত একমাত্র বাঙালী আর্মি অফিসার যিনি একাত্তর সালের মার্চ মাসে লাহোর ক্যান্টনমেন্টে বসে নিরীহ বাঙালীদের পাইকারী হারে খুন করার নীল নকশা তৈরি হতে দেখে প্রতিবাদ করেছিলেন। তার ফলও তাঁকে ভোগ করতে হয়। কোর্ট মার্শালে রায় হয়, তার সমস্ত পদক ও পদোন্নতি প্রত্যাহার করে নিতে হবে, চাকরিচ্যুত করা হবে সাধারণ একজন লেফটেন্যান্ট হিসেবে, এবং জেল খাটতে হবে একটানা পঞ্চাশ বছর।

দুঃখের বিষয় হলো, শাহিন শিকদার আজও বেঁচে আছেন কি না, বেঁচে থাকলে কোন্ জেলে তাঁকে রাখা হয়েছে ইত্যাদি কোন তথ্যই পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব হয়নি।

প্লেনে চড়ার আগে, আজ সকালে, আবার সোহেলের ফোন পায় রানা। কাল রাতে করা ওর প্রশ্নের উত্তর সে জানিয়েছে, কায়রো থেকে অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় পাঠানো হয়েছিল রানা এজেন্সির দু'জন অপারেটরকে। কুলি সর্দার আকমল বিন কাইউমের ছেলে সাইমুমকে কাল রাতেই খুঁজে বের করে তারা। কিন্তু ছেলেটা বাপের চেয়েও এক কাঠি সরেস। ওদেরকে দেখেই সিক্সশুটার বের করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। ওরাও পাল্টা গুলি ছোঁড়ে। সাইমুম মারা গেছে।

কাস্টমস্ শেডে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে রানা। লালচে-সোনালি চুল আর নীল চোখ নিয়ে ব্রিটিশ বা ইউরোপিয়ান হবে মেয়েটা, ওর দিকে হেঁটে আসছে। একহারা গড়ন, দুধে-আলতা গায়ের রঙ, লম্বায় হয়তো রানার চেয়ে মাত্র ইঞ্চি দুয়েক ছোট হবে। স্ল্যাক্স পরেছে, সঙ্গে শার্ট; তবে এটা যে পাকিস্তান এবং এখানে জঙ্গি মৌলবাদীদের দাপট খুব বেশি এটা সে জানে, বোধহয় সেজন্যেই উন্নত স্তনযুগল লুকানোর জন্যে গলায় একটা পাকিস্তানী দোপাট্টা ঝুলিয়েছে। তা ঝোলাক, কিন্তু রানার পথরোধ করবে কেন? কেন হাসবে? বাধ্য হয়ে স্মৃতির পাতা ওল্টাচ্ছে রানা–কে, কোথায় দেখেছে,

ঘনিষ্ঠতাও ছিল নাকি?

আরও চমক অপেক্ষা করছিল। একেবারে সম্ভ্রান্ত মুসলিম কায়দায় মাথা একটু ঝুঁকিয়ে, কপালে হাত তুলে কানে মধুবর্ষণ করল, 'তসলিম। তুমি মাসুদ রানা।' রানা প্রতিবাদ করে কিনা দেখার জন্যে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ঘুরে দাঁড়াল, ওর মুগ্ধ দৃষ্টি গরম আঁচের মত লাগায় চেহারা লালচে হয়ে উঠছিল। 'আমার সঙ্গে এসো, প্লীজ। আমি পিএনএসআই থেকে তোমাকে নিতে এসেছি।'

দশ মিনিটের মধ্যে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশনের ঝামেলা শেষ করে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে রানাকে বের করে এনে একটা সিতারা রোড কিং-এর ব্যাক-সিটে তুলল মেয়েটা, নিজেও সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে বসল পাশে, ড্রাইভারকে বলল, 'হেড অফিসে, আফতাব।'

এয়ারপোর্ট এরিয়া থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে উঠল সিতারা রোড কিং, রাস্তায় প্রচুর যানবাহন থাকলেও দক্ষ ড্রাইভার ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীড তুলে শহরে নিয়ে যাচ্ছে ওদের। রাস্তা, ফুটপাথ, দু'পাশের আলোর আয়োজন, কাছে ও দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ইমারত, সবই খুব সুন্দর ও ব্যয়বহুল। ইতিহাস জানা থাকায় রানার মনে পড়ল, পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক নেতারাই বেশিরভাগ সময় দেশটাকে শাসন করেছে; তাদের সবার মূল কাজ ছিল একটাই–দুই প্রদেশ থেকে যা আয় হবে তার প্রায় সবটুকু ব্যয় করে পশ্চিম পাকিস্তানে একের পর এক নতুন নতুন শহর ও রাজধানী গড়ে তোলা। প্রথমে বন্দরনগরী করাচীকে রাজধানী করা হলো। তারপর করা হলো পাহাড়ী এলাকা রাওয়ালপিণ্ডিকে। একটা করে প্রাচীন অনুন্নত শহরকে ধরা হয়, হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে সেটাকে পরিকল্পিত আধুনিক শহর ও রাজধানী হিসেবে তৈরি করার পর বলা হয়–এই জায়গাটা রাজধানী হবার উপযুক্ত নয়, নতুন কোথাও রাজধানী হওয়া দরকার। শেষে অখ্যাত ছোট্ট একটা প্রাচীন গ্রাম সাঈদপুরকে ধরা হলো, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে সড়কপথে পৌঁছাতে সময় লাগে মাত্র পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিনিট। পূর্ব-পাকিস্তানের পাট আর চা বিক্রির টাকায় সেখানে গড়ে তোলা হলো আরও একটা রাজধানী–ইসলামাবাদ।

'তুমি নস্টালজিয়ায় ভুগবে না–না,' রানাকে অন্যমনস্ক দেখে হঠাৎ

করে কথাগুলো বলল মেয়েটা। 'তবে যেহেতু আমাদেরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, তাই জানতে পারলে খুশি হতাম এই মুহূর্তে ঠিক কি ভাবছ তুমি। কিংবা পাকিস্তানে আসার পর কেমন লাগছে তোমার।'

'তুমি সত্যি পাকিস্তানী মেয়ে, এই চমকটা দারুণ উপভোগ করছি,' সত্যি কথাই বলল রানা। 'না, নস্টালজিয়ায় ভোগার প্রশ্ন ওঠে না। বরং একটা কথা ভেবে খারাপ লাগছে–এত সুন্দর এই শহর, এরকম আরও কয়েকটা শহর, তোমরা আমাদের টাকায় বানিয়েছ...'

মেয়েটা যেন জানত রানা এরকম কিছু বলবে, তাই বুঝি উত্তরটা ঠোঁটে এনে রেখেছিল। 'শুনতে পাচ্ছি তোমাদের সেই টাকা ফেরত দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে, তারপরও তুমি মন খারাপ করে থাকবে কেন?'

'কেন মন খারাপ করে থাকব না! এত যার রূপ, তার নামটাও নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে। কিন্তু আমাকে সে জানাচ্ছেই না!'

গলা ছেড়েই হাসতে শুরু করেছিল মেয়েটা, তবে চট করে একবার ড্রাইভারকে দেখে নিয়ে নিজেকে সামলে নিল ধীরে ধীরে। ডান হাত বাড়াল সে–এত ফর্সা, ভেতরের রক্তও যেন দেখা যাচ্ছে। 'আমি দীনা–দীনা তাবাসসুম। হাই, রানা!'

হাতটা ধরতেই ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মত অনুভূতি হলো রানার, ধরার পর আর ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। তবে উপলব্ধি করল, এ বড় সাবধানী মেয়ে, সম্ভ্রম ক্ষুণ্ন হতে দিতে রাজি নয়। রানা দুই কি তিন সেকেন্ডের বেশি সময় পেল না, ওর মুঠোর মধ্যে হাতটা নড়ে উঠতেই ছেড়ে দিল।

কলেজ রোডের শেষ মাথায়, পাক সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-থ্রী দাঁড়িয়ে আছে আকাশ ছুঁয়ে। স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, ধর্ম ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস। এই ভবনে পিএনএসএ-র হেড অফিসও। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বসেন দোতলায়। পিএনএসএ-র চীফ ব্রিগেডিয়ার কাজেমি বসেন তিনতলায়।

ভবনের সামনে বিশাল পাকা চাতালের একপাশে পার্কিং এরিয়ায় থামল ওদের গাড়ি। চারদিকে সিতারা রোড কিং, সিতারা রোড মাস্টার, সিতারা হেন, সিতারা তেন সংখ্যায় এত বেশি যে রানার

দৃষ্টিকে একটু পীড়াই দিচ্ছে।

এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করতে তাবাসসুম জানাল, 'সিতারা অটোমোবাইলস্ বর্তমানে পাকিস্তানের সবচেয়ে বিখ্যাত কার ম্যানুফাকচারিং কোম্পানি। সরকারী কার পুল-এ প্রায় সব গাড়িই তো সিতারার।' হঠাৎ একটু হাসল সে। 'গাড়িগুলোর সুনাম আছে, কিন্তু কোম্পানির মালিক ভদ্রলোকের···না, থাক!'

রানাকে নিয়ে দালানের ভেতর ঢুকল তাবাসসুম। সব ক'টা ফ্লোরেই কড়া প্রহরা ও তুমুল ব্যস্ততা দেখা গেল। পিএনএসএ এজেন্টরা সবাই সশস্ত্র, কেউ কেউ শার্টের ওপর শোল্ডার হোলস্টার পরেছে, আবার কেউ কোমরের বেল্টে ঝোলানো হোলস্টারে গুঁজে রেখেছে পিস্তল। কারও কারও কাঁধে স্ট্র্যাপের সঙ্গে ঝুলছে কারবাইন। রানাকে কয়েক জায়গায় থামালো গার্ড, সঙ্গে তাবাসসুম থাকায় শুধু পরিচয়-পত্র দেখে ছেড়ে দিল, সার্চ করল না। তবে রানা লক্ষ করল, এজেন্টরা ব্যস্ততার অভিনয় করলেও, চোরা চোখে ওকে ভালভাবেই দেখে নিচ্ছে।

পিএনএসএ চীফ ব্রিগেডিয়ার ইমরান কাজেমির চেম্বারের সামনে এসে থামল ওরা। একজন সশস্ত্র গার্ড স্যালুট করল তাবাসসুমকে। তাবাসসুম যেভাবে নক করল দরজায়: টক-টক-টক, টক-টক–মনে হলো সাংকেতিক টোকা। ভেতর থেকে গম্ভীর আওয়াজ এলো, 'কাম ইন।'

তাবাসসুমের পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকে রানা দেখল এরই মধ্যে ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। চোখাচোখি হতে বললেন, 'ওয়েল, ওয়েল! মিস্টার মাসুদ রানা! গুড! গুড!' তাঁর থাবার ভেতর বলা যায় প্রায় নিখোঁজ হয়ে গেল রানার হাত। এমন চৌকো মুখ খুব কমই দেখেছে রানা, প্রায় পুরোটাই দখল করে রেখেছে দুই চোয়াল। জুলফি পেকে সাদা, তবে চুল এখনও কালো, আর চোখের চারপাশে চামড়ায় প্রচুর রেখা ও ভাঁজ।

'গ্ল্যাড টু মীট ইউ, মিস্টার কাজেমি।'

'মাই প্লেজার! ডিসটিংক্টলি মাই প্লেজার! ফুল যেমন গন্ধ বিলায়, মাসুদ রানা নামটা তেমনি সুখ্যাতি ছড়ায়।'

স্মিত হেসে তাঁর দেখানো চেয়ারটায় বসল রানা। ওর পাশের চেয়ারে বসল তাবাসসুম।

পিএনএসএ চীফ নিজের চেয়ারে ফিরে না গিয়ে মেহগনি ডেস্কের কোণাটায় বসলেন। 'স্বীকার করতে আমার অন্তত কুণ্ঠা নেই, মিস্টার রানা, আমরা খুব বড় একটা বিপদেই পড়েছি। আমাদের নিউক্লিয়ার বোমা আছে, অথচ এ দুঃখ রাখি কোথায় যে একজন খুনীকে ধরার ক্ষমতা নেই।'

রানা সরাসরি কাজের কথা পাড়ল। 'আপনাদের তদন্ত এখন কোন পর্যায়ে?'

'যেখান থেকে শুরু করা হয়েছিল ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে–আইএসআই, পাকিস্তান সিক্রেট সার্ভিস, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ, পুলিস–সবাই। বিলিভ ইট অর নট, প্রায় আড়াই হাজার সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, কিন্তু ফলাফল শূন্য–এরা কেউ দায়ী বলে মনে হচ্ছে না। শুধু আমরা একটা সূত্র পেয়েছি।'

'মাথুর চৌহান সম্পর্কে?'

'শেষবার তাকে দেখা গেছে লাহোরে,' মাথা ঝাঁকিয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি, রানা বাধা দিল।

'এই ছবিটা দেখুন,' বলে ব্রিফকেস খুলে পিয়াসার কাছ থেকে পাওয়া ফটোগ্রাফটা ডেস্কের ওপর রাখল রানা।

ফটোটা চোখের সামনে ধরে বেশ সময় নিয়েই দেখছেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমী, সেই ফাঁকে মিশরের অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় ও তানজানিয়ার-দার-এস সালামে কি ঘটেছে, সংক্ষেপে তাঁকে প্রায় সবটুকুই জানাল রানা। শোনার পর ফটো থেকে মুখ তুলে ভদ্রলোক বললেন, 'রব্বানি? সাইফুল রব্বানি? নাহ্, মনে পড়ছে না। স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো ইউনিট?' মাথা নাড়লেন। 'মিশন: কেএইচকেএল?' আবার মাথা নাড়লেন। 'বিছা? ইউ মীন স্করপিয়ন? সত্যি কথা বলতে কি, আমি অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। তবে চেক করে দেখা দরকার। ছবিটা আমার কাছে থাকুক?'

'আমি চাইও তাই, চেক করে দেখুন,' বলল রানা। 'এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। মূল ফটোটা আমি নিজের কাছে রাখতে চাই,

আপনাদেরকে ফটোস্ট্যাট করা কপি দেব।'

'তাড়াতাড়ি? সরি, মাই ফ্রেন্ড।' ম্লান হাসলেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি। 'এই গোপন তথ্য আমরা পেতে পারি শুধু মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স থেকে। ওপর মহলের কয়েক স্তর থেকে অনুমতি নিয়ে তারপর সামরিক ইনফরমেশন সাপ্লাই দেয়া হয়। কাজেই সময় খানিকটা লাগবেই। তবে ইতিমধ্যে বসে না থেকে যে সূত্র টা হাতে রয়েছে সেটা ধরে তদন্ত শুরু করতে পারেন আপনারা।' ইঙ্গিতে রানার পাশে বসা তাবাসসুমকে দেখালেন তিনি। 'আমি চাই এই কেসে একটা টীম হিসেবে কাজ করবেন আপনারা।' সাড়া দিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা, মনে মনে খুশি। ফটোটা ফেরত দিতে যাচ্ছেন, কি মনে করে উল্টোপিঠটা দেখলেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি। ধীরে ধীরে ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল তাঁর। 'এখানে বোধহয় কিছু লেখা ছিল–সম্ভবত ফটোগ্রাফারের নাম। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ঘন কালি দিয়ে লেখাটা মুছে ফেলা হয়েছে।' অবাক দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন।

'ব্যাপারটা আমার কাছেও রহস্যময় মনে হয়েছে,' মিথ্যে কথা বলছে রানা। 'ছবিটা আমি এভাবেই পেয়েছি। যে-কোন কারণেই হোক রব্বানি হয়তো চায়নি ফটোগ্রাফারের নামটা আমি জানি বা প্রচার হোক।'

'স্ট্রেঞ্জ!'

রানা প্রসঙ্গটার ইতি টানার জন্যে বলল, 'এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না-ও হতে পারে।' ছবিটা নিয়ে ব্রিফকেসে ভরে রাখল ও। 'আসুন, ব্রিগেডিয়ার, এবার জরুরী আলাপটা সেরে নিই আমরা।'

'ও, ইয়েস! ও, ইয়েস!' ডেস্কের কোণ থেকে নেমে নিজের রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসলেন, শিরদাঁড়া খাড়া। 'এটা হিন্দুস্তানের ষড়যন্ত্র কিনা এখনও আমরা তা নিশ্চিতভাবে জানি না। তবে ওদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এসপিওনাজ এজেন্ট মাথুর চৌহানকে পাকিস্তানে দেখা গেছে–দেখা গেছে মানে চেনা গেছে, ছদ্মবেশ নিয়ে থাকা সত্ত্বেও।

'মাথুর চৌহান পাকিস্তানে মহৎ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। তবে তার উদ্দেশ্য যতই বিপজ্জনক হোক, তার সঙ্গে এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। তদন্ত হওয়াটা অবশ্য

জরুরী। আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে। মিস্টার রানা, আপনার উর্বর মস্তিষ্কে যদি অন্য কোন আইডিয়া আসে, সেগুলোও এক্সপ্লোর করতে পারবেন, তবে শুধু আমাকে একটু জানিয়ে রাখবেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আততায়ীর পাঠানো মেসেজ দুটোর ফটোস্ট্যাট করা কপি আমি দেখেছি। ওগুলোয় বিভিন্ন ধরনের টাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন শব্দ বোল্ড হরফে টাইপ করা। কিছু বাক্য ইটালিক-এ কম্পোজ করা। আবার আন্ডার লাইনও করা হয়েছে। মেসেজ দুটো কোন সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ পেলে ভাল হয়। সম্ভব?'

'অভকোর্স! অভকোর্স!' উৎসাহ দেখাতে কার্পণ্য করলেন না ব্রিগেডিয়ার। 'আজই আমি অরিজিনাল কপি দুটো নামকরা কোন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর কিছু, মিস্টার রানা?'

'একটা নাম বলি, দেখুন তো মনের ভেতর কোন রিঙ বাজে কিনা।'

'ইয়েস?'

'ইলিয়াস মোস্তাফা।'

দীনা তাবাসসুম ঝট করে রানার দিকে তাকাল।

চোখ বুজলেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি। পুরো পঞ্চাশ সেকেন্ড পর চোখ খুলে বললেন, 'আমি পাঁচজন ইলিয়াস মোস্তাফাকে চিনি। আসলে পাকিস্তানে এটা একটা কমন নাম। কি করে বুঝব আপনি কার কথা জানতে চাইছেন।'

'পাঁচজন সম্পর্কেই সংক্ষেপে ধারণা দিন।'

'একজন আমার বাগানের বুড়ো মালী। একজন পাকিস্তানের বিখ্যাত শায়ের, মানে কবি। একজনকে পিণ্ডি আর করাচীর হাইকোর্ট থেকে ব্যাংক লুঠ, গ্যাংফাইট ও কয়েকটা মার্ডার কেসে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, তার অনুপস্থিতিতে; পরে লোকটা আগুনে পুড়ে মারা যায়। আরেকজন ইলিয়াস মোস্তাফাকে চিনি, তিনি মৌলানা মানুষ; বহু বছর ধরে পাকিস্তানে সৌদি আরবের মত গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিসেবে প্রকাশ্যে অপরাধীকে জবাই করার আইন চালু করার আবেদন জনাচ্ছেন।' তাবাসসুমের দিকে তাকালেন ব্রিগেডিয়ার

কাজেমি। 'আরেকজন ইলিয়াস মোস্তাফা আমার বন্ধু, তাবাসসুমের বাবা। উনি একজন মেজর জেনারেল হিসেবে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছেন। বর্তমানে পিণ্ডি সেন্ট্রাল জেলের জেইলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।'

ব্রিগেডিয়ার থামতেই তাবাসসুম রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের তদন্তের সঙ্গে এই নামের কি সম্পর্ক, রানা?'

'সেটা আমি পরে ব্যাখ্যা করব,' বলল রানা। 'তবে তোমার বাবা একাত্তর সালে যদি বাংলাদেশে ডিউটি করে থাকেন, তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে।'

'যদিও তখন আমার জন্মই হয়নি, তবে পরে শুনেছি যে ওই সময় আব্বা বাংলাদেশে ছিলেন–মেজর হিসেবে।'

'জানিয়ে রেখো, আমি একসময় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' ব্রিগেডিয়ারের দিকে তাকাল রানা। 'আপনাদের তদন্ত যেহেতু এগোচ্ছে না, দাবির টাকা মিটিয়ে দিয়ে দেখলে হয় না কি ঘটে?'

'এটা নিয়ে আমরাও ভেবেছি। কিন্তু এগারো বিলিয়ন অনেক টাকা। তবে ওপর মহলে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে, শেষ পর্যন্ত হয়তো টাকা দেয়ার সিদ্ধান্তই নিতে হবে। দেখা যাক আপনি কতটুকু কি করতে পারেন–দিন সাতেক সময় তো পাবেনই।' রানাকে চেয়ার ছাড়তে দেখে ব্রিগেডিয়ার কাজেমিও দাঁড়ালেন, আবার বাড়িয়ে দিলেন ডান হাতটা।

বিদায় নিয়ে ব্রিগেডিয়ারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসতেই তাবাসসুম ইঙ্গিত করল রানাকে, করিডর ধরে পাশাপাশি হেঁটে একটা অফিস কামরার দিকে এগোচ্ছে ওরা। করিডরে, দু'পাশের কামরাতেও, প্রচুর এজেন্ট; কেউ কাজে ব্যস্ত, কেউ বা এমনিই ঘোরাফেরা করছে। প্রায় প্রত্যেকেই ওদেরকে দেখে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠল। গোটা অফিসের পরিবেশে যেন একটা বৈরী ভাব, একটা বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়েছে।

নিজের অফিস কামরায় নিয়ে এসে রানাকে বসাল তাবাসসুম, পার্সোনাল সেক্রেটারিকে ডেকে দু'কাপ কফি দিতে বলল, তারপর রানার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে ফটোস্ট্যাট করতে পাঠাল স্পেশাল

ক্র্যাক কমান্ডো ইউনিটের গ্রুপ ফটোটা। রানা লক্ষ করল, তাবাসসুমের স্বভাবগত একটা বৈশিষ্ট্য হলো, নিরবে এবং এক মনে নিজের কাজ করে যাবার প্রবণতা। কফি এলো, পার্সোনাল সেক্রেটারি গ্রুপ ফটোটার অনেকগুলো ফটোস্ট্যাট কপিও করে আনল। তাবাসসুম কিন্তু বসে নেই। 'দেখি, আব্বাকে পাওয়া যায় কিনা,' বলে টেলিফোন নিয়ে কামরার এক প্রান্তে জানালার পাশে চলে গেল, বাপের সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলছে। তার কিছু কথা শুনতে পেল রানা, কিছু পেল না। তবে যা শুনল তা থেকে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে গেল। তাবাসসুম তার আব্বার সঙ্গে থাকে না। আজ অনেক দিন পর মেয়ে ফোন করায় আব্বু খুব খুশি। মেয়ে জানতে চাইল, 'তুমি কি এখন বাড়িতে একা, নাকি ভদ্রমহিলাও আছেন?' এর সম্ভাব্য অর্থ করল রানা, তাবাসসুমের বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন, ভদ্রমহিলা বলতে সৎমাকে বোঝাচ্ছে সে। এরপর রানার প্রসঙ্গ তুলল তাবাসসুম। অপরপ্রান্ত থেকে তাকে সম্ভবত জেরা করার সুরে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হলো। উত্তর দিতে দিতে এক সময় বিরক্ত হয়ে তাবাসসুম বলল, 'এত কথার দরকার কি, স্পষ্ট করে বলো আমরা আসব কি আসব না।' একটু পর বলল, 'ঠিক আছে, পৌঁছাতে যতক্ষণ লাগে।'

সেই একই সিতারা রোড কিং আর সেই একই ড্রাইভার আফতাব ওদেরকে রাওয়ালপিণ্ডিতে নিয়ে এলো। কাশ্মীর রোড ও ব্যাংক রোডের মোড়ে ইংলিশ স্থাপত্যরীতিতে তৈরি বিরাট এক ম্যানশন-এ থাকেন সাবেক মেজর জেনারেল, বর্তমানে জেইলার ইলিয়াস মোস্তাফা। আজ ছুটির দিন বলে নিজের বাড়িতে রয়েছেন তিনি, তা না হলে হপ্তার বাকি ছ'দিন পিণ্ডির সেন্ট্রাল জেলখানার ভেতর সরকারী কোয়ার্টারে থাকতে হয় তাঁকে।

পথে তেমন কোন কথা হলো না, তাবাসসুম শুধু জানাল যে আব্বার সঙ্গে আলাপটা যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সেরে নিতে হবে রানাকে, কারণ তার সৎমা শপিং সেরে ফেরার আগেই বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসতে চায় সে। কারণটা রানা জানতে চায়নি, আন্দাজ করে নিয়েছে।

জেনারেল মোস্তাফা ওয়াকিং স্টিক নিয়ে হলরুমে পায়চারি করছিলেন। তাঁর উত্তেজনা ও অস্থিরতা গোপন থাকছে না। ট্রাউজার ও শার্টের ওপর রক্তলাল সোয়েটার পরেছেন ভদ্রলোক, কালো ও চকচকে ঠিক যেন একটা কেউটে সাপ ছড়িটা। তাবাসসুম পরিচয় করিয়ে দিতে জোর করে হাসলেন একটু, রানাকে একটা সোফা দেখিয়ে বসার ইঙ্গিত করলেন, ভান করলেন করমর্দনের জন্যে ওর বাড়ানো হাতটা তিনি দেখতে পাননি।

তাবাসসুমের চোয়াল শক্ত ও চোখের দৃষ্টি ঠাণ্ডা হয়ে উঠতে দেখল রানা। সে ওর পাশের সোফায় বসতে যাচ্ছে দেখে জেইলার ভদ্রলোক ঠাণ্ডা সুরে বললেন, 'বাংলাদেশী এই তরুণ স্পাইকে আমার হয়তো এমন কিছু কথা বলতে হবে যা তোমার শোনা উচিত নয়। তারচেয়ে, তাবাসসুম, তুমি বরং আমার স্টাডিতে গিয়ে দেখো নতুন কি কি বই কিনলাম।'

'ওকে এখানে নিয়ে এসে আমি কি কোন অপরাধ করে ফেললাম?' বাপকে প্রশ্ন করল তাবাসসুম। 'তোমার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে ওকে তুমি অপমান করতে চাইছ। সেক্ষেত্রে কোন আলোচনারই দরকার নেই। রানা, সত্যি আমি দুঃখিত, চলো আমরা ফিরে যাই...'

'মাই ডিয়ার লেডি...,' অসহায় ভঙ্গিতে শুরু করলেন সাবেক মেজর জেনারেল ইলিয়াস মোস্তাফা।

রানা মাঝখান থেকে বলল, 'উনি যদি আমার সঙ্গে অযৌক্তিক ব্যবহার করেন, এই সিরিয়াল কিলিং কেসটা সমাধান করতে সেটাও আমাকে সাহায্য করবে, তাবাসসুম। প্লীজ, কিছুক্ষণ আমাদের দু'জনকে আলাদা থাকতে দাও।'

বাপের দিকে কটমট করে একবার তাকিয়ে হলরুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল তাবাসসুম।

'ইয়াংম্যান,' পায়চারি থামিয়ে রানার সামনে দাঁড়ালেন জেনারেল, 'ফটোগ্রাফটার পিছনে কার নাম লেখা ছিল তা তুমি ভাল করে জানো, কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক আমাদেরকে জানতে দিতে চাও না। দিস ইজ ব্যাড।'

বাপ-মেয়ের টেলিফোন আলাপ পরিষ্কারই শুনেছে রানা, সেই

খামের ভেতর ফটোগ্রাফের পিছনে কি আছে না আছে তা নিয়ে কোন কথাই হয়নি। 'আপনি কিভাবে জানলেন যে...'

'আর স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো নামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কোন ইউনিট কখনোই ছিল না,' জেনারেল এমন সুরে কথা বলছেন, রানার কথা যেন তিনি শুনতেই পাননি। 'মিশন: কেএইচকেএল? হোয়াট ননসেন্স!' পিছিয়ে গিয়ে নিচু টেবিল থেকে একটা এনভেলাপ তুললেন, এগিয়ে এসে ছুঁড়ে দিলেন রানার দিকে। 'এদের সবাইকেই আমি চিনতাম।'

এনভেলাপটা খুলে তাজ্জব বনে গেল রানা। পিএনএসএ হেড-অফিসে যে ফটোস্ট্যাট করা কপিটা রেখে এসেছে ও, এ নিশ্চয় সেটাই। কিন্তু ওরা পৌঁছানোর আগে কপিটা এখানে পৌঁছাল কিভাবে? এর একমাত্র উত্তর–পিএনএসএ চীফ ব্রিগেডিয়ার কাজেমি মূল ফটোর ফটোস্ট্যাট করা কপিটা পেয়েই লোক মারফত এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। 'চিনতেন?'

'হ্যাঁ, চিনতাম–পাস্ট টেন্স-এ বলছি। মাত্র একজন বেঁচে ছিল, রব্বানি। কাজেমি বলছে, তুমি নাকি তাকেও মারা যেতে দেখেছ।'

'বাকি আর সবাই...'

'কেউ বেঁচে নেই।'

'এদেরকে আপনি কিভাবে চিনতেন?'

'কিভাবে চিনতাম মানে? এরা আমার রেজিমেন্টের সোলজার ছিল সবাই। সেজন্যেই জানি, কোন স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডোর সদস্য ছিল না এরা কেউ। কিংবা "মিশন: কেএইচকেএল" নামে কোন অভিযানেও এরা অংশগ্রহণ করেনি।'

'তবে একাত্তর সালে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছিল ওদেরকে,' বলল রানা। 'নিশ্চয় ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দীও হয়?'

'রঙ! তুমি ভুল করছ, ইয়াংম্যান। একাত্তর সালে এদের কাউকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিল, এমন কোন রেকর্ড কোথাও তুমি খুঁজে পাবে না।'

রানা সোফা ছেড়ে দাঁড়াল। 'আপনার এ-কথার অর্থ হচ্ছে–রেকর্ড ছিল, কিন্তু তা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।' ছবিটা এনভেলাপে ভরে

এগোল রানা, নিচু টেবিলটায় রেখে পিছু হটল। 'আপনার সঙ্গে আবার আমার কথা হবে, জেনারেল মোস্তাফা, তবে সেটা সম্পূর্ণ অন্য রকম পরিবেশে।'

'হোয়াট ডু ইউ মীন?'

জেনারেলকে হতভম্ব হতে দেখে রানা বিস্মিত। মনে প্রশ্ন, ঘটনাটা কি? এই ভদ্রলোকের নাম ইলিয়াস মোস্তাফা, রব্বানির তরফ থেকে ওকে দেয়া নামও তাই—এর মধ্যে তাৎপর্যটা কোথায়? রব্বানি একটা সূত্র দিয়ে গেছে—এস.সি.সি-র কমান্ডার ইলিয়াস মোস্তাফা। তার সৎ মেয়ে পিয়াসা জানিয়েছে, স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো ইউনিটের একটা মিশন ছিল, সেই মিশনের নাম—কেএইচকেএল। জেনারেল মোস্তাফা স্বীকার করছেন তাঁর রেজিমেন্টের সৈনিক ছিল ফটোর এই বিশজন, রব্বানি সহ সবাই তারা মারা গেছে। 'মাফ করবেন, আপনার আচরণ দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনি অনেক তথ্যই গোপন করে যাচ্ছেন সম্ভবত আমি একজন বাঙালী বলে। কেউ আপনাকে বলেনি যে আমরা এখানে এসেছি গুরুতর একটা বিপদ থেকে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে?'

'পাকিস্তান যদি বিপদে পড়ে থাকে, পাকিস্তানকে ভুগতে দাও,' গম্ভীর গলায় বললেন জেইলার ভদ্রলোক। 'আমি চাই না অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা হোক। সেটা কারও জন্যেই ভাল হবে না। তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও।'

হঠাৎ হলরুমে ফিরে এলো তাবাসসুম। তার চোখ-মুখের থমথমে ভাব দেখে বোঝা গেল আশপাশেই কোথাও ছিল সে, ওদের সব কথা শুনেছেও। বাপের দিকে নয়, রানার দিকে তাকাল। 'তোমাদের আলাপ শেষ হয়ে থাকলে ফিরি চলো, রানা,' বলল সে। 'অফিসে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'তুমি তো আবার এ-বাড়িতে কিছু খাও না,' মেয়ের উদ্দেশে বললেন জেনারেল। 'কিন্তু দুপুরের খানাটা না খাইয়ে ছেড়ে দিলে বাঙ্গালী বাবু কি ভাববে বলো তো...'

'তোমার কথাতেই ওর পেট এত ভরে গেছে,' হেসে উঠে বলল তাবাসসুম, সুরটা তেতো জহর, 'আল্লাহই জানে আবার কবে খিদে

পাবে ওর। চলে এসো, রানা।'

পিছন থেকে জেইলার ইলিয়াস মোস্তাফা একটু যেন রসিকতার সুরেই মেয়েকে বললেন, 'আমার ওপর তোমার রাগের কারণ দূর করার চেষ্টা হচ্ছে, ইনশাল্লাহ সফল হব আমরা।'

কিন্তু বাবার কথা তাবাসসুম সম্ভবত মনোযোগ দিয়ে শুনল না।

ছয়

ইসলামাবাদে ফেরার পথে গাড়ির ভেতর পরিবেশটা বিব্রত ও অস্বস্তিকর হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তা হলো না। বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার কোন ভাব না দেখিয়েও রানাকে তাবাসসুম প্রতিশ্রুতি দিল, 'একাত্তরে বাংলাদেশে ডিউটি দিয়েছেন এমন অনেক সামরিক অফিসারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে; প্রয়োজনে একে একে সবার কাছে তোমাকে নিয়ে যাব আমি। আর আব্বুর এই···সত্যি আমি দুঃখিত।'

'তোমার আব্বুর আচরণে আমি কিন্তু দুঃখ পাইনি,' বলল রানা। 'তবে ওঁকে আমার খুব দুর্বোধ্য লেগেছে।'

'এখন যদি তোমাকে আমি বলি যে একাত্তরে তোমাদের ওখানে আর্মি যা করেছে আব্বু তা কখনোই সমর্থন করতে পারেনি, তোমার মনে হবে আমি বানিয়ে বলছি। কিন্তু কথাটা সত্যি।' একটু থেমে আবার বলল তাবাসসুম, 'আব্বু ওই অপারেশনে ছিল, কিন্তু জ্ঞান হবার পর থেকে কখনোই তাকে আমি ওই সময়কার স্মৃতি রোমন্থন করতে শুনিনি। প্রসঙ্গটা কেউ তুললে বরং তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছে।'

রানা বলল, 'হয়তো মন সায় দেয়নি এমন কোন কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এ তারই প্রতিক্রিয়া।'

'কি জানি, হতেও পারে। তবে তোমাকে এ-ও আমার জানানো দরকার যে আব্বু নিজের দেশকে অসম্ভব ভালবাসে,' বলল তাবাসসুম। 'কথাটা তুমি কিভাবে নেবে আমি জানি না–মন সায় না দিলেও দেশের স্বার্থে কোন অন্যায় করতেও আমার আব্বুর বাধবে না।'

'হুঁশিয়ার করনেকে লিয়ে শুকরিয়া!' রানার কৃত্রিম গম্ভীর কণ্ঠস্বর গরুর হাম্বা-হাম্বা ডাকের মত শোনাল।

'আদাব আরজে।' সুন্দর এক ভঙ্গিমায় ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে কপালে হাত ঠেকাল তাবাসসুম। 'তুম মেহমান হো, ভাই, কিসকি ইতনা হিম্মত কে তুমকো কুরবানি দে স্যাকে–তোমহারা সাথ ম্যায় হুঁ না।'

'থ্যাঙ্কস।'

টেলিফোনে আগেই ইসলামাবাদ ম্যারিওট হোটেল-এর একটা স্যুইট রানার নামে বুক করা হয়েছে, ওদের গাড়ি রাজধানীতে ফিরে আসতে তাবাসসুম ড্রাইভারকে সেদিকেই যাবার নির্দেশ দিল। কিন্তু রানা বাধা দিয়ে বলল, 'কোন দরকার নেই, আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যেতে পারব।'

'বেশ,' যেন মন একটু খারাপ করেই বলল তাবাসসুম। 'তবে হোটেল ছেড়ে কোথাও যেয়ো না যেন। আমি তোমার লাহোর যাবার ব্যবস্থা করছি, সম্ভব হলে আজই। রাতে লং ড্রাইভে তোমার আপত্তি নেই তো?'

'জরুরী কোনও প্রয়োজন হলে আপত্তি নেই।'

তাবাসসুম ওদের হেডঅফিসের সামনেই নামিয়ে দিল রানাকে। স্ট্যান্ড থেকে একটা ট্যাক্সি–সিতারা রোড স্টার–নিল ও, ড্রাইভারকে বলল, 'আগা খান রোড।' হোটেলের নামটা ইচ্ছে করেই বলল না।

স্কুল রোডে প্রচণ্ড ট্র্যাফিক জ্যাম লেগেছে দেখে শালিমার অ্যাভিনিউ-এ ঢুকল ড্রাইভার, স্পীড বাড়িয়ে পুরোটা রাস্তা দ্রুত পার হয়ে বাঁক নিচ্ছে, নাজিম-উদ-দিন রোড হয়ে কনস্টিটিউশন অ্যাভিনিউ ধরে উল্টোদিক দিয়ে আগা খান রোডে পৌঁছাবে। ওদের পিছনে কালো একটা মার্সিডিজকে দেখা গেল, তবে কিছুক্ষণ পর হারিয়ে গেল সেটা। আগা খান রোডে পৌঁছাতেই ড্রাইভারকে থামতে বলল রানা, ভাড়া

মিটিয়ে নেমে পড়ল–ইচ্ছে বাকি পথটুকু হেঁটেই হোটেলে উঠবে।

রাস্তার একদিকে পার্ক, আরেক দিকে বাগান সহ বেলুচিস্তান হাউস। বেশ অনেকটা হাঁটতে হবে রানাকে, কারণ আগা খান রোডের একেবারে শেষ মাথায় ওর ফাইভ স্টার।

নির্জন ফুটপাথ, এদিকে সাধারণত কেউ হাঁটাহাঁটি করে না। পরিচ্ছন্ন, চওড়া রাস্তা; গাড়িগুলো খুব দ্রুত গতিতে আসা-যাওয়া করছে। রানার সামনে, ফুটপাত ঘেঁষে একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে রয়েছে–কালো রঙের সেই মার্সিডিজটাই মনে হলো।

কাছে এসে নিশ্চিত হলো রানা, এই গাড়িটাকেই নাজিম-উদ-দিন রোডে দেখছে খানিক আগে। নিশ্চয়ই পার্কের ভেতর দিয়ে শর্টকাট রাস্তা ধরে আগে পৌঁছেছে, যদিও পার্কের ভেতর গাড়ি চালানো নিষেধ। তবে অবাক হলো গাড়ির ভেতর বা বাইরে কোন লোক-জন নেই দেখে।

সঙ্গে পিস্তল ও ছুরি আছে, কিন্তু শুধু সন্দেহবশত প্রকাশ্য দিবালোকে ওগুলো হাতে নেয়াটা হাস্যকর। এক মুহূর্ত পর মনে হলো, শুধু হাস্যকর নয়, বোকামিও হত। পিছনে পায়ের শব্দ শুনল রানা। তবে সামনের লোক দু'জনকেই আগে দেখতে পেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে সেদিকেও রয়েছে একজন। বোঝাই গেল, পার্কের ভেতর লুকিয়ে ছিল, নিচু রেইলিং টপকে ফুটপাথে নেমেছে।

ফুটপাথে আর মাত্র দু'জন পথিক আছে, তারা রানার দিকে পিছন ফিরে উল্টোদিকে হাঁটছে। রাস্তায় যানবাহনের কমতি নেই, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টায় গড়ে এক হাজার খুন-জখমের দেশে অচেনা লোককে কে সাহায্য করতে চাইবে? তাছাড়া, ওদের মাত্র একজনের হাতে পিস্তল, বাকি দু'জনের হাতে পরিচয়-পত্র। আইএসআই? নাকি গোয়েন্দা পুলিস? নিজেকে প্রশ্ন করল রানা, কেন ভাবছি এরা বিছা নয়–বা বিছার লোক নয়?

রানা ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

হুকুমই, তবে সুরটা নরম, পিছন থেকে এলো, 'গাড়িতে উঠে পড়ো, রানা।' রানা অনুভব করল শিরদাঁড়ার পাশে পিস্তলের মাজল ঠেকল। 'আগে সার্চ করো ওকে,' পিছন থেকে বাকি দুই সঙ্গীকে

নির্দেশ দিল লোকটা।

সামনের লোক দু'জন এগিয়ে এলো। একজন দাঁড়াল সামনে, আরেকজন ডান পাশে। সামনের লোকটা রানার জ্যাকেটের ভেতর হাত ভরে ওয়ালথারটা বের করে নিল। পকেটে না ভরে হাতেই রাখল সেটা। সার্চ করল ঠিকই, কিন্তু ছুরিটার অস্তিত্ব টের পেল না। 'গাড়িতে ওঠো, রানা,' পাশ থেকে বলল অপর লোকটা, হাতের পরিচয়-পত্রের ভাঁজ না খুলেই দেখাল রানাকে। 'আমরা সরকারী গোয়েন্দা অফিসার—আইএসআই।'

'গাড়িতে উঠতে হবে কেন? আমাকে তোমাদের কি দরকার?'

'আমরা জানতে চাই মারা যাবার আগে সাইফুল রব্বানির সঙ্গে তোমার কি কি বিষয়ে কথা হয়েছে,' সামনের লোকটা জবাব দিল।

'রব্বানির কাছ থেকে আমি একটা···' শুরু করেও থেমে গেল রানা। ভাবল, এরা কি সত্যি আইএসআই?

'কি হলো, চুপ করে গেলে যে?'

'রব্বানি সম্পর্কে যা বলার সব আমি এনএসআই-কে বলেছি,' বলল রানা। 'তোমরা সেখান থেকে জেনে নিচ্ছ না কেন?'

'আমরা সবকিছু ফার্স্ট হ্যান্ড পছন্দ করি,' পিছন থেকে পিস্তলধারী বলল। 'সেকেন্ড হ্যান্ডে বিশ্বাসী নই।'

'ঠিক আছে, আইডি দেখাও।' হাত পাতল রানা।

পাশের লোকটা কার্ডটা দিল রানাকে। খুলে দেখল রানা। আইএসআই চীফের সই সহ ওদের হেডঅফিস থেকে ইস্যু করা কার্ড, কোথাও কোন খুঁত নেই, তবে আগে যে-সব আইডি কার্ড দেখেছে রানা সেগুলোর চেয়ে এটার কাগজ একটু বেশি সাদা ও চকচকে। 'এটা তোমরা নকল করেছ,' মুখের ওপর বলে দিল রানা। 'তোমরা আইএসআই এজেন্ট নও।'

'নই,' সামনের লোকটা বলল, 'কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। তোমাকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি, নিয়েও যাব।'

'কোথায়?'

'সেটা বলা যাবে না।'

'কার কাছে?'

'তাও বলা যাবে না।'

'রাজপুত বীর মথুরায় যাবে, এটার পিছনে যুক্তি আছে, কিন্তু ম্লেচ্ছ বা যবনদের দেশে কি করছে সে?' বিপদ ও অস্ত্রের হুমকি অগ্রাহ্য করে প্রায় কৌতুকের সুরেই প্রশ্নটা করল রানা।

তিনজন হকচকিয়ে গিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। তারপর সামনের লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, মাথুর মানে মথুরা আর চৌহান রাজপুত বীর রাজবংশের খেতাব। আমরা তার কাছেই নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।'

'আচ্ছা!'

'অত নাটক কোরো না তো!' পিছনের লোকটা কর্কশ সুরে বলল। 'যা বলছি শোনো। আমাদের ওপর হুকুম আছে প্রয়োজনে জখম ও অজ্ঞান করে হলেও তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।'

লোকগুলোকে রানার আনাড়ি লাগছে, এদের মধ্যে পেশাদারি দক্ষতার ছিটেফোঁটাও নেই। তাছাড়া, এরা ভারতীয় চর হলেও ভারতীয় নাগরিক বলে মনে হচ্ছে না। তিনজনই মনে হয় পাকিস্তানী। তবে মুসলমান না-ও হতে পারে। চেহারায় খ্রিস্টান খ্রিস্টান একটা ভাব আছে। 'ঠিক আছে, মাইকেল ফিলিপ, চলো তোমাদের মাস্টার স্পাই মহোদয় চৌহানের সঙ্গে দেখা করে আসি,' সামনের লোকটাকে বলল রানা।

লোকটা শুধু বলল, 'আমার নাম মাইকেল নয়, ইমানুয়েল...'

'চোপ!' বুলেট ছুটল পাশের লোকের মুখ থেকে। 'তুই এত বোকা...'

'তোমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে, নাকি আমাকে নিয়ে যাবে তার কাছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বুঝতে পারছ না, তার দর্শন লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছি আমি!'

পিছন থেকে হিসহিস করে উঠল লোকটা, 'ভেবো না তোমাকে নিয়ে গিয়ে জামাই আদর করা হবে। আমাদের যা জানার জেনে নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়া হবে তোমাকে, ওখান থেকে সোজা তুমি নিজের দেশে ফিরে যাবে, বুঝেছ?'

কথা না বাড়িয়ে মার্সিডিজের ব্যাকসিটে উঠে বসল রানা। ওদের

একজন বসল ড্রাইভিং সিটে, বাকি দু'জন ওর দু'পাশে। স্টার্ট দেয়াই ছিল, দরজা বন্ধ হতেই গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

ইসলামাবাদ ম্যারিওটকে হাতের বাঁয়ে রেখে বাঁক নিল মার্সিডিজ, আজাদ কাশ্মীর হাউসকে পাশ কাটিয়ে উঠে এলো খাইয়াবান-ই মারগালা হাইওয়েতে। ইসলামাবাদের মানচিত্র দেখা আছে রানার, জানে সামনে পড়বে বিখ্যাত শাহ ফয়সল মসজিদ। এই রাস্তা ধরে ট্যাক্সিলা বা অ্যাবোটাবাদ পর্যন্ত যাওয়া যাবে। ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না, কারণ পিএনএসএ-র চীফ ওকে জানিয়েছেন মাথুর চৌহানকে শেষবার দেখা গেছে লাহোরে, আর লাহোর ইসলামাবাদের পশ্চিমে নয়, নিচের দিক অর্থাৎ দক্ষিণে।

তবে ফয়সল মসজিদ ছাড়িয়ে আসার পর বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে বাহারিয়া রোডে পড়ল মার্সিডিজ, ড্রাইভার সম্ভবত দক্ষিণ দিকে রওনা হবার আগে নিশ্চিত হয়ে নিল ওদেরকে কেউ ফলো করছে কিনা।

ওদের গন্তব্য আন্দাজ করার পর সুযোগের অপেক্ষায় থাকল রানা, তারপর যেই বাঁক ঘুরে সরু একটা রাস্তায় পড়ল মার্সিডিজ, অমনি কৌশলটা কাজে লাগাল।

ওর বাঁ পাশে বসা লোকটা খেয়াল রাখছে কোন পথ ধরে এগোচ্ছে গাড়ি, মাঝেমধ্যে পথ-নির্দেশও দিচ্ছে ড্রাইভারকে। কিন্তু অপর পাশে বসা সঙ্গীটির চোখ বা তার পিস্তলের মাজল রানার দিক থেকে মুহূর্তের জন্যেও সরেনি। কাজেই সরাবার জন্যে তাকে একটু উৎসাহ দিল রানা।

'এই, সাবধান!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। 'সামনে বিপদ!'

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির স্পীড কমাল ড্রাইভার, এবং ব্যাকসিটের লোক দু'জন মাথা উঁচু করে আধ সেকেন্ডের জন্যে সামনের দিকে তাকাল। এটুকুই দরকার ছিল। ডান পাশে বসা লোকটার পিস্তল ধরা হাতে জোরে একটা কোপ মারল রানা। পিস্তলটা মেঝেতে পড়ে গেল। লোকটা সেদিকে হাত বাড়াতে হাতের কিনারা দিয়ে দ্বিতীয় কোপটা মারল রানা তার গলায়। লোকটার কণ্ঠনালী থেঁতলে যাওয়ায় কাতর ও দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরুচ্ছে।

অপর লোকটা রানার কব্জি চেপে ধরল দু'হাতে, ঝটকা মেরে সেটা

ছাড়িয়ে নিয়ে তার মুখে ডান হাতের কনুই দিয়ে বাড়ি মারল ও। নাক ভাঙল, ঠোঁট কাটল, চোখ কোণ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

ওদিকে মার্সিডিজ এই মুহূর্তে বেহেড মাতাল। ড্রাইভার একহাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে, তার অপর হাতে বেরিয়ে আসা পিস্তল রানার দিকে তাক করা। 'থামো, রানা! থামো বলছি! ইউ ব্লাডি বাস্টার্ড!'

পিস্তলটা গাড়ির ছাদের দিকে ঠেলে দিল রানা, কব্জিটা ধরে গায়ের জোরে মোচড়াল। সাইড উইন্ডোর কাঁচ গুঁড়িয়ে দিয়ে একটা বুলেট বেরিয়ে গেল। ডান কপালের পাশে তীক্ষ্ণ ব্যথা, তারপর জ্বালা অনুভব করল ও—কাঁচের উড়ন্ত টুকরো গেঁথে গেছে ওখানে।

ইতিমধ্যে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে ড্রাইভার। মার্সিডিজ যেন নিজের খুশিমত একবার রাস্তার এদিকে থাকছে, আরেকবার ওদিকে ছুটছে। ভাগ্যিস স্পীড খুব বেশি ছিল না, ফলে ফুটপাথে উঠে এসে লাইটপোস্টে ধাক্কা মারলেও গাড়ি উল্টে পড়ল না। লাইটপোস্টটাও শুধু কাত হলো—তবে উইন্ডস্ক্রীন ভেঙে গাড়ির সামনের হুডের ওপর চলে এসেছে ড্রাইভার—পুরোটা নয়, আংশিক।

গাড়ির মেঝে থেকে নিজের পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে দু'পাশের লোক দু'জনকে দু'তিনটে করে ঘুসি মারল রানা, তারপর ডানদিকের দরজা খুলে বাইরে বেরুল। ড্রাইভার তখনও জ্ঞান হারায়নি, রানা দেখল শরীরটাকে গাড়ির ভেতর ঢুকিয়ে নিচ্ছে সে।

'ধন্যবাদ,' মুচকি হেসে তাকে বলল রানা। 'আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না।'

সার্ভিস রোড ধরে কোহিস্তান রোডের মোড়ে এসে ট্যাক্সি পেল ও।

সাত

'সময় যেহেতু অত্যন্ত কম,' দু'জনের জন্যে ফেলা টেবিলের ওদিক থেকে বলল তাবাসসুম, স্বল্প পরিসরে তার সান্নিধ্য ও রূপ-মাধুর্য উপভোগ করছে রানা, 'ব্রিগেডিয়ার বললেন, আজ সন্ধের দিকেই লাহোরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়া উচিত আমাদের।'

'আমাদের?' রানার নিশ্চিত হতে চাওয়াটা স্বাভাবিক। সড়ক পথে লাহোর ইসলামাবাদ থেকে অনেক দূরে, গাড়ি নিয়ে গেলে সারারাত লেগে যেতে পারে। নারী-স্বাধীনতার হার যেখানে প্রায় শূন্যের কোঠায় সেখানে ব্রিগেডিয়ার কাজেমির নীতিবোধ, জেনারেল মোস্তাফার সংস্কার, তাবাসসুমের ভীতি—এ-সব কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবে না? রানার সঙ্গে তাবাসসুম একা যাবে?

জবাবটা দিল তাবাসসুম সাত বছর বয়সে ফিরে গিয়ে মৃদু হাততালির সঙ্গে, রোমাঞ্চ ও শিহরণে কেঁপে উঠে, 'বিলিভ মি, রাতে লং ড্রাইভে কোথাও যেতে সাংঘাতিক মজা লাগে আমার, দারুণ থ্রিল ফীল করি।'

সঙ্গে করে কাঁধে ঝোলাবার মত চামড়ার একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছে তাবাসসুম, ওটায় তার কিছু কাপড়চোপড় আছে। তবে এখন তার পরনে জিনস্ আর সাদা পপলিনের শার্ট-ইন করা। তবে এই ড্রেস পরা সত্ত্বেও দুই কাঁধ থেকে বুকের ওপর একটা দোপাট্টা ঝুলে আছে। চুল আগের মত লালচে সোনালি নয়, কালো উইগ বা পরচুলা পরেছে সে। তা সত্ত্বেও তাকে উপমহাদেশের মেয়ে বলে মনে হয় না।

আগেই বলা ছিল, ঠিক সময়মতই রানাকে ম্যারিওট থেকে অফিশিয়াল গাড়িতে তুলে নিয়েছে তাবাসসুম।

'তোমার লালচে-সোনালি বিদেশী চুল আর চোখের নিশ্চয়ই ইন্টারেস্টিং কোন গল্প আছে,' বলল রানা। 'শোনাবে নাকি?'

'না, শোনাব না,' কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফোলাল তাবাসসুম। 'জিজ্ঞেস করতে এত দেরি করলে কেন!'

'না! কোথায় দেরি করলাম! তোমাকে এয়ারপোর্টে দেখার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছি,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু আমি জানব কি করে যে তুমি আমার মনের কথা শুনতে পাওনি?'

'তুমি তো দেখছি···,' হাসি পেয়ে যাওয়ায় কথাটা আর বলা হলো না তাবাসসুমের। 'শোনো, আমার আম্মি ব্রিটিশ লেডি। এটাই আমার চুল আর চোখের গল্প। সে এখন লন্ডনে। তুমি কি আমার আম্মির গল্পও শুনতে চাও?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, আমার কোন কৌতূহল নেই। তবে যদি কোন দিন দেখা হয় তাহলে অবশ্যই তাঁকে একটা ধন্যবাদ দেব আমি।'

'কেন?' তাবাসসুম অবাক হো বটেই, কৌতুকও বোধ করছে। 'আম্মি আবার তোমার কি উপকার করল?'

'আমার হয়তো নয়,' বলল রানা, 'তবে আমার চোখ দুটোর ভারি উপকার হয়েছে তিনি তোমার মত এত সুন্দর একটা মেয়েকে জন্ম দেয়ায়।'

'ওহ্, গড! ইউ আর সো ফানি!'

ইসলামাবাদ গলফ ক্লাব ও আমেরিকান সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর কাছাকাছি অভিজাত ফরাসী রেস্তোরাঁ লা পাঁজ-এর এই টেবিল তাবাসসুমই টেলিফোনের মাধ্যমে বুক করেছে, লাহোরের উদ্দেশে লং ড্রাইভ শুরুর আগে রানাকে ডিনার খাওয়াবে। অর্ডার দেয়ার পর চৌহান বাহিনীর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের ঘটনাটা তাকে শোনাল রানা।

'বস্ শুনলে উত্তেজনায়···তুমি তাঁকে ফোন করেছ?' জিজ্ঞেস করল তাবাসসুম।

পকেট থেকে বের করে মোবাইল ফোনটা টেবিলে রাখল রানা। 'আমি চাই রিপোর্ট করার দায়িত্বটা তুমি পালন করবে।'

ফোনটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কি মনে করে হাসল

তাবাসসুম। 'ধন্যবাদ, রানা। মোবাইলটা আমার খুব কাজে লাগবে।' ব্যাগ খুলে ফোনটা ভেতরে রেখে দিল সে।

লা পাঁজের পরিবেশ মনে প্রশান্তি এনে দেয়। কোথাও কোন আলো নেই, শুধু প্রতি টেবিলে মোমদানি রাখা আছে, যার যে-ক'টা খুশি জ্বালিয়ে নিতে পারে। কাঁচের তৈরি মেঝে, প্রতিটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দশ ইঞ্চি, চৌকো ও রঙিন, ওয়েটাররা যেটায় পা ফেলবে সেটার নিচেই আলো জ্বলে উঠবে। তারা সবেমাত্র ওদের টেবিলে ডিনার পরিবেশন শুরু করেছে, এই সময় দীর্ঘদেহী ও দেশলাইয়ের বাক্সের মত চৌকো এক লোককে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মুখে কোন দাগ নেই, তবে পেশিগুলো উঁচু আর ফোলা ফোলা। দাগ একটা আছে, তবে সেটা মুখে নয়, গলার বাঁ দিকে, শার্টের কলার দিয়ে ঢাকা। ঘন ভুরুর ভেতর কালো চোখ দুটোয় শীতল ও নির্লিপ্ত এমন একটা ভাব আছে, যেন লোকটার যা বয়স তারচেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন ওগুলো।

'দীনা? দীনা তাবাসসুম?' ওদের টেবিলের পাশে থামল সে। 'ইয়েস! উইগ পরায় চিনতেই পারছিলাম না। অ্যাস্টনিশিং!'

তাবাসসুম সাড়া দিল ঠোঁট টান টান করে, 'মিস্টার একরামুল আলভি! আবার দেখা হওয়ায় ভাল লাগল।'

'তোমাকে আর তোমার বন্ধুকে আমাদের টেবিলে নিতে এসেছিলাম,' অমায়িক হেসে বলল একরামুল আলভি। হাসার সময় মুক্তোর মত ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। রানা লোকটার বয়স আন্দাজ করল ত্রিশ কি বত্রিশ, তার বেশি নয়। ইঙ্গিতে এককোণে, নিজেদের টেবিলটা ওদেরকে দেখাল সে। টেবিলটায় আট-দশটা মোম জ্বলছে, ওই মোমের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে অপরূপ সুন্দর এক তরুণীর মুখ। 'কিন্তু এখানে তো দেখছি ডিনার পরিবেশন শুরু হয়ে গেছে!'

'হ্যাঁ,' বলল তাবাসসুম। 'পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি মাসুদ রানা, আর ইনি একরামুল আলভি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'মাই প্লেজার।'

এক মুহূর্ত রানাকে খুঁটিয়ে দেখল লোকটা, শীতল ও নির্লিপ্ত চোখ

দুটো একটু যেন চকচক করে উঠল। 'তুম বাঙ্গাল হো।'

কেউ দেখতে না পেলেও, রানার শরীর দপ্ করে জ্বলন্ত একটা মশালে পরিণত হয়েছে। 'অওর তুম কাঙ্গাল হো!' বলে হাসল রানা, নিজেকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে।

'নো অফেন্স, মাই ফ্রেন্ড!' আহত বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে রানার কাঁধে একটা হাত রাখল একরামুল আলভি। 'বন্ধু মনে করেই তুমি বলেছি তোমাকে। যদিও প্রতিশোধ নিতে এক সেকেন্ডও দেরি করোনি তুমি, তবু অপরাধ হয়ে থাকলে মাফ চাই আমি।' রীতিমত হিন্দুয়ানি ভঙ্গিতে করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে সে। 'এভাবেই তো ক্ষমা চাইতে হয়, তাই না, তোমাদের বাঙ্গাল মুলুকে?'

'আরও অনেক রীতি প্রচলিত আছে,' হাসিটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখেই কাঁধ থেকে আলভির হাতটা ধরে নামিয়ে দিল রানা। 'তার মধ্যে একটা হলো আছাড় খেয়ে পড়ে পায়ের ওপর মাথা ঠোকা।'

'ওটা ইসলামিক নয়, ডিয়ার ফেলো,' বলল আলভি, শুরু করার পর বাধ্য হয়ে গোটা ব্যাপারটাকে কৌতুক হিসেবে নিতে হচ্ছে তার। 'পূজা বা প্রণামের সমতুল্য হয়ে যায়।'

হাত জোড় করে ভঙ্গিটা দেখাল রানা। 'এটা কি? ইসলামিক?'

'এটাও ইসলামিক নয়, তবে আমি জানি বাঙ্গাল মুলুকে তোমরা হিন্দুদের এই রীতিতেই ক্ষমাপ্রার্থনা করো বা অভিবাদন জানাও,' বলল আলভি। 'তুমি কি বলবে আমার জানাটা সঠিক নয়?'

রানা আলভির দিকে একটা আঙুল তুলল। 'আমি বলব তুমি সিম্প্লি একটা বুদ্ধু।' পরমুহূর্তে টেবিলের তলায় একটা ঘটনা ঘটল—রানার পায়ে হাইহিলের ডগা দিয়ে খোঁচা দিল তাবাসসুম।

হেসে উঠল আলভি। 'না, স্বীকার করতে হবে, তাবাসসুমের টেস্ট বড়ই ইগ্‌জটিক। আমার জানা ছিল না যে এরকম টাফ অ্যান্ড রাফ পুরুষ মানুষ পছন্দ করে সে।' তাবাসসুমের দিকে ফিরল। 'আমাকে আমার টেবিলে ফিরতে হচ্ছে। দেখা করব, তোমার সঙ্গে অবশ্যই আমি দেখা করব।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল তাবাসসুম, রাবারের মত টান-টান হাসিটা আবার ফিরে এলো তার ঠোঁটে। 'হ্যাভ আ গুড ইভনিং।'

'আই অলওয়েজ ডু,' বলল আলভি, রানার দিকে তাকাল। 'আমি যদি তোমাকে কোনভাবে আহত করে থাকি, সত্যিই দুঃখিত।' চরম ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়ে আবার হাত জোড় করে বুকে ঠেকাল সে। 'নমস্কার, বঙ্গালী বাবু,' তারপর আর দাঁড়াল না, ঘুরে রওনা হলো নিজের টেবিলের দিকে।

প্রচণ্ড রাগে দিশেহারা, চেয়ার ছেড়ে আলভির পিছু নিতে গেল রানা, কিন্তু ওর কব্জি চেপে ধরে বসতে বাধ্য করল তাবাসসুম। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি জানো, ও কে? মন্ত্রী-মিনিস্টাররা পর্যন্ত ওকে সমীহ করে চলে। পাকিস্তানের সেরা ধনীদের একজন ওই লোক, এক ডজন ইন্ডাস্ট্রির মালিক...'

'কি বলতে চাইছ তুমি?' কটমট করে তাকাল রানা। 'ওই লোককে আমার ভয় করে চলতে হবে?'

ওর হাত ধরে মৃদু চাপ দিল তাবাসসুম। 'বলতে চাইছি, ওই লোককে আমি পছন্দ করি না। না, ওকে তোমার ভয় করে চলতে হবে না। তবে আমি চাই আমার মত তুমিও ওকে স্রেফ একটা উপদ্রব মনে করে এড়িয়ে চলবে।'

'এই রকম একটা লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কি করে?' রানার রাগ এখনও পড়ছে না।

'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আলভির ধারণা, আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন অফিসার। আমাদের ওই বিল্ডিঙে হোম ছাড়াও ডিফেন্স ও হেলথ্ মিনিস্ট্রির দফতরও আছে।' একটু থেমে আবার বলল তাবাসসুম, 'যে-ক'বারই দেখা হয়েছে, আমাকে নিয়ে এখানে সেখানে বেড়াতে যেতে চেয়েছে। কোন না কোন অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেছি আমি। লোকটার চোখ দুটো আমি পছন্দ করি না।'

রানার মনে কৌতূহল জাগল, সম্ভবত তাবাসসুমের সঙ্গে ওর অনুভূতি মিলে যাচ্ছে দেখে। 'কেন, আলভির চোখ দুটোয় কি আছে?'

'কি আছে বলতে পারব না।' শিউরে মত উঠল তাবাসসুম। 'তাকালেই গা শিরশির করে। ওর চোখ দুটো যেন কয়েক হাজার বছরের পুরানো।'

'হ্যাঁ, এরকম আমারও মনে হয়েছে। লোকটার চোখ দুটোয় অলৌকিক কি যেন আছে,' বলল রানা। 'তবে তুমি ওকে পছন্দ করো না–সম্ভবত ওর দৃষ্টিতে নোংরামি দেখতে পাও, তাই।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' তাবাসসুম সামান্য গম্ভীর হলো। 'তবে আমি ওকে প্রত্যাখ্যান করায় বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে লোকটা। শুনতে পাই, যখন যা চায় তখনই সেটা পেতে অভ্যস্ত সে। ওহ্-হো, বলাই তো হয়নি–সিতারা অটোমোবাইলের মালিক আলভি।'

'হুম।'

'ওর সঙ্গে এখন যে মেয়েটা রয়েছে, তার ইতিহাস জানলে চমকে উঠবে আলভি,' বলল তাবাসসুম। 'ওই মেয়ের সঙ্গে আফগান আন্ডারওয়ার্ল্ডের যোগাযোগ আছে, ইসলামাবাদের আশপাশের শহরগুলোয় সে-ই তো সমস্ত ড্রাগস সাপ্লাই দেয়।'

'তোমরা জানো অথচ এখনও মেয়েটা অ্যারেস্ট হয়নি যে?'

'ও ফারজানা ফাহিমা, একজন মন্ত্রীর ভাগ্নী, বুঝলে!' হাসল তাবাসসুম। 'তবে আসল কারণ তা-ও নয়। অ্যান্টি-নারকোটিক স্কোয়াড বহু চেষ্টা করেও মেয়েটাকে হাতেনাতে ধরতে পারছে না বা কোন প্রমাণও সংগ্রহ করতে পারছে না।'

ডিনার শেষ করে সিতারা রোড কিং নিয়ে লাহোরের উদ্দেশে রওনা হলো ওরা। রাতে আধা-সামরিক বাহিনী টহল দেয় হাইওয়েতে, ব্যারিকেড ফেলেও সার্চ করা হয়, ফলে রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছাতেই রাত প্রায় বারোটা বেজে গেল ওদের। রোড কিং ছোট আর হালকা গাড়ি, ফাঁকা রাস্তা সত্ত্বেও ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলের বেশি স্পীড তুলল না রানা, ড্রাইভিং সিট বদল করার সময় তাবাসসুমকেও নিষেধ করে দিল।

কিন্তু তারপর দেখা গেল পাহাড়ী রাস্তা এত ঘন-ঘন বাঁক নিয়েছে, স্পীড বিশ-পঁচিশের বেশি তোলাই যাচ্ছে না। চেক-পোস্ট এড়িয়ে সময় বাঁচানোর জন্যে হাইওয়ে থেকে সরে এসেছে ওরা, সেজন্যেই এই ভোগান্তি।

রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরে রিওয়াত, তারপর মানিকৈলা। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরেই রিওয়াতে এলো ওরা। রাস্তাটা আদিতে আফগান শাসক শেরশাহ সুরি-ই তৈরি করেছিলেন, ষোড়শ

শতাব্দীতে, এই ঐতিহাসিক রাস্তাটাই এখন ইসলামাবাদ থেকে ব্যাংকক পর্যন্ত এশিয়ান হাইয়ের একটা অংশ।

তাবাসসুম ব্যাখ্যা করল রিওয়াত শব্দটা আরবী রাবাত শব্দের অপভ্রংশ, অর্থ হলো 'থামার জায়গা'–চটি বা সরাই আর কি। রিওয়াত ছ'টা ফটক সহ সম্পূর্ণ ঘেরা ও সুরক্ষিত একটা দুর্গই বলা চলে। শহরটা ওই ঘেরা জায়গার ভেতর। ভাল কোন হোটেল না থাকায় ফটকগুলোকে পাশ কাটিয়ে এলো ওরা, সিদ্ধান্ত নিল মানিকেলায় রাত কাটবে।

রাজধানী থেকে রওনা হবার পর তাবাসসুম একটু উদ্ভট আচরণ করেছে, রানার মনে ব্যাপারটা প্রশ্ন ও সন্দেহের উদ্রেক করলেও বিষয়টা নিয়ে কোন কথা বলেনি।

প্রথমে তাবাসসুম তার বস ব্রিগেডিয়ার ইমরান কাজেমিকে রানার সঙ্গে ভারতীয় এজেন্টদের দেখা হবার ঘটনাটা রিপোর্ট করেছে। আরও সাবধান থাকার পরামর্শ দিয়ে ওদের সাফল্য কামনা করেছেন ব্রিগেডিয়ার। এরপর একে একে অনেকগুলো নম্বরে ডায়াল করল তাবাসসুম। প্রথমে জিজ্ঞেস করল, 'আংকেল? স্লামালেকুম। আমি দীনা। আমার মোবাইল নম্বরটা লিখে রাখুন। রিপোর্টটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চাই!'

পাঁচ-ছ'জন 'আংকেল'-এর কাছ থেকে কি রিপোর্ট চায় তাবাসসুম তা ব্যাখ্যা না করলেও, হাসিমুখে রানাকে বলেছে, 'আসলে ওঁরা কেউ আমার আংকেল নন, সবাই আব্বুর বন্ধু।'

মানিকেলা শহরটা রাওয়ালপিণ্ডি–লাহোর হাইওয়ের ওপর। এখানকার একটা পাথুরে ফাটলে প্রচুর চুনি ও মুক্তো পাওয়া গিয়েছিল, বলা হয় গৌতম বুদ্ধ অভুক্ত এক শার্দুল শাবকের খিদে মেটানোর জন্যে নিজের শরীরের একটা অংশ দান করেছিলেন এই জায়গায়। এদিকের মাটিতে এখনও লালচে একটা ভাব লক্ষ করা যায়। মানিকেলাতে প্রাচীন যুগের বহু মুদ্রা পাওয়া গেছে।

তাবাসসুমকে থামতে বলে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে ভাল কোন হোটেল আছে কি? সারারাত যদি গাড়ি চালাতে হয়, দিনের বেলা কাজ করব কিভাবে?'

'কি বলো! পুরাকীর্তি দেখতে বিদেশী ট্যুরিস্টরা সব সময় আসছে না! এদিকে হোটেলের কোন অভাব নেই,' বলেই ফিক করে হেসে দিল তাবাসসুম।

একটু পরই তার ওই হাসির অর্থ বোঝা গেল। কোথায় হোটেল, কোথায় কি! কিছু লোক মাঠের ধারে তাঁবু ফেলে বিদেশী ট্যুরিস্টদের রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। তবে একজন দালালকে পাওয়া গেল, রেস্ট-হাউসে পৌঁছে দেয়ার বিনিময়ে একশো টাকা দিতে হবে।

বাড়িটা আধ মাইল দূরে। দোতলায় পাশাপাশি দুটো কামরা খালি ছিল। দুটোই ভাড়া নিতে চাইলে রেস্ট-হাউসের প্রবীণ মালিক নিজের দাড়ি মোচড়ানো বন্ধ করে জানতে চাইল রানা ও তাবাসসুমের সম্পর্ক কি?

তাবাসসুমের জবাব রানাকেও হকচকিয়ে দিল। 'সম্পর্ক যা ছিল আগে ছিল, কাল সকালে ওকে আমি তালাক দিচ্ছি।'

'নেহি মেরি বেটি, ইয়ে কোঈ আচ্ছি বাত···'

বুড়োকে থামিয়ে নিয়ে তাবাসসুম কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'আপনি সব কথা জানেন না, তাই মানা করছেন। জানেন, এই লোক সকাল-সন্ধ্যা নিয়ম ধরে পেটায় আমাকে?'

'বুরি বাত, বহোত বুরি বাত···' দরজার তালা খুলে দিয়ে চলে গেল রেস্ট-হাউসের মালিক।

ঘরে ঢুকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'এর মানে?'

'যদি বলতাম আমরা ভাই-বোন, বুড়ো বিশ্বাস করত না,' জবাব দিল তাবাসসুম, হাসছে। 'যদি বলতাম স্বামী-স্ত্রী, তাহলে বলত কাবিননামা দেখাও—হোটেলে রাত কাটাতে চাইলে ওটা সঙ্গে রাখাই নিয়ম। কিন্তু তালাক দেব বলে বুড়োর মনটা আমি আরেক দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি, প্রমাণ-পত্র চাওয়ার কথা মনেই পড়েনি তার।'

'তা সত্যি সত্যি তো আর কাল আমাদের তালাক হচ্ছে না,' বলল রানা; চেহারায় এমন ভালমানুষি ভাব, যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না, 'তাই জানতে চাইছিলাম আমরা একঘরেই শোব কিনা।'

'অবশ্যই,' বলে পাশের ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল তাবাসসুম। 'তবে কল্পনায়।' দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে দিল সে। রানা কান পেতে

থাকায় বুঝতে পারল দরজায় তাবাসসুম তালা লাগায়নি।

বিশ্বাসের মর্যাদা ভঙ্গ করা হবে, তাই নিজে তো ওদিকে গেলই না, কবাট দুটো নিঃশব্দে আবার খুলে যায় কিনা দেখার জন্যে অপেক্ষাও করল না; শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

বেলা একটু চড়তে রেস্ট-হাউস থেকে বেরুল ওরা। একটা রেস্তোরাঁয় ব্রেকফাস্ট সেরে আবার গাড়ি ছোটাল রানা, লাহোরে পৌঁছাতে ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। সারা পথে টেলিফোন রিসিভ করতেই ব্যস্ত থাকল তাবাসসুম। একটা করে কল পায় আর একটু করে ম্লান হয় চেহারা। পাঁচ-সাতটা কল পাবার পর প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো তার। নিঃশব্দে সবই লক্ষ করছিল রানা, এবার জিজ্ঞেস না করে পারল না, 'আমি কি তোমাকে ফাইনাল কথা জানিয়ে দিয়েছি—তালাক দেবই?'

কিন্তু না, তাবাসসুমকে হাসানো গেল না। 'রানা,' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল সে, 'ব্যাপারটা সিরিয়াস। আমি কাল পিণ্ডি থেকে অফিসে ফিরে ছ'জন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলকে তোমার ওই কমান্ডো ইউনিটের গ্রুপ ফটোর একটা করে কপি পাঠিয়ে দিই, এবং চিঠি লিখে অনুরোধ করি এই ইউনিট সম্পর্কে বিস্তারিত যেন জানানো হয় পিএনএসএ-কে। এই ছয় জেনারেলই একাত্তর সালে বাংলাদেশে ছিলেন—বিভিন্ন র‍্যাঙ্কে...'

'ওঁরা বলছেন,' তাবাসসুমের বক্তব্য রানাই উচ্চারণ করল, 'এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না।'

'হ্যাঁ! কিন্তু তা কি করে হয়?'

রানা হাসল। 'কিছু মনে কোরো না, ওঁরা সবাই আসলে তোমার আব্বুর মতই দেশপ্রেমিক। অতীতে নিজেরা বা সঙ্গী-সাথীরা যে অপকর্ম বা পাপ করেছেন, দেশের স্বার্থে এখন সে-সব ভুলে থাকতে চান। অন্তত আমার তাই ধারণা।'

'তবে উল্টোটাও, মানে ওরা যা বলছেন, তা-ও সত্যি হতে পারে,' বলল তাবাসসুম। 'রব্বানি হয়তো তোমাকে ঠকাতে চেয়েছিল। ওই ফটোটা হয়তো কোন তাৎপর্যই বহন করে না।'

'এপর তুমি বলবে স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো নামে কোন ইউনিটের অস্তিত্বও ছিল না, কেএইচকেএল নামে কোন মিশনেও তারা যায়নি...'

'না,' ম্লান সুরে বলল তাবাসসুম, 'তা আর বলতে পারছি কোথায়। আব্বুর কথা তো আড়াল থেকে সবই শুনেছি। উনি ওই বিশজন সোলজারের অস্তিত্ব তো অস্বীকার করেননি, শুধু বলেছেন ওরা কোন কমান্ডো ইউনিটের সদস্য ছিল না, একাত্তর সালে বাংলাদেশেও যায়নি...'

'উনি এ-কথা বলেননি যে ওরা বাংলাদেশে যায়নি,' বাধা দিয়ে বলল রানা, 'বলেছেন, ওরা যে গিয়েছিল তার কোন প্রমাণ আমি খুঁজে পাব না। তুমিই বলো এর মানে কি?'

নিচু গলায় স্বীকার করতে হলো তাবাসসুমকে, 'মানেটা এ-ও হতে পারে যে রেকর্ড ছিল, কিন্তু নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।'

'আরেকটা কথা, তাবাসসুম। তোমাকে বলা যায়। ফটোটার পিছনে একজনের নাম লেখা ছিল। ওটা কার নাম, তোমার আব্বু জানেন বলেই আমার ধারণা।'

'নামটা তুমিও জানো,' বলল তাবাসসুম। 'ঘন কালি দিয়ে ঢেকে দেয়ার কাজটা তোমারই।'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে বলবে?'

'তুমি জানো না?' রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে তাবাসসুমের দিকে তাকাল রানা, দৃষ্টিতে অন্তর ভেদ করার ধার।

'মানে?'

'তোমার আব্বু যখন জানেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমার বসকেও বলেছেন,' বলল রানা। 'ফটোর কপিটা তো ব্রিগেডিয়ার কাজেমিই তাঁর কাছে পাঠান। তাই ভাবছি, তোমার বস্ কি ফটোগ্রাফারের নামটা তোমাকে বলেননি?'

'খোদার কসম, সত্যি বলেননি।'

'সত্যি যদি না বলে থাকেন, ধরে নিতে হবে ওঁরা তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।'

'মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে, তবে কথাটা সত্যি।'

'নামটা যেহেতু গোপন নেই বলেই আমার ধারণা, তোমাকে বলতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'তুমি মানুষকে অপেক্ষা করিয়ে রেখে মজা পাও, না?' তাবাসসুম যেন বিরক্ত।

'শাহিন শিকদার।'

'হোয়াট!' রানার কানের কাছে যেন বোমা ফাটল। গাড়ির নিয়ন্ত্রণ মুহূর্তের জন্যে হারিয়ে ফেলেছিল, হুইল ঘুরিয়ে আবার সিধে করল ওটাকে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি হলো, তাবাসসুম?'

'গাড়ি থামাও, রানা, প্লীজ। প্লীজ!' হতবিহ্বল দেখাচ্ছে তাবাসসুমকে।

ফাঁকা রাস্তার একধারে, ফুটপাত ঘেঁষে, গাড়ি থামাল রানা। 'তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ?'

'না!'

'তাহলে?'

'শাহিন শিকদার···এই নাম আমি শুনেছি, রানা! কিন্তু কোথায় শুনেছি, কার মুখে, কিছুই মনে করতে পারছি না।'

'শাহিন শিকদার নামে অনেক লোক আছে, তাই না? আমি যে শাহিন শিকদারের কথা বলছি তুমি হয়তো তাঁর কথা শোনোনি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে দাও।' বাম কপালের পাশটা টিপে ধরেছে তাবাসসুম। 'তোমার মুখে নামটা শুনে আমি চমকে উঠলাম কেন? এর একটাই অর্থ, আমি কোন স্বাভাবিক সাধারণ শাহিন শিকদারের কথা শুনিনি। এই নামে আমি যার কথা শুনেছি তার বিশেষ কোন গল্প আছে, বিশেষ কোন ট্রাজেডি আছে···'

'ভদ্রলোক একজন কর্নেল ছিলেন একাত্তরে।'

অকস্মাৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে পটকা ফাটাবার মত তুড়ি মেরে রানার বুকে তর্জনী তাক করল তাবাসসুম। 'একাত্তর সালে কোর্ট মার্শাল হয়?'

'হয়।'

'বাঙালী ভদ্রলোক?'

'রাইট।'

আবার চুটকি বাজাল তাবাসসুম, নতুন করে রানার দিকে তাক করল আঙুল। 'পদক আর পদবি কেড়ে নেয়া হয়? জেল হয় পঞ্চাশ বছরের?'

'হ্যাঁ।'

আবার চিৎকার বেরিয়ে এলো তাবাসসুমের গলা থেকে। 'আমার আম্মি সব জানে!'

'মানে?'

'আমি একজন কর্নেল শাহিন শিকদারের কথা আম্মির মুখে শুনেছি। তোমার বর্ণনা ও তথ্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। একাত্তর সালে তাঁর কোর্ট মার্শাল হয়। একজন বাঙালী।'

'আমি জানতে চাই আজও তিনি বেঁচে আছেন কিনা, থাকলে কোথায় আছেন।' রানা কোনরকমে উত্তেজনা চেপে রেখেছে।

'আম্মি আমাকে এই ভদ্রলোকের কথা বলেছেন, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত,' বলল তাবাসসুম। 'কখন বলেছেন, কি উপলক্ষে বা ঠিক কি বলেছেন তা তো ছাই কিছুই মনে করতে পারছি না।' একটু থেমে হাতটা মুখের কাছে তুলে আবার নামিয়ে নিল। 'আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে।'

'সেকি! কেন?'

'না-না, ভয় পাবার কিছু নেই,' তাড়াতাড়ি বলল তাবাসসুম। 'খুব বেশি উত্তেজনা হলে বা অসহায় বোধ করলে এরকম হয় আমার।'

'সাবধান, নিজের মনে করে আবার আমার হাতটাকে কামড়ে দিয়ো না।' হাসল রানা। তারপর আবার বলল, 'এত অস্থির হবার কি আছে, তোমার আম্মিকে টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়।'

'এখন কৌতূহল না থাকলেও আম্মির গল্প শুনতে হবে তোমাকে,' ম্লান সুরে বলল তাবাসসুম। 'আমি বলছি, তুমি গাড়ি ছাড়ো–পৌঁছাতে দেরি হলে মাথুর চৌহান আবার না পালিয়ে যায়।'

আবার গাড়ি ছাড়ল রানা। লাহোর আর খুব বেশি দূরে নয়।

'আমার আব্বু আর আম্মি দু'জনেই অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ,' শুরু করল তাবাসসুম। 'দেশ ভাগ হবার এক বছর পর লন্ডনে ওদের পরিচয়, প্রণয় ও বিয়ে। পরের বছর আমি হই। আমার বিশ বছর বয়সে ওরা দু'জন প্রায় একই সময়ে আবার প্রেমে পড়েন–আব্বু এক স্থানীয় গায়িকার, আম্মি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির এক ভারতীয় প্রফেসরের। ও, ভাল কথা, আম্মিও অক্সফোর্ডে পড়ায়–উর্দু সাহিত্য।

'গায়িকার বয়স আমার কাছাকাছি, দু'এক বছরের বড় হতে পারে। আমার ধারণা, আব্বুর বিষয়-সম্পত্তির লোভে বিয়েটা করেছে সে। আমাকে দেখলে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বাইরে কোথাও দেখা হলে চিনতে না পারার ভান করে। আব্বু এরই মধ্যে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

'আমার আম্মি বছরের একটা কি দুটো চিঠি লিখে জানতে চায় আমি কেমন আছি। তার টেলিফোন নম্বর আমার কাছে আছে। তবে ফোন করি না।'

'কেন?'

'যতবার করেছি, ওই প্রফেসর ভদ্রলোক ধরেন। আম্মিকে ডেকে দেয়ার বদলে যা বলার তাঁকেই বলতে বলেন। কাজেই আমি আর ফোন করি না।'

'সত্যি দুঃখ পেলাম,' আন্তরিক সুরে বলল রানা। 'দু'জনের কেউ তোমার কথা ভাবেননি শুধু নিজেদের সুখ-শান্তির কথা ভেবেছেন।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'সংসার বড় জটিল একটা জায়গা, বুঝলে তাবাসসুম। এখানে এমনকি সুখী হতে চাওয়াটাও একটা অপরাধ—ওঁরা হয়তো সেই অপরাধে অপরাধী। কি জানো, সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রাপ্য ভালবাসা, স্নেহ, সময়, যত্ন ইত্যাদি দিতে পারব না বলে আমি অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে বিয়েই করব না।'

'এ প্রসঙ্গে যদি চাই তো পরে আমরা তর্ক করব,' বলল তাবাসসুম। 'এখন আমার কি করা উচিত সেটা বলো। তুমি বললে আম্মিকে ফোনে পাওয়া যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে পারি আমি।'

'বলছি।'

রানার মোবাইল আইএসডি, এখনও সেটা তাবাসসুমেরই দখলে। বোতাম টিপে সরাসরি লন্ডনের একটা নম্বরে যোগাযোগ করল সে। অপরপ্রান্তে ভারতীয় অধ্যাপককেই পাওয়া গেল। তাবাসসুমের পরিচয় জানার পর তিনি বললেন, 'তুমি জানো না? তার সঙ্গে তো আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে। গত হপ্তায় দেখা হয়েছিল। বলল পাকিস্তানে, তোমার কাছে ফিরে যাবে। এখনও যায়নি?'

সব শুনে রানা বলল, 'অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তবে চেষ্টা

চালিয়ে যাও, হঠাৎ মনেও পড়ে যেতে পারে কর্নেল শিকদার সম্পর্কে ঠিক কি তিনি বলেছিলেন তোমাকে।'

'আমার না আবার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে!'

লাহোরে পৌঁছে সিটি রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পার্কওয়ে হোটেলে ঢুকল ওরা। পিএনএসএ অফিসে রিপোর্ট পৌঁছেছে, দু'দিন আগে এখানেই দেখা গেছে মাথুর চৌহানকে। তার চেহারা, কাভার ও ছদ্মবেশ সম্পর্কে টেলিফোনে বিশদ জানিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি। মাথুর চৌহান বর্তমানে আব্বাস সাকলায়েন, গো-মাংস ছাড়া রুটি বা ভাত কিছুই মুখে রোচে না, চোস্ত উর্দু বলে অনর্গল।

পার্কওয়ে হোটেল ছাড়াও আশপাশের কয়েকটা রেস্তোরাঁয় চুপিচুপি খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে জানা গেল, মাথুর চৌহানের মত দেখতে এক লোক এদিকে সত্যি ছিল, নাম আব্বাস সাকলায়েন, গোগ্রাসে গরু খেতেও দেখা গেছে তাকে। হ্যাঁ, পার্কওয়ে হোটেলেই উঠেছিল, সঙ্গে এক লোককে নিয়ে। তবে কাল সকালে বিদায় নিয়ে চলে গেছে তারা। কোথায় গেছে বলে যাবার কথা নয়, বলে যায়ওনি, তবে একজন ডেস্ক ক্লার্ক হাতে পাঁচশো রুপিয়া বকশিশ পেয়ে কসম খেয়ে জানাল; সম্রাট জাহাঙ্গীর আর সম্রাজ্ঞী নূর জাহান-এর সমাধি দেখতে যাবার প্ল্যান করছিল ওরা, দু'জনের একজনকে বলতে শুনেছে রাভি নদীর ওপারে আস্তানা গাড়াটাই নিরাপদ। এ-সব সে আড়াল থেকে শুনেছে।

'নদীর ওপারটা লুকিয়ে থাকার আদর্শ জায়গা, রানা,' আবার ওরা রওনা হতে তাবাসসুম বলল রানাকে। 'সম্রাট আর তাঁর স্ত্রীর সমাধি দেখার জন্যে সারা দুনিয়া থেকে কত রকমের লোক যে আসে, তাদের ভিড়ে লুকিয়ে থাকা খুব সহজ। ওদিকের নির্জন এলাকায় অনেক খালি বাড়িও ভাড়া পাওয়া যায়।'

'আমরা সাবধানে যাব, কোন রকম তাড়াহুড়ো করব না,' বলল রানা। 'চৌহান ইতিমধ্যে বোধহয় জেনে ফেলেছে যে আমরা তাকে খুঁজছি।'

গাড়ি ছুটছে আবার ফিরতি পথে; লাহোরে ওরা পুরানো ব্রিজ পার হয়ে ঢুকেছিল, বেরিয়ে যাচ্ছে নতুন ব্রিজ ধরে।

একঘেয়েমি কাটে না, রানাকে তাবাসসুম জিজ্ঞেস করল,

'লাহোরের ইতিহাস জানা আছে তোমার?'

'সাত খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ প্রাচীন লাহোর শহরের চমৎকার বর্ণনা দিয়ে গেছেন...'

'আরে, থামো। তুমি তো দু'হাজার বছর আগের কথা বলছ।' হাসছে তাবাসসুম। 'আমি তোমাকে চার হাজার বছর আগের কাহিনী শোনাইনি। লাহোর শহরের পত্তন হয় কাদের হাতে জানো? বিষ্ণুর সপ্তম অবতার দশরথপুত্র রামচন্দ্রের পরিচয় নিশ্চয়ই নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন নেই, তাঁরই দুই ছেলে এই শহর গড়ে তোলে।'

'চুপ, আস্তে!' ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা। 'শিবসেনারা শুনে ফেললে বিপদ হতে পারে!'

হেসে উঠল তাবাসসুম। 'ওদেরকে ঠেকাবার জন্যে আমাদের এখানেও ফ্যানাটিকের অভাব নেই। তাছাড়া, পাকিস্তান-ভারত এখন পারমাণবিক শক্তি, বাধ্য হয়ে দু'দেশকেই এখন সংযম প্র্যাকটিস করতে হবে।'

সময়ের অভাবে জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের সমাধিতে থামা হলো না, ব্রিজ পাঁচ মাইল পিছনে ফেলে এসে প্রথম যে লোকালয়টা পাওয়া গেল সেখানে গাড়ি থামাল রানা। জায়গাটা পুরোপুরি গ্রাম নয়, আবার শহরের সব সুবিধেও পাওয়া যাবে না। ক্ষেতে কাজ করছিল এক তরুণ, প্রশ্ন করে জানা গেল, সে এই এলাকার সর্দারের ছেলে। এদিকে নতুন কোন লোকজনকে দেখা গেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে তরুণ জবাব দিল, 'নতুন লোক তো রোজই আসা-যাওয়া করছে। তবে আমাদের এলাকায় কোন অবৈধ কাজ হয় না। খুন-খারাবি তো দূরের কথা, চুরি পর্যন্ত হয় না।'

'আমরা চোর ধরতে আসিনি। নতুন কেউ এসেছে কিনা জানতে এসেছি।'

'শুনলাম খবির খানের খালি বাড়িটা কাল দু'জন লোক দেখতে এসেছিল। তবে ভাড়া হয়েছে কিনা বলতে পারব না।' হাত তুলে গ্রামের চৌরাস্তাটা দেখিয়ে দিল সে।

'দু'জন লোক?' তাবাসসুমের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল রানা। 'নাহ, এরা নয়। আমরা একটা ফ্যামিলি খুঁজছি।'

চৌরাস্তায় পৌঁছে এক পান-দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে খবির খানের বাড়িটা কোন দিকে জেনে নিল রানা। গাড়িটা দোকানের পাশে রেখে পায়ে হেঁটে রওনা হলো ওরা।

মেঠো পথ ধরে কয়েকটা বাঁক ঘুরতে হলো। এদিকে প্রচুর গাছপালা আর লম্বা ঘাস দেখা যাচ্ছে। মেঠো পথ পাথুরে ঢাল হয়ে উঠল। পাহাড়ের মাথায় খবির খানের বাড়িটা চিনতে পারল ওরা। পথটা চওড়া, পাহাড়টাকে কয়েক প্যাঁচে জড়িয়ে চূড়ায় উঠেছে। ওখানে, বাড়ির সামনে, প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা। সাদা একটা টয়োটা। গাড়িটাকে লুকাবার কোন চেষ্টাই করা হয়নি, নিচের রাস্তা থেকেও দেখতে পাওয়া গেল। মাথুর চৌহান আরেকটু সতর্ক হলেই যেন মানাত। নাকি সে ধরে নিয়েছে নাম বদল করায় কেউ তার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাবে না?

পাহাড় প্যাঁচানো রাস্তার দু'পাশেই লম্বা ঘাস দেখা যাচ্ছে। সেই ঘাসের ভেতর দিয়ে চূড়ায় উঠে এলো ওরা। গাড়িটার আড়াল পাওয়ায় বাড়িটার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছানো গেল। বাড়িটার এদিকের জানালা, অন্তত একটা, খোলা। প্রায় একযোগে অস্ত্র বেরিয়ে এলো–রানার হাতে ওয়ালথার, তাবাসসুমের হাতে ছোট ক্যালিবারের একটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন পিস্তল। ইঙ্গিতে তাবাসসুমকে কাভার দিতে বলে একাই এগোল রানা। ক্রল করে গাড়িটাকে পাশ কাটাল ও, সরাসরি জানালার নিচে পৌঁছে সিধে হয়ে দাঁড়াল।

আগেই শোনা গেছে, এখন আরও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। জানালার কার্নিসে হাত রেখে শরীরটাকে উঁচু করল রানা। দেখল বড় একটা কামরায় তিনজন লোক ওরা। একজন দীর্ঘদেহী, সুদর্শন। পরনে ঢোলা সালোয়ার আর শার্ট, কাঁধে চাদর। মাথার পাগড়িটা সাদা। এই লোকটাই-মাথুর চৌহান।

চৌহান ঘরের ভেতর পায়চারি করছে, হাঁটার সময় কথা বলছে দু'জন লোকের উদ্দেশে। পাকিস্তানী আর ভারতীয় লোককে আলাদা করে চিনতে সমস্যা হয় রানার, বাকি লোক দু'জন কোথাকার বুঝতে পারল না ও। তবে দু'জনই শার্ট ও ট্রাউজার পরে আছে।

নিচু হলো রানা, কান পেতে কে কি বলে শুনছে।

'এরপর আমরা যখন ইসলামাবাদে যাব, প্রি-অ্যারেঞ্জড্ ডেড-ড্রপ মেসেজ ছাড়া অন্য কোনভাবে কেউ কারও সঙ্গে যোগাযোগ করব না,' কথা বলছে চৌহান। 'সবচেয়ে বড় কথা, যে টার্গেট ডেট নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার আগে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে আমাদের কাউকে যেন দেখা না যায়। পরিষ্কার?'

বাকি দু'জন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'জ্বী।'

'গুড। টার্গেট ডেট-এ ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে হেভী গার্ড থাকবে। আমাদের টাইমিং হওয়া চাই কাঁটায় কাঁটায়। আমাদের সাবজেক্টকে আমরা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে এক্সপোজড্ অবস্থায় পাব। মুভ করতে হবে দ্রুত, দক্ষতার সঙ্গে।'

'আপনি আমাদেরকে নিয়ে চিন্তা করবেন না,' দু'জনের একজন বলল, 'আব্বাস ভাই।'

তার সঙ্গী অপর লোকটার গলাও শুনতে পেল রানা, 'আপনি তো জানেনই, ভাই, হাতে টেলিস্কোপ লাগানো হাই-পাওয়ারড্ রাইফেল থাকলে পাঁচ সেকেন্ডে তিনজনকে ফেলে দেব আমি।'

মাথুর চৌহান গলা নিচু করল। মাথাটা জানালার দিকে একটু তুলল রানা ভাল করে শুনতে পাবার আশায়, এই সময় বাড়িটার পিছন দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো। প্রায় একই সঙ্গে তাবাসসুমের ফিসফিসানি শুনতে পেল ও।

'রানা! লোক!'

কিন্তু এরই মধ্যে দেরি হয়ে গেছে। বাড়িটার কোণ ঘুরে বেরিয়ে এলো লোকটা, হাতে পানি ভরা বালতি। বোঝাই যাচ্ছে যে বাড়ির পিছন দিকের কুয়া থেকে পানি আনতে গিয়েছিল। রানাকে দেখামাত্র 'হে রাম' বলে হাতের বালতি ছেড়ে দিল সে। ব্রিগেডিয়ার কাজেমি কয়েকজন ভারতীয় এজেন্টের দৈহিক বর্ণনা ও পরিচয় জানিয়েছেন ওদেরকে, সেই সূত্রে এই লোকটাকে রঘুবীর খান্না ওরফে বাদশা খান বলে সন্দেহ করল রানা। বালতি ছেড়ে দিয়ে ট্রাউজারের হিপ পকেটে হাত ভরছে রঘুবীর, চোখে-মুখে মরিয়া একটা ভাব।

রানা সম্পূর্ণ শান্ত; হাতের পিস্তল তাক না করে এদিক ওদিক নাড়ছে, ইঙ্গিতে অস্ত্র বের করতে নিষেধ করছে রঘুবীরকে। রানার এই

আচরণ থেকে রঘুবীরের বুঝে নেয়া উচিত যে অকারণ খুন-খারাবি এড়িয়ে চলতে চাইছে ও। পাকিস্তানে এসে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্টরা যা খুশি করুক, রানার সেটা মাথাব্যথা নয়–যতক্ষণ না ওদের দ্বারা বাংলাদেশেরও স্বার্থে আঘাত লাগে। কিন্তু রঘুবীর হয় ব্যাপারটা বুঝল না, আর তা না হলে তারা আসলেই একটা গুরুতর ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে–সেটা শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়, বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও।

রঘুবীর গুলি করতে যাচ্ছে বুঝতে পেরেই বাধ্য হয়ে ট্রিগার টেনে দিল রানা, তবে তার আগে লাফ দিয়ে সরে গেল। গুলি আসলে আধ সেকেন্ড আগে রঘুবীরই করল, লাফ দিয়ে সরে না গেলে রানার হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। নির্জন দুপুরের নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল গুলির শব্দে। রানার গুলি কোথায় লেগেছে বোঝা গেল লোকটা তার বুকে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়তে, আঙুলের ফাঁক গলে হড়হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। পাঁচিলটা নিচু, তার হাতের পিস্তল পাঁচিলের ওদিকে কোথাও ছিটকে পড়েছে।

'ঘাসের ভেতর লুকাও!' নির্দেশ দিল রানা, তাবাসসুমের জবাব শোনার অপেক্ষায় না থেকে লাশটার দিকে ছুটল, উদ্দেশ্য বাড়ির পিছন দিয়ে চৌহানকে পালাতে বাধা দেয়া।

কাত হয়ে পড়ে থাকা বালতি আর লাশটা টপকে বাড়ির কোণ ঘুরল রানা, পিছনে এসে দেখল দরজা একটা ঠিকই আছে, তবে ভেতর থেকে বন্ধ। পুরানো কাঠ, দুটো লাথি মারতেই কবাট ভেঙে গেল। কিচেন হয়ে আরও দুটো কামরা পেরুল রানা, তৃতীয় কামরা থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো এক লোক, হাতে পিস্তল। এতই উত্তেজিত, খুন করার জন্যে এতই ব্যগ্র, ছোটার গতি কমাতে না পারায় মুখোমুখি ধাক্কা খেলো রানার সঙ্গে। ধাক্কা খাবার পর চেহারা দেখে মনে হলো, যেন এইমাত্র তার ঘুম ভেঙেছে। পিস্তল তুলে সারেন্ডার করতে বলল রানা। চোখে-মুখে বিস্ময় নিয়ে হাতের পিস্তল তুলল সে। এবার রানাই প্রথম গুলি করল, প্রতিপক্ষকে কোন সুযোগ দিতে রাজি নয়। এই লোকটার পরিচয়ও আন্দাজ করতে পারছে ও। এ পাকিস্তানী খ্রিস্টান, ডানকান কাইল।

গুলি খেয়ে পিছু হটল কাইল, সটান আছাড় খেয়ে উপুড় হয়ে

পড়ার পর দেখা গেল বুলেটটা মাথার পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

বাড়ির সামনের কামরায় ঢুকল রানা, একটু আগে সঙ্গীদের সঙ্গে যেখানে কথা বলছিল চৌহান। ঘরটা এখন খালি। তারপর বাড়ির বাইরে থেকে গুলির শব্দ ভেসে এলো। চৌহান আর তার সঙ্গীর সঙ্গে তাবাসসুমের গুলি বিনিময় হচ্ছে। পিস্তলটা ছোট হলেও, গুলির শব্দ শুনে রানা বুঝতে পারল শত্রু দু'জনকে টয়োটার কাছে পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে তাবাসসুম। সদর দরজার দিকে ছুটল ও, উদ্দেশ্য চৌহান আর তার সঙ্গীর পিছনে পৌঁছানো, এই সময় বাইরে থেকে বাড়ির ভেতর ফিরে এলো চৌহানের দ্বিতীয় সঙ্গী।

লোকটা এলো গুলি করতে করতে, অথচ রানাকে সে দেখতেই পায়নি। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকল সে, দরজার আড়াল থেকে তার পিছনে বেরিয়ে এলো রানা। ভুলটা বুঝতে পেরে ঝট করে ঘুরতে গেল, রানাও গুলি করল–সন্দেহভাজন ভারতীয় স্পাই মাইকেল মোফাজ ভুরুর মাঝখানে গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ল দেয়ালে, সেখান থেকে ঢলে পড়ল মেঝেতে। তবে গুলি করেই কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা, ছুটছে সদর দরজার দিকে। বাইরে প্রচুর গুলি বিনিময় হচ্ছে, সে-সবকে ছাপিয়ে শোনা গেল গাড়ির দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ। বাড়ির বাইরে পা রেখে রানা দেখল, টয়োটা বাঁক নিয়ে ঢালু রাস্তায় নেমে যাচ্ছে। তাবাসসুমের গুলি লাগার ভয়ে মাথাটা নিচু করে রেখেছে চৌহান। বাঁ হাতের ওপর পিস্তল ধরা ডান হাত ঠেকিয়ে লক্ষ্যস্থির করল রানা, কিন্তু পর পর দুটো বুলেটই টয়োটার চাকা একটুর জন্যে মিস করল। প্যাঁচানো রাস্তা ধরে নেমে গেল গাড়িটা, লম্বা ঘাসের আড়ালে পড়ে যাওয়ায় এখন আর দেখাও যাচ্ছে না।

পিস্তল ধরা হাতটা নামিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। যে লোকটাকে সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল সে-ই পালিয়ে গেছে। তার হয়ে কাজ করার লোক যোগাড় করতে মাত্র কয়েক দিন লাগবে তার, কিংবা হয়তো কয়েক ঘণ্টা। মাথুর চৌহান যদি সত্যি আততায়ী হয়ে থাকে, ওরা বোধহয় এমনকি তার শেডিউলও বদলে দিতে পারেনি। তাবাসসুমের কথা মনে পড়তে লম্বা ঘাসের দিকে তাকাল রানা। পা-পা করে এগিয়ে এসে দেখল পিস্তলটা রিলোড করছে সে।

'দুঃখিত। পাশ দিয়ে চলে গেল, আটকাতে পারলাম না।'

'কি আর করা।'

'পিছু নিয়ে কোন লাভ হবে?'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ। বাকি লোকগুলোর কি অবস্থা?'

'মারা গেছে। এসো সার্চ করি।'

তাবাসসুমকে নিয়ে বাড়িটার ভেতর আবার ঢুকল রানা। লাশ দুটোকে সার্চ করে কিছুই পাওয়া গেল না। চৌহান সত্যিকার প্রফেশন্যাল, যাদেরকে দিয়ে কাজ করায় তাদেরকে সন্দেহ করার মত কিছুই সঙ্গে রাখতে দেয় না।

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাবাসসুমকে বলল রানা, 'ওরা তোমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে নিয়ে আলোচনা করছিল। ওখানে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটাবার প্ল্যান করছে।'

'ঠিক কি শুনেছ বলো তো।' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল তাবাসসুম।

'চৌহান বলল–"আমাদের সাবজেক্ট", তারপর বলল–"টার্গেট ডেট"। বলল, মুভ করতে হবে দ্রুত, দক্ষতার সঙ্গে।'

'মাই গড!'

'তারপর এক সঙ্গী বলল, হাতে টেলিস্কোপ লাগানো হাই-পাওয়ারড্ রাইফেল থাকলে পাঁচ সেকেন্ডে তিনজনকে ফেলে দিতে পারবে সে।'

'এর মানে কি, রানা?'

'এর মানে আমরা হয়তো চৌহানকেই খুঁজছি। ধরে নিতে হবে সে-ই খুনগুলো করছে। আরও খুন করার প্ল্যান আছে তার। তাকে যদি ভারত থেকে খুব বড় কোন ষড়যন্ত্র সফল করতে পাঠানো হয়ে থাকে–আজকের ঘটনার পর পরবর্তী মার্ডারের জন্যে তাকে শুধু সময়, তারিখ আর অপারেশনের ধরন বদলাতে হবে।'

'প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়,' বিড়বিড় করছে তাবাসসুম। 'মিনিস্টার সাহেদ কামরান খানকে আগেই খুন করেছে, তাহলে বাকি থাকল কে? সেনাপ্রধান জেনারেল আম্বিয়া? নাকি প্রতিমন্ত্রী?'

'হতে পারে। কিংবা হয়তো একজন ব্রিগেডিয়ারকে। বলা কঠিন।'

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এসে রঘুবীর খান্নাকে সার্চ করতে এগোল রানা।

খান্নার মানিব্যাগে গোপন একটা পকেট পাওয়া গেল। ভেতরে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ। 'কি এটা?'

কাগজটা হাতে নিয়ে দেখল তাবাসসুম। 'এটা তো একটা টেলিফোন নম্বর।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু নম্বরটার নিচে এই লেখাটা?'

'ওটা পশতু ভাষা, রানা,' বলল তাবাসসুম। 'লেখা রয়েছে–চাঙ্গা মাঙ্গা। ওটা একটা বাগান, মানে বনভূমি। ওদিকে অনেক গ্রাম, হোটেল, রেস্ট হাউস ইত্যাদি আছে।'

'বাহ্!' রানা খুশি। 'চৌহান না হলেও, তার এক লোক তাহলে ভুল একটা করেছে।'

আট

'আর সর্বশেষ চিঠিটা?' ঠোঁটের কাছে টেলিফোনের রিসিভার ধরে রেখে জিজ্ঞেস করল রানা, ওর সামনে বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে খুনীর পাঠানো চিঠিগুলোর ফটোস্ট্যাট করা কপি, বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণসহ ব্রিগেডিয়ার কাজেমি পাঠিয়েছেন। 'আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য আছে?' রানা কথা বলছে তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটির একজনের সঙ্গে। একজন সাইকিয়াট্রিস্ট, একজন কমপিউটর এক্সপার্ট ও একজন গ্রাফোঅ্যানালিস্টকে নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছিল ব্রিগেডিয়ার কাজেমির নির্দেশে। তাঁরা খুনীর পাঠানো চিঠিগুলো বিশ্লেষণ করে একটা লিখিত রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। সেই রিপোর্টের একটা কপিও ফ্যাক্স যোগে এই হোটেলে পৌঁছেছে।

সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোকের বক্তব্য মন দিয়ে শুনল রানা, তারপর

বলল, 'ধন্যবাদ। সত্যি আমরা উপকৃত হলাম।'

ফোনের রিসিভার ক্রেডলে রেখে তাবাসসুমের দিকে তাকাল রানা, ডাবল বেডরুমের দ্বিতীয় বিছানায় বসে পা দোলাচ্ছে। রাস্তার নাম শাহরাহ-ই-কায়েদ-ই-আজম, হোটেলের নাম পার্ল-কন্টিনেন্টাল, তারকা চিহ্নিত ও অভিজাত হওয়ায় কাবিননামা দেখাবার নিয়ম এখানে প্রযোজ্য নয়, তাই স্বামী-স্ত্রী হিসেবে স্যুইটটা ভাড়া নিয়েছে ওরা–তাবাসসুমেরই পরামর্শে।

'ইন্টারেস্টিং।'

'কি?' জিজ্ঞেস করল তাবাসসুম।

কমপিউটরে কম্পোজ করা চিঠিগুলোর ফটোস্ট্যাট কপি আর এক্সপার্টদের রিপোর্টের ওপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। 'তিনজন এক্সপার্ট একমত হয়ে যা বলেছেন সংক্ষেপে তা হলো–এই চিঠি যে কম্পোজ করেছে সে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ও অস্থির প্রকৃতির মানুষ, সম্ভবত প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার শিকার। খুনী বাংলাদেশ শব্দটা ব্যবহার করার সময় ইটালিক বোল্ড হরফ ব্যবহার তো করেছেই, শব্দটা আন্ডারলাইনও করেছে–এ থেকে এটাই ধরে নিতে হবে যে বাংলাদেশের প্রতি তার বিশেষ ঘৃণা বা ক্রোধ আছে।'

'মিলছে না,' বলল তাবাসসুম। 'কারণ মাথুর চৌহান কোন মতেই আবেগপ্রবণ বা অস্থির প্রকৃতির লোক নয়। আর বাংলাদেশের প্রতি তার বিশেষ ঘৃণারও কোন কারণ আমি অন্তত দেখি না।'

'আমিও না।'

'তাহলে, হয় এক্সপার্টদের বিশ্লেষণ ভুল, নয়তো আমরা আততায়ী মনে করে ভুল লোকের পিছনে ছুটছি।'

'হয়তো,' বলল রানা। 'কিন্তু এ-ও ভুলে গেলে চলবে না যে মাথুর চৌহান প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে মিছিমিছি পাকিস্তানের মত শত্রুদেশে আসেনি। তোমাকে তো বলেছি, ইসলামাবাদে তার লোকেরা জানতে চেয়েছিল রব্বানির সঙ্গে কি কি বিষয়ে আমার কথা হয়েছে। এর মানে কি?'

'এর সম্ভাব্য মানে তো একটাই–ওই গ্রুপ ফটো সম্পর্কে মাথুর চৌহানও ইন্টারেস্টেড।'

'এদিকে সময় কিন্তু দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'আর দিন কয়েকের মধ্যে আরেকজন মানুষ খুন হবে। দু'জনও হতে পারে।'

পায়ের ওপর পা তুলল তাবাসসুম। হোটেলে ওঠার আগে আনারকলি বাজার (বানু বাজার) থেকে কিছু কেনাকাটা করেছে রানা, তারমধ্যে তাবাসসুমকে রানার প্রেজেন্ট করা একটা কাতান শাড়িও আছে; এই মুহূর্তে সেই শাড়িটা পরেই বেডরুম আলো করে বসে আছে বর্ণসঙ্কর মেয়েটি, পরমাসুন্দরী গ্রীক দেবীর মত মহিমা ও মাধুর্য নিয়ে। 'এখন তাহলে কি করব আমরা?'

'সময় থাকতে চাঙ্গা মাঙ্গায় গিয়ে চৌহানকে পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখতে হবে,' বলল রানা। 'নম্বরটা হয়তো ফলস্ ক্লু, কারও বান্ধবীর ফোন। আবার চৌহানের মূল হেডকোয়ার্টারও হতে পারে জায়গাটা।'

'ঠিক আছে, চাঙ্গা মাঙ্গায় যাব আমরা,' বলল তাবাসসুম। 'কিন্তু তাহলে হোটেলে উঠলাম কেন?'

'যাব তো কাল সকালে, হোটেলে না উঠে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে রাত কাটাতে চেয়েছিলে নাকি?' রানা অবাক।

'ও, তাই বলো—কাল সকালে।' দেখে মনে হলো তাবাসসুম হঠাৎ খুশি আর চঞ্চল হয়ে উঠল।

'মিথ্যেকথা বলবি না—কি ঘটল, কিভাবে ঘটল?' মোবাইল ফোনে জিজ্ঞেস করল সোহেল। 'একটা বেডরুম, দুটো বিছানা; সেখানে সুন্দরের পূজারি একজন বলিষ্ঠ পুরুষ মানুষ, আর রূপ-যৌবনের আধার এক নারী। তারপর?'

'দুঃখিত, দোস্ত, কি ঘটেছে বললে বিশ্বাস করবি না, তাই বলছি না।'

'বিশ্বাস করব, তুই বল।'

'কিছুই ঘটেনি,' সত্যি কথাই বলল রানা।

'শালা বানাচ্ছে, মিথ্যুক কোথাকার···'

'আগেই বলেছি, বিশ্বাস করবি না,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, গাড়িতে আমার পাশেই বসে রয়েছে ও, ইচ্ছে হলে ওকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস।'

'এই না!' আঁতকে উঠে কানেকশন কেটে দিল সোহেল, দরকারি কথা যা ছিল তা আগেই সেরে ফেলেছে।

সকাল আটটায় হোটেল ছেড়ে রওনা হয়েছে ওরা, পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরে চাঙ্গা মাঙ্গায় পৌঁছাতে ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে ওদের। চাঙ্গা মাঙ্গা বারো হাজার পাঁচশো দশ একর জায়গা নিয়ে মানুষের তৈরি বিশাল এক বনভূমি। পিকনিক স্পট হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। পঞ্চাশ একর নিয়ে একটা লেক তৈরি করা হয়েছে, দেশী-বিদেশী ট্যুরিস্টরা নৌকা ও মোটরবোট নিয়ে সময় কাটাতে পারে। বনভূমির একপাশে আছে চিলড্রেন পার্ক, সুইমিং পুল, কাফেটারিয়া, ক্যানটিন এবং কয়েক ডজন রেস্ট হাউস।

সুইমিং পুলের কাছে গাড়ি রেখে পিএনএসএ হেড অফিস থেকে পাওয়া ঠিকানা ধরে রেস্ট হাউসটা পায়ে হেঁটেই খুঁজতে যাচ্ছে ওরা। রঘুবীরের মানিব্যাগ থেকে যে ফোন নম্বরটা পাওয়া গেছে সেটা এদিককার একটা রেস্ট হাউসের।

মোটেল ও রেস্ট হাউসগুলো বনভূমির কিনারায়, পাশাপাশি বেশ কয়েকটা। নম্বর মিলিয়ে সহজেই একতলা বাড়িটা পাওয়া গেল। বাড়ির গেট খোলা, তবে ভেতরে কোন সাদা টয়োটা নেই। সদর দরজায় তালা। বাড়ির পিছন দিকে চলে এলো ওরা। জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল রানা। না, বাড়ি খালি, ভেতরে নেই কেউ।

জাদুর কাঠি ঢুকিয়ে পিছনের দরজা খুলে বাড়ির ভেতর ঢুকল ওরা, দু'জনের হাতেই অস্ত্র বেরিয়ে এসেছে। কিচেন, লিভিংরুম ও বেডরুম দেখে আবার লিভিংরুমে ফিরে এলো। খুঁজেছে, কিন্তু কোন মাইক্রোফোন পায়নি।

সার্চ করতে গিয়ে ছোট একটা ব্যাগ পেল রানা ক্লজিটের ভেতর। পুরুষমানুষ ব্যবহার করে, এরকম কিছু টয়লেট আর্টিকেল পাওয়া গেল ব্যাগটার ভেতর, সম্প্রতি ব্যবহার করা হয়েছে। নিচু টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে সিগারেটের অবশিষ্টাংশও পাওয়া গেল।

'চৌহান আমাদের আগে পৌঁছেছে এখানে,' রানাকে বলল তাবাসসুম। 'আবার ফিরে আসবে সে।'

'কি করে বুঝলে?'

'এই ব্র্যান্ডের সিগারেট আমি টয়োটার ফ্রন্ট সিটের ওপর পড়ে থাকতে দেখেছি।' হাতের প্যাকেটটা রানাকে দেখাল তাবাসসুম। 'এটা বাথরুমে পেলাম।'

তাবাসসুম হাসছে দেখে রানা বলল, 'তুমি আরও কিছু পেয়েছ।'

'এরই মধ্যে শিষ্য বা সহকারী যোগাড় করে নিয়েছে চৌহান,' বলল তাবাসসুম। 'কিচেনের একটা শেলফে এক বোতল ভারতীয় হুইস্কি দেখলাম।'

'ভেরি গুড,' প্রশংসা করল রানা। 'আমরা জানি চৌহান মদ খায় না।'

'কৈলাস বেদি নামে এক লোক আছে,' বলল তাবাসসুম। 'পাকিস্তানী হিন্দু। তাকে আমরা বেশ কিছু দিন ধরেই ভারতীয় স্পাই বলে সন্দেহ করছি। এই চাঙ্গা মাঙ্গা এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। কিচেনে যে মদ দেখলাম, চোরাচালান হয়ে পাকিস্তানে ঢোকে। কৈলাস বেদি এই ব্র্যান্ডের মদই খায়।'

'এই বেদি এখন সম্ভবত চৌহানের ডান হাত হিসেবে কাজ করবে,' বলল রানা। 'এই মুহূর্তে ওরা হয়তো আরও লোক সংগ্রহ করতে ব্যস্ত।'

'বেদির হাতে বিশ্বস্ত লোক আগে থেকেই থাকার কথা,' বলল তাবাসসুম। 'নতুন করে রিক্রুট করতে হবে বলে মনে হয় না।'

'তা ঠিক। তবে ছোট্ট একটা সুবিধে আমরাও পাচ্ছি। ওরা জানে না আমরা এখানে লুকিয়ে আছি।'

'তা জানে না,' নিচু গলায় বলল তাবাসসুম। 'কিন্তু আমরাও তো জানি না কখন ফিরবে ওরা। মাঝখানের সময়টা কি করব? আমার প্রচণ্ড খিদেও পেয়েছে।'

'করব···সত্যিই তো, কি করব!' তাবাসসুমের পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল রানা। তার পরনে রেশমি সালোয়ার-কামিজ। দোপাট্টাও আছে, তবে সেটা গলায় মাফলারের মত জড়ানো, ফলে তার বক্ষ-সৌন্দর্যের দিকে যতবার চোখ পড়ছে ততবার ঢোক গিলতে হচ্ছে রানাকে। 'আমি তো করার মত কিছু দিখছি না, এক প্রেম করা

ছাড়া।'

'এত সহজে কথাটা বলে ফেললে?' রাগেনি, তাবাসসুম অবাক। 'কিন্তু কাল রাতে তো ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সদ্য গোঁফ ওঠা কিশোরের মতই লাজুক।'

'কেন, বিছানায় আমি এ-পাশ ও-পাশ করিনি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কাশিনি? দু'বার বাথরুমে যাইনি? এটা পাকিস্তান –এর বেশি আর কি আশা করতে পারো তুমি?'

'এটা পাকিস্তান, হ্যাঁ; কাজেই তুমিও আশা করতে পারো না যে একটা মেয়ে তোমার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পেয়েই সাড়া দিয়ে বসবে।'

আলাপটা রসাত্মক হয়ে উঠছে, পরস্পরকে ওরা কাছে পাবার জন্যে অস্থির হয়েও উঠবে, কিন্তু সে-সব কিছু ঘটার আগেই বাড়ির বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

এই মুহূর্তে তাবাসসুম কিচেনে, সম্ভবত ডিম ভাজবে আর কফি বানাবে। রানা রয়েছে লিভিংরুমে, লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে বেডরুমের জানালার সামনে চলে এলো। মাথুর চৌহান ও তার দুই সঙ্গীকে একটা ক্রীম কালারের টয়োটা থেকে নামতে দেখল ও। 'তাবাসসুম!' চাপা গলায় ডাকল রানা। 'ওরা ফিরে এসেছে!'

দরজার তালায় চাবি ঢুকল। তাবাসসুমকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সদর দরজা খোলার শব্দ হতে বেডরুমের ভেতর দিকে সরে এসে লুকিয়ে পড়ল রানা।

নয়

'আলবার্ট ছাড়াও আরেকজন লোক যোগাড় করা সম্ভব,' বাড়ির ভেতর ঢুকছে তিনজন, তাদের একজনের কথা শুনতে পাচ্ছে রানা। উঁকি

দিয়ে তাকাতে লোকটাকে বডিবিল্ডার মনে হলো, কাগজের বড় একজোড়া ঠোঙা বয়ে আনছে। সামনের কামরা হয়ে কিচেনে ঢুকতে যাচ্ছে সে। রানা আন্দাজ করল এই লোকটাই কৈলাস বেদি। 'কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন, অল্প সময়ের নোটিসে কাজটা কঠিন।'

বেদি কিচেনে ঢোকার সময় দম আটকে রাখল রানা। তাবাসসুম ওখানেই কোথাও আছে। কিন্তু কোথায়? গ্যাসের চুলো নেভাতে পেরেছে? নাকি জ্বালেইনি? সম্ভবত স্টোররুমে লুকিয়েছে। কিচেনের মেঝেতে হাঁটাচলা করছে বেদি, তার পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে রানা।

'এ-সব বাজে অজুহাত দেখিয়ো না তো, বেদি।' রানা চিনতে পারল, এটা মাথুর চৌহানের গলা। তাকে দরজার সামনে একটা চেয়ারে বসতে দেখল। বেডরুমের দরজা আরও একটু ঠেলে দিয়ে ফাঁক রাখল সরু একটু ফাটলের বেশি নয়। তাবাসসুমের পার্সটা, চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করল, বিছানায় দেখা যাচ্ছে না। ওটা কি সে সঙ্গে করে কিচেনে নিয়ে গেছে? তারপর হঠাৎ হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা, দেখল পার্সটা বিছানার নিচে পড়ে রয়েছে। পিস্তলটা ওই পার্সে থাকার কথা।

রানার চোয়াল উঁচু আর শক্ত হয়ে উঠল। তাবাসসুম নিরস্ত্র। শুধু তাই নয়, পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ওরা।

দীর্ঘদেহী একজন লোক, একেও বডিবিল্ডার মনে হলো, সালোয়ার-শার্ট পরা; মাথায় পাগড়ি, হেঁটে এসে চৌহানের পাশের একটা সোফায় বসল।

'আমি এক লোককে চিনি,' বলল সে, রানা ধরে নিল এরই নাম আলবার্ট, 'তাকে দিয়ে কাজ হতে পারে। লোকে তাকে জানে জিগার বলে ডাকে। খুন-খারাবিতে পাকা একটা হাত। টাকায় পোষালে নিজের বাপ-ভাইকেও জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবে।'

মাথুর চৌহানের গলায় ধৈর্য হারাবার সুর, 'কতটা নৃশংস, এটা বড় কথা নয়; বড় কথা সে কতটা দক্ষ। এই অপারেশনে প্রফেশন্যাল নৈপুণ্যের কোন বিকল্প নেই, আলবার্ট। ঠাণ্ডা মাথার বুদ্ধিমান লোক হতে হবে, তা না হলে মিশন ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত,' সায় দিল আলবার্ট, তবে বলছে না

যে জানে জিগারকে দিয়ে কাজ হবে না।

কিচেন থেকে মাথা বের করে উঁকি দিল বেদি। 'হুইস্কি চলবে নাকি?'

'আমার তো চলবেই। চৌহান ভাই তো ছোঁনই না।'

ক্ষীণ একটু হেসে চেয়ার ছাড়ল চৌহান, জ্যাকেট খুলে হাতে নিল, সোজা বেডরুমের দিকে হেঁটে আসছে।

নিঃশব্দ পায়ে ক্লজিটের দিকে ছুটল রানা। ভেতরে ঢুকে দরজা মাত্র বন্ধ করেছে, বেডরুমে ঢুকে জ্যাকেটটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিল চৌহান। গলার কাছে হাত তুলে টাইটা খুলছে দেখে রানা ধরে নিল ওটা রাখার জন্যে এগিয়ে এসে ক্লজিটটা খুলবে সে। পিস্তল বের করে তৈরি হয়েই আছে ও, ক্লজিটের দরজা খুললে মাথুর চৌহান মারা পড়বে। এগিয়ে আসছে সে, ক্লজিটকে পাশ কাটিয়ে রানার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল—সম্ভবত দেয়ালে গাঁথা কোন হুকে ঝোলাচ্ছে টাইটা। ওয়ালথারের বুলেট ভরা চেম্বার থেকে তার বুক মাত্র তিন ফুট দূরে ছিল। এক মুহূর্ত পর বেডরুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ক্লজিট থেকে বেরুবার সময় পাওয়া গেল না, তার আগেই কিচেনে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। বেদি চিৎকার করে উঠল, 'হে ভগবান!' তারপর শোনা গেল ভারী কিছু একটা আছড়ে পড়ার শব্দ। সন্দেহ নেই তাবাসসুমকে দেখতে পেয়েছে সে। এক মুহূর্ত পরই তাবাসসুম চিৎকার শুরু করল।

দড়াম করে খুলে গেল ক্লজিটের দরজা, বেডরুম থেকে লিভিংরুমের দিকে ছুটল রানা। আওয়াজ পেয়েছে চৌহান, ওর জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে দেখতে পেল রানা আঘাতটা আসছে, তারপরও এড়াতে পারত চৌহানের বুকে তাক করা ওয়ালথারের ট্রিগার টেনে দিলে। কিন্তু ওর সমকক্ষ একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে, কি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সে-ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়েই, একেবারে মেরে ফেলতে সায় দিল না মনটা। আঘাতটা এড়াবার জন্যে মাথাটা একপাশে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল বৃথাই, উল্টো করে ধরা পিস্তল ওর খুলিটা যেন চুরমার করে দিল। দোরগোড়ায় ঢলে পড়ছে রানা। আলবার্টকে এগিয়ে আসতে দেখল ও। মুখে লাথি মারার জন্যে

বুট পরা পা তুলল সে। 'সাবধান!' চৌহান গলা চড়িয়ে বলল। 'দু'জনের কেউ যেন মারা না যায়!'

লাথিটা মুখের বদলে রানার পাঁজরে মারল আলবার্ট। কিচেন থেকে আরও কিছু একটা ভেঙে পড়ার আওয়াজ ভেসে এলো। অসহ্য ব্যথা পেয়ে চিৎকার করে উঠল, তবে এবার তাবাসসুমের বদলে বেদি।

আলবার্ট আবার লাথি মারল রানাকে, ওয়ালথারটা আলগা হয়ে আসা মুঠো থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। তবে অপর হাত দিয়ে তার একটা পা ধরে টান দিল রানা। যখন দেখল পড়ে যাচ্ছে সে, শরীরটাকে মেঝেতে ঘুরিয়ে নিয়ে কষে একটা লাথি কষল তার মুখে। অপ্রত্যাশিত ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল, সাবধান হবার সময় বা সুযোগ কোনটাই পেল না চৌহান, আলবার্টকে নিয়ে সে-ও পড়ে গেল মেঝেতে।

রানা ইতিমধ্যে মেঝেতে পড়ে থাকা ওয়ালথারটা দেখতে পেয়ে সেদিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু মেঝে থেকে ওর খুলি বরাবর পিস্তল তাক করল চৌহান, গর্জে উঠল বাঘের মত, 'দেব নাকি শেষ করে?'

পাথর হয়ে গেল রানা। তারপর মুচকি হেসে বলল, 'আমি তো দিইনি।'

এই সময় কিচেন থেকে ফিরে এলো বেদি, তাবাসসুমের একটা হাত মুচড়ে শিরদাঁড়ার কাছে ধরে রেখেছে।

'বাহবা, বাহবা!' চোখে-মুখে সন্তুষ্টির ভাব নিয়ে বলল চৌহান, লাফ দিয়ে সিধে হলো। 'এরা আমাদের সেই লাহোরের দুই বন্ধু। আবার দেখা হওয়ায় সত্যি ভাল লাগছে।'

'আমাদের লাগছে না,' বলল রানা।

ব্যথায় কাতরাচ্ছে, ধীরে ধীরে দাঁড়াল আলবার্ট।

'যাও, মুখটা ধুয়ে এসো,' নির্দেশ দিল চৌহান। 'বেদি, এদের দু'জনকে ভাল করে বাঁধো।'

গলার ভেতর থেকে দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ ছেড়ে তাবাসসুমকে ঘরের মাঝখানে ঠেলে দিল বেদি, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার কিচেনে গিয়ে ঢুকল। রানা ও তাবাসসুম, দু'জনের দিকেই পিস্তল ধরে আছে

চৌহান। এক মিনিট পর কিচেন থেকে বেরিয়ে এলো বেদি। শক্ত এক প্রস্থ রশি দিয়ে প্রথমে রানার হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধল সে। তারপর তাবাসসুমকে। সোফার কাভারে বড় বড় গোলাপ ছাপা, ওদেরকে সেটায় বসতে দিল চৌহান। ইতিমধ্যে লিভিংরুমে আলবার্ট ফিরে এসেছে। শুধু মুখ ধোয়নি, মুখের দু'এক জায়গায় অ্যাডহেসিভ টেপের সরু ফালিও লাগিয়েছে। রানার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন ভস্ম করে ফেলবে।

সোফাটার সামনে একটা চেয়ার টেনে এনে তাতে বসল চৌহান। শান্ত, কিংবা এই শান্ত ভাব স্রেফ অভিনয়। রানা তার কয়েকজন লোককে জানে মেরে ফেলেছে। ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল সে, এই ব্র্যান্ডের সিগারেটই অ্যাশট্রেতে পেয়েছে ওরা। 'এবার,' বলল সে, রানার দিকে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। 'তুমি কি আইএসআই এজেন্ট?'

নিয়ম হলো শত্রুকে তুমি এমন কিছু জানাবে না যা সে এরইমধ্যে জানে না—এই মুহূর্তে সেটা যতই নগণ্য বা তাৎপর্যহীন হোক। চৌহান এই নিয়মের কথা জানে, তবু তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

'আমরা অ্যান্টি-নারকোটিক স্কোয়াড,' ঠাণ্ডা সুরে বলল তাবাসসুম। 'আর তোমরা ড্রাগ পাচার করছ; তাই না?'

চৌহান হেসে উঠল। 'তুমি থামো, সিস্টার! ভেবেছ তোমাকে আমি চিনি না?'

তাবাসসুমের চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। কিচেনে বেদির সঙ্গে বেশ কয়েক মিনিট লড়েছে সে, তবে কোথাও তেমন আঘাতের চিহ্ন দেখতে না পেয়ে স্বস্তি বোধ করল রানা। চৌহান ওর দিকে ফিরল।

'তোমার গল্পটা কি?' প্রশ্ন করল সে।

চৌহানের সুদর্শন চেহারা, পরিচ্ছন্ন চোখ, উন্নত ললাট ইত্যাদির ওপর চোখ বুলিয়ে নিজেকেই রানা আবার প্রশ্নটা করল, ওরা কি সত্যি এই লোককে খুঁজছে? চৌহান মানুষ খুন করতে জানে না, তা নয়; নিঃসন্দেহে ওদেরকে খুন করার কথাই এই মুহূর্তে ভাবছে সে। কিন্তু খুনগুলো সে কোনরকম ভাবাবেগ ছাড়াই করবে, কারণ এটা তার একটা কাজ। কাজটা করে কোন রকম অনুশোচনায় ভুগবে না সে, আবার উল্লাসও বোধ করবে না। সে একজন প্রফেশন্যাল। 'আমার

কোন গল্প নেই,' বলল রানা।

সহজ ও নরম একটু হেসে ভদ্র ভঙ্গিতে সিগারেটে টান দিল চৌহান। তবে আবার রানার দিকেই ধোঁয়া ছাড়ল। 'মেয়েটা পিএনএসএ,' শান্ত গলায় বলল। 'কিংবা আইএসআই। একটা ডোশিয়ের কথা মনে পড়ছে আমার। আর তুমি, যে টোনে উর্দু আর হিন্দী শব্দ উচ্চারণ করছ–তোমাকে ওরা ধার করেছে নাকি, বাংলাদেশ থেকে?'

চৌহানকে রানা ছোট করে দেখছে না। ভাবল, ব্যাটা দারুণ স্মার্ট। সোফায় যতটা পারা যায় হেলান দিল ও, বলল, 'তোমার হিসাব তুমিই মেলাও।'

কাঁধ ঝাঁকাল চৌহান। 'কোত্থেকে এসেছ বা কোন এজেন্সির হয়ে কাজ করছ, এ-সবের আসলে তেমন কোন গুরুত্ব নেই।'

'ওকে আলবার্টের হাতে ছেড়ে দিন,' পরামর্শ দিল বেদি।

'যিশুর কিরে, ওকে আমি হাগিয়ে ছাড়ব।' দাঁতে দাঁত চাপল আলবার্ট।

'খেয়াল করছ, আমার সঙ্গীরা কেমন খেপে আছে?' চৌহান নিঃশব্দে হাসছে। 'সহযোগিতা করলে তুমিই লাভবান হবে।'

'আমি তো তোমাকে বললামই!' মুখ খুলল তাবাসসুম। 'আমরা অ্যান্টি-নারকোটিক স্কোয়াডে আছি। নিজেদের ভাল চাইলে হেরোইনের চালানটা কোথায় রেখেছ বলে ফেলো, তারপর ক্ষমা চেয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পূরণ করো। আমরা তোমাদের হয়ে সুপারিশ করব।'

মাথা নাড়ছে চৌহান, হাসছে। 'তোমার সঙ্গিনী গল্প বানাতে পারে,' রানাকে বলল সে। 'কিন্তু বড় বেশি অবাস্তব।' হাসিটা অদৃশ্য হলো। সামনের দিকে ঝুঁকে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে দুমড়ে ভাঙল। চোখ তুলে তাকাল যেন সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ–ঠাণ্ডা, নির্দয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'আমি জানি লাহোরে তুমি আমার এক লোককে খুন করেছ। কিন্তু বাকি দু'জনকে? ওদেরকে খুন করেছ, নাকি ইন্টারোগেশনের জন্যে আটকে রেখেছ?'

'নো কমেন্ট।'

আলবার্টের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল চৌহান। এগিয়ে এসে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রানার গালে মারল আলবার্ট। মাথাটা পিছন দিকে এত জোরে ঝাঁকি খেলো, আতংকিত রানা মুহূর্তের জন্যে ভাবল ঘাড়টা বোধহয় ভেঙে গেছে। ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়াতে শুরু করেছে, সেদিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাবাসসুম।

'জানতে চাই লাহোরে তোমরা আড়াল থেকে কি কি কথা শুনলে,' বলল চৌহান। 'আমাদের কোন সঙ্গী কি এখনও বেঁচে আছে? তারা তোমাদেরকে কি বলল?'

রানা চুপ করে আছে, অনুভব করছে চিবুক হয়ে গলার দিকে নেমে যাচ্ছে রক্তের ধারাটা। আলবার্টের দিকে সরাসরি না তাকিয়ে আবার মাথা ঝাঁকাল চৌহান। আলবার্টের মস্ত থাবাটাকে আবার এগিয়ে আসতে দেখল রানা। এবার সে তার হাতটাকে মুঠো পাকিয়েছে। এক ঘুসিতে সোফায় কাত হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। শুয়ে ব্যথাটা সহ্য করবে, সে সুযোগও দিল না, টেনে ওকে আবার বসিয়ে দিল আলবার্ট।

'এ-সব আমি পছন্দ করি না,' বলল চৌহান। 'কিন্তু তুমি আমাকে নরম হবার সুযোগ দিচ্ছ না। বাড়িটার জানালায় কতক্ষণ ছিলে তুমি? কতক্ষণ পর রঘুবীর তোমাকে দেখতে পায়? কি কি শুনেছ?'

ফোলা ঠোঁটের ওপর জিভের ডগা ছোঁয়াল রানা। 'কোন্ জানালা?'

চোখ দুটো সরু করল চৌহান। 'ও, আচ্ছা, ভেবেছ এভাবেই চালিয়ে যাবে।'

চৌহানের কাছাকাছি চলে এলো বেদি। 'মেয়েটাকে আলবার্টের হাতে তুলে দিন,' শান্ত গলায় বলল সে। মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে দেখাল। 'ও ওকে পছন্দ করে—আমি শিওর।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো চৌহান। 'তবে সাবধানে, আস্তে ধীরে শুরু করবে। আমরা জানতে চাই কতটুকু জেনেছে ওরা।'

'খুবই আস্তে-ধীরে, বস্—যাকে বলে নরম ছোঁয়া দিয়ে শুরু করা হবে,' বলল বেদি, মিটিমিটি হাসছে, চোখ বুলাচ্ছে রেশমি সালোয়ার-কামিজে ঢাকা না পড়া তাবাসসুমের ভরাট যৌবনের ওপর।

'তোমাদের যেমন খুশি,' হাত নেড়ে বলল চৌহান। 'তবে মুখ খোলানো চাই।'

আলবার্টের দিকে তাকাল বেদি, উত্তরে আলবার্টের বড়সড় মুখে চওড়া হাসি ফুটল। এগিয়ে এসে তাবাসসুমকে দু'হাতে ধরে দাঁড় করাল বেদি। সে ধরে থাকল, আলবার্ট তাবাসসুমের পিছমোড়া করে বাঁধা হাতের রশি খুলে নিল। বেদি তাবাসসুমের বুকে হাত রাখল, বোলাচ্ছে ধীরে ধীরে, আলবার্টের দিকে ফিরে একটা চোখ টিপল। এই সময় ঠাস করে তার গালে চড় মারল তাবাসসুম।

বেদি জবাব দিল পাল্টা চড় কষে। এত জোরে, আলবার্ট ধরে না ফেললে ছিটকে দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেত তাবাসসুম। ফর্সা গালে আঙুলের দাগ বসে গেছে।

চোয়াল শক্ত করে আরেক দিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করল রানা। পরিস্থিতি আরও অনেক খারাপের দিকে যাবে। কিন্তু চৌহান যদি বুঝে ফেলে যে ওরা ডিফেন্স মিনিস্ট্রি সম্পর্কে জানে, এগিয়ে থাকার সুবিধেটুকু হারাতে হবে ওদরকে।

তাবাসসুমের কাপড় খোলার জন্যে বেদি আর আলবার্টকে রীতিমত ধস্তাধস্তি করতে হচ্ছে, হঠাৎ তাকালে মনে হবে তিনজনে ওরা কুস্তি লড়ছে। তাবাসসুম হাঁপাচ্ছে, অন্য কোন শব্দ করছে না। সাধ্যমত বাধা দিয়েও পরাজয় মেনে নিতে হলো তাকে। অবশেষে বেদি আর আলবার্ট তার সমস্ত আবরণ খুলে নিল। আলবার্ট জড়িয়ে ধরে রাখল, বেদি তার ভারী ও লোমশ হাত দুটো ধীরে ধীরে তাবাসসুমের নগ্ন শরীরে খেলাচ্ছে। চৌহানকে দেখে মনে হলো একঘেয়েমির শিকার।

'কাজটা তোমরা ভাল করছ না,' বলল রানা। 'ওকে তোমরা ছেড়ে দাও। ও কিছু জানে না, আমিও কিছু জানি না। তোমার সেই জানালার নিচে পৌঁছাতে অনেক দেরি করে ফেলি আমি। কাজেই তোমাদের কোন কথাই আমার শোনা হয়নি।'

সরু চোখে রানাকে খুঁটিয়ে দেখল চৌহান। 'মিথ্যে কথা বলছ। তুমি সব জানো, বা প্রায় সব জানো। এখন মেয়েটার ভাল চাইলে বলে ফেলো তথ্যগুলো কাকে তোমরা জানিয়েছ। তোমরা কি তোমাদের হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছ?'

'আমরা কিছুই জানি না,' বলল রানা। 'তোমাদেরকে বলারও কিছু নেই।'

রানার ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত মুখটা দেখে নিয়ে বেদির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল চৌহান। বেদির ইঙ্গিত পেয়ে আলবার্ট প্রচণ্ড জোরে দু'হাতে ধাক্কা দিল তাবাসসুমের পিঠে। রানার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল মেয়েটা। বেদি ও আলবার্ট দু'জনেই তাকিয়ে দেখছে রানার কি প্রতিক্রিয়া হয়। তাবাসসুমের বাহু দুটো তার মাথার ওপর ধরে রেখেছে বেদি। রানার উদ্দেশ্যে হাসল সে। 'তুমি চাও এত সুন্দর, নিষ্পাপ একটা মেয়ে ধর্ষিত হোক? আমাদের ভাল লাগবে, কিন্তু তোমার?'

আলবার্ট সারাক্ষণ হাসছে আর কুঁচকি চুলকাচ্ছে। লোকটার দিকে তাকালেই অসুস্থ বোধ করছে রানা। ও অবশ্য তাবাসসুমের দিকেও তাকাতে চাইছে না।

ইতস্তত করছে রানা। এত কিছু সহ্য করার বিনিময়ে কতটুকু লাভ হবে ওদের? খুব সামান্য তথ্যই গোপন করতে চাইছে ওরা। তা না করে, যা জানে সব বলে দিয়ে, এবং কিছুটা ধোঁকা দিয়ে, ওরা বরং জানার চেষ্টা করতে পারে চৌহান আর তার সঙ্গীরা সত্যি আততায়ীদের একটা দল, নাকি সম্পূর্ণ অন্য কোন খেলা খেলছে। 'ঠিক আছে, যা জানতে চাও বলব,' রাজি হলো ও। 'মেয়েটাকে ছেড়ে দাও।'

'সাবধান, আবার কোন চালাকি করতে যেয়ো না,' বলল চৌহান।

আলবার্টের চেহারায় হতাশার ছাপ পড়ল, তবে বেদির দৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতি থাকল–তাবাসসুমকে খুন করার আগে মজা করার সুযোগ অবশ্যই পাওয়া যাবে।

বেদি ছেড়ে দিতে মেঝের ওপর বসল তাবাসসুম, হাত দিয়ে যতটুকু পারা যায় লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছে।

'মেয়েটাকে বেডরুমে নিয়ে যাও। কাপড়গুলো ফিরিয়ে দাও ওকে,' বলল চৌহান। 'কাজটা তুমি করো, বেদি। আলবার্ট, তুমি এখানে থাকো।'

রানাকে পাশ কাটিয়ে বেডরুমে যাবার সময় প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল তাবাসসুম, কাপড়গুলো গায়ের সঙ্গে চেপে ধরে আছে। তার পিছু নিয়ে বেডরুমে ঢুকল বেদি, দরজাটা বন্ধ করে দিল। এই সময় তাবাসসুমের পার্সটার কথা মনে পড়ল রানার। ভাবল, বেদি দেখে

ফেলার আগে পার্সটা থেকে পিস্তলটা কি বের করতে পারবে ও?

'তো, বন্ধু,' বলল চৌহান, 'এবার তাহলে কাজের কথা শুরু হোক। প্রথমে বলো, মিশরে তুমি সাইফুল রব্বানির সঙ্গে কি চুক্তি করেছিলে?'

'সে আমাকে কিছু ইনফরমেশন বিক্রি করতে চেয়েছিল। কিন্তু অ্যালেকজান্দ্রিয়ার এক কুলি সর্দার কাইউম তাকে মেরে ফেলায় তথ্যটা আমার জানা হয়নি।'

'ইনফরমেশনটা কি?'

'তা সে আমাকে বলেনি,' জবাব দিয়েই পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'রব্বানির সাথে তোমার কি?'

'কিছু না,' একটু তাচ্ছিল্যই প্রকাশ পেল চৌহানের বলার সুরে। 'মাঝে মধ্যে আরব ও মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তথ্য কিনতাম। আমাদের ওখানকার লোকেরা আমাকে জানতে বলেছে তার সঙ্গে কি কাজ ছিল তোমার। এবার লাহোরে আমার সঙ্গীদের খবর বলো। তারা কি তিনজনই মারা গেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা।

'তারা তোমাকে কিছুই বলেনি?'

'কিছুই না। তবে জানালার নিচে দাঁড়িয়ে তোমাদের কথা আমি শুনেছি। সব শোনার পরই রঘুবীর আমাকে দেখতে পায়।'

'কি শুনেছ বলো।'

'পাকিস্তান ডিফেন্স মিনিস্ট্রি সম্পর্কে।'

চৌহানের চেহারা নির্লিপ্ত হয়ে গেল। 'আই সী।'

কথা বলার সময় চিন্তা করছে রানা। ওরা তার জ্যাকেটটা খুলে নেয়নি। সার্চ করার সময় ছুরিটাও খুঁজে পায়নি বেদি। কিন্তু হাত দুটো পিছনে বাঁধা থাকলে ওটা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। 'আমি যতটুকু বুঝেছি,' বলল ও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চৌহানের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে, 'তোমাদের সাবজেক্ট প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসছে দেখলে তোমরা নিজেদের কাজ শুরু করবে। এটাই তোমাদের মিশন।'

'আরেকটু পরিষ্কার করে বলো। আমাদের মিশনটা আসলে কি?'

চৌহানের চেহারায় কোন ভাব ফুটল না।

রানা ইতস্তত করছে, লক্ষ করছে আলবার্ট আর চৌহানকে। এরপর যা বলবে, শুনে কার কি প্রতিক্রিয়া হয় জানতে চায়। 'কেন, তোমাদের মিশন হলো আরেকজন পাকিস্তানী মন্ত্রীকে খুন করা–আর এটা হলো বিরাট একটা ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ মাত্র।'

চৌহানের চোখ দুটো সামান্য একটু সরু হলো। তবে আলবার্ট সম্পূর্ণ অন্য কাহিনী। বিস্ময়ে কপালে উঠে গেল তার ভুরু জোড়া, হেসে উঠল কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তার দেখে চোখ গরম করে তাকাল চৌহান। আলবার্টের হাসি থেমে গেল। তবে ইতিমধ্যে ওই হাসি অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়েছে রানাকে। অন্তত এটুকু পরিষ্কার যে আলবার্ট জানে সম্পূর্ণ অন্য এক কাজের জন্যে রিক্রুট করা হয়েছে তাকে, মন্ত্রী বা কোন কর্মকর্তাকে খুন করার জন্যে নয়।

'লাহোরের ওই বাড়িটায় আমরা মানুষ খুন নিয়ে কোন আলাপ করিনি,' বলল চৌহান। 'তুমি কি আবার আমার সঙ্গে চালাকি করতে চাইছ?'

'কথাগুলো সত্যি সত্যি শুনিনি আমি,' স্বীকার করল রানা। 'তবে বেশ ক'দিন হলো জানি আমরা, এই যে অবিশ্বাস্য মোটা অঙ্কের টাকা চেয়ে পাকিস্তান সরকারকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা হচ্ছে, এটা আসলে স্রেফ একটা কাভার, এই কাভারের আড়ালে থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কয়েকজন প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রীকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে ভারত, কারণ তাঁরা সবাই হয় চরম ভারত-বিরোধী, নয়তো এমন কিছু করতে যাচ্ছেন যা ভারতের স্বার্থে বড় ধরনের আঘাত হানবে। তোমাদের মূল ষড়যন্ত্রটা আরও অনেক বড়, আরও অনেক নৃশংস। তুমি পাকিস্তান এসেছ গোটা প্ল্যানটা পরিচালনা করার জন্যে।'

রানা চৌহানের, চৌহান রানার অবয়ব পরখ করছে। এ যেন জুয়া খেলতে বসা, বাজি ধরা হয়েছে ওদের জীবন–ওর আর তাবাসুসমের। শুধু তাই নয়, এই জুয়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়েও টান দিতে পারে।

ভারত যদি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সরকারপ্রধানদের হত্যা

করে, তার পরিণতি কি হবে ভাবতেও রানার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল।

'তবে তোমরা জানো না যে এরপর ঠিক কাকে আমরা খুন করতে যাচ্ছি,' বলল চৌহান, চিন্তার ভারে মাথাটা নুয়ে পড়ছে।

'না, অনেকগুলো টার্গেটের যে-কোন একটা হতে পারে। আমরা এমনকি সঠিক তারিখটাও জানি না। তবে এ-সব কিছুই তোমাদের অনুকূলে যাবে না। তোমাদের খেলা খতম, ভারতীয় ষড়যন্ত্র শিগ্‌গিরই ফাঁস করা হবে!' শেষ দিকে ইচ্ছে করেই আবেগ এনে গলা চড়াল রানা। চৌহানের মুখ দেখে মনে হলো, ওর কথা সে বিশ্বাস করেছে। তবে অভিযোগটা সে অস্বীকার করতে যাচ্ছে না, অন্তত এখুনি নয়।

'ওকে তুমি বেডরুমে নিয়ে যাও,' আলবার্টকে নির্দেশ দিল চৌহান, রানার বক্তব্য সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করছে না। 'মেয়েটাকে আবার রশি দিয়ে বাঁধো। জানালার শাটারগুলো বন্ধ করতে ভুলো না। তারপর বেদিকে নিয়ে আমার কাছে ফিরে এসো।'

পিস্তলের মুখে রানাকে বেডরুমে নিয়ে এলো আলবার্ট, তাবাসসুমকে এখানে পাহারা দিচ্ছে কৈলাস বেদি। তাবাসসুমের পার্সটা বডিবিল্ডার পেয়ে গেছে দেখে হতাশ বোধ করল রানা। জানালা বন্ধ, তাবাসসুমের হাতও পিছমোড়া করে বাঁধা। কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় লম্বা ও লোহার মত শক্ত হাত দিয়ে রানার পেটে বেমক্কা একটা ঘুসি মারল আলবার্ট। গুঙিয়ে উঠল রানা, কোমরের কাছে ভাঁজ হয়ে গেল শরীর, মেঝেতে হাঁটু গাড়ল, চোখে অন্ধকার দেখছে। হেসে উঠে বেদির পিছু নিল আলবার্ট। ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

বেশ কয়েক সেকেন্ড দম নিতে পারল না রানা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ওর পাশে হাঁটু গাড়ল তাবাসসুম। 'খুব বেশি ব্যথা করছে?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করে রানার কাঁধে মুখ ঘষল।

রানা কথা বলতে পারছে, তবে নিঃশ্বাস ফেলতে এখনও খুব ব্যথা লাগছে। 'ওই বেজন্মাটাকে আমি ছাড়ব না,' অস্ফুটে বলল ও।

'চৌহানকে তুমি কি বলেছ?' জানতে চাইল তাবাসসুম।

'যা জানি তাই বলেছি।'

'কি বুঝলে? সে-ই কি আততায়ী?'

'চৌহান হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি আমাকে,' বলল রানা। 'তবে

আলবার্ট অনেক কিছু জানিয়েছে–একটা কথাও না বলে।'

নীল নয়না তাবাসসুম রানার মুখে তল্লাশী চালাচ্ছে।

'হয় মন্ত্রী-মিনিস্টার খুন করার এই প্লটের সঙ্গে চৌহান জড়িত নয়,' বলল রানা, 'আর তা না হলে আলবার্টকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। এটা সম্ভব–ভাড়াটে একজন এজেন্টকে মূল মিশন সম্পর্কে কিছু জানতে না দেয়াটাই স্বাভাবিক।'

'স্বাভাবিক।' মাথা ঝাঁকাল তাবাসসুম।

'তবে আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই অ্যাসাসিনেইশন প্লটের সঙ্গে চৌহানের কোন সম্পর্ক নেই।'

'সে কি এখন আমাদেরকে সরিয়ে দেবে?'

তাবাসসুমকে মিথ্যে বলে লাভ কি। 'মানে, আমরা যদি ভুল ট্রেইলেও থাকি, আমাদেরকে খতম না করে তার উপায় নেই। আমরা জানি ভয়ানক কিছু একটা করার জন্যেই পাকিস্তানে ঢুকেছে সে, এবং এর সঙ্গে পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্ট্রির সম্পর্ক আছে।'

'আমার মনে হয় ওখানে বসে সেই প্ল্যানই করছে ওরা,' বলল তাবাসসুম। 'কিভাবে আমাদেরকে মেরে ফেলা যায়।'

রশির বাঁধনের ভেতর কব্জি দুটো ঘোরানোর ও মোচড়ানোর চেষ্টা করছে রানা। গিঁটটা এত শক্ত যে কোনভাবেই ঢিল করা যাচ্ছে না। শাটার লাগানো জানালার দিকে তাকাল ও। 'ওরা সম্ভবত অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।'

'হ্যাঁ, আশপাশের রেস্ট হাউসগুলোয় লোকজন আছে,' বলল তাবাসসুম। 'ওরা কোন ঝুঁকি নেবে না।'

ওখানে বসে কব্জিতে বাঁধা রশির গিঁট আলগা করার চেষ্টা করছে রানা, আর ভাবছে কিভাবে জান বাঁচানো সম্ভব। ওর কাছে ছুরি আছে, কিন্তু হাত বাঁধা, রশিটা কাটবে কিভাবে? কোথায় বোকামিটা হচ্ছে বুঝতে পেরে দু'সেকেন্ড পর হাসি পেল রানার। 'তৈরি হও,' গলা খাদে নামিয়ে তাবাসসুমকে বলল। 'তোমার সাহায্য লাগবে।'

ডান বাহুর পেশি ঝাঁকাল রানা, খাপ থেকে বেরিয়ে এলো ছুরিটা। কিন্তু বরাবরের মত ওর তালুতে পড়ল না, ওটার পথে বাধা সৃষ্টি করল কব্জির চারধারে জড়ানো রশি। তাবাসসুমের দিকে পিছন ফিরল ও।

'চেষ্টা করে দেখবে তোমার হাত আমার কব্জি পর্যন্ত ওঠে কিনা?'

রানাকে একবার দেখে নিয়ে ওর দিকে পিছন ফিরল তাবাসসুম। 'কি জানি। তবে যদি ওঠেও, রশির গিঁট খুলতে পারব বলে মনে হয় না।'

'জানি। তবে আমার ডান কব্জির ভেতর দিকে তাকাও। ওখানে একটা ছুরির ডগা দেখতে পাবে।'

তাকাতেই দেখতে পেল তাবাসসুম। 'ওহ্, গড! কি মিষ্টি সারপ্রাইজ!'

মুচকি হেসে আরেকটু ঘুরল রানা, তাবাসসুম যাতে ছুরির ডগাটার নাগাল পায়। অনুভব করল চেষ্টা করছে সে। 'এদিক ওদিক বেশি নাড়াচাড়া না করে সোজা তুলে আনো, ধীরে ধীরে,' বলল ও। 'টেনে আনো বাইরের দিকে, রশিটাকে পাশ কাটিয়ে।'

নির্দেশ মতই কাজটা করল তাবাসসুম, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে ধরে রাখতে না পেরে ছেড়ে দিল ছুরির ডগা। মেঝেতে পড়ে ধাতব ঝন্‌ঝন্ শব্দ তুলল ছুরি। দু'জনেই আঁতকে উঠে দরজার দিকে তাকাল। তবে পাশের কামরার আলোচনা কোন বিরতি ছাড়াই চলছে।

'তোলো ওটা।' বলার আগেই ঝুঁকে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছুরিটা মেঝে থেকে তুলেছে তাবাসসুম। 'হাতলটা শক্ত করে ধরো, তারপর আবার পিছিয়ে এসো আমার দিকে।' ওর প্রতিটি নির্দেশ ঠিকমত পালন করছে তাবাসসুম। 'এবার ফলা দিয়ে রশি কাটবে। খুশি হব মাংসের চেয়ে রশি বেশি কাটতে পারলে।'

রানা অনুভব করল ওর তালুর ওপর দিয়ে হড়কে রশির দিকে চলে গেল ছুরির ফলা। তাবাসসুম এখন গিঁটের ওপর ঘষছে ওটা। অবশেষে, মনে হলো যেন এক যুগ পরে, টের পাওয়া গেল গিঁটটা হার মানছে। শেষ একটা পোঁচ দিয়ে গিঁটটা পুরোপুরি কেটে ফেলল তাবাসসুম। আর ঠিক সময় মতই। পাশের ঘরে হঠাৎ ওরা সবাই চুপ করে গেল।

নিজের হাত মুক্ত হতেই দ্রুত তাবাসসুমের দিকে ঘুরল রানা, ছুরিটা তুলে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ফলা চালিয়ে দ্রুত কেটে ফেলল তার বাঁধন। ঠিক এই সময় শব্দ হলো দরজায়।

'যেমন ছিলে তেমনি থাকো,' ফিসফিস করল রানা।

তাবাসসুম তাড়াহুড়ো করে বিছানায় উঠে বসল, ভঙ্গিটা দেখে মনে হবে তার হাত এখনও বাঁধা। রানা দাঁড়াল, হাত দুটো পিছনে, ঠিক যখন দরজা খুলে যাচ্ছে। চৌকাঠে কৈলাস বেদি।

'দেখো দেখি কাণ্ড,' সহাস্যে বলল সে। 'তোমরা দেখছি এখনও এখানে!'

'যা জানি সবই তো বলেছি, এখন কি তোমরা আমাদেরকে চলে যেতে দেবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। বেদি বেডরুমের ভেতর ঢুকল দরজা সামান্য খোলা রেখে, ফলে পাশের ঘরে চৌহান আর আলবার্টকে কথা বলতে দেখতে পাচ্ছে ও। আলবার্টকে অস্বাভাবিক উত্তেজিত ও ব্যগ্র দেখাচ্ছে।

'সেটা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখব আমরা,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল বেদি। 'তবে আপাতত তোমাদেরকে অন্য এক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। ঠিক আছে? ওখানে তোমরা অনেক বেশি নিরাপদে থাকবে।'

তাবাসসুমকে পাশ কাটিয়ে রানার দিকে হেঁটে আসছে বেদি। রানা জানে কোথায় ওদেরকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। নির্জন কোন গিরিখাদে বা পাহাড়ী নদীর কিনারায়, যেখানে গুলির আওয়াজ কেউ শুনতে পাঁবে না বা শুনলেও সঙ্গে সঙ্গে কেউ ছুটে আসতে পারবে না। রানার একটা হাত ধরল সে। 'এসো, তোমাদের দু'জনেরই চোখ বাঁধতে হবে। ও-ঘরে চলো, প্লীজ।'

তাবাসসুম বিছানা থেকে নেমে পড়ল। রানা দেখল বেদির পিছনে পৌঁছে দুই হাত এক করল সে, তারপর প্রচণ্ড জোরে কোপ মারল তার ঘাড়ে। কাতরে উঠে রানার গায়ে ছিটকে পড়ল বেদি। রানা তাকে এক হাতে ধরে রেখে অপর হাত দিয়ে বিশ কেজি ওজনের একটা ঘুসি মারল সরাসরি মুখে। দড়াম করে মেঝেতে পড়ার আগে কেঁদে ফেলল। রানা নির্মম-কানের ওপর সবুট একটা লাথি কষল। ছুরিটা ওর বেল্টে গোঁজা, এখনও ব্যবহার করতে হয়নি। 'ওর পিস্তলটা নাও!' তাবাসসুমকে নির্দেশ দিল ও।

দরজার পাশে চলে এসেছে রানা, এই সময় এক ছুটে ঘরে ঢুকল

চৌহান, হাতে উদ্যত পিস্তল। তাবাসসুমকে বেদির ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে তার দিকেই লক্ষ্যস্থির করল সে। রানা ওর একটা হাত তার কব্জির ওপর সবেগে নামিয়ে আনল। পিস্তলটা হাত থেকে বেরিয়ে মেঝেতে পড়ল, চকচকে মেঝেতে লাটিমের মত পাক খাচ্ছে। চৌহানকে এবার দু'হাতে ধরে সবেগে দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল রানা।

তাবাসসুম এখনও বেদির পিস্তল হাতে পাবার চেষ্টা করছে। চৌহানের পিস্তল খাটের ওদিকের মেঝেতে সরে গেছে দেখে সেটাকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল রানা। ওটার পাশে পড়ল ও, বাঁট ধরার জন্যে হাতও বাড়াল, কিন্তু অস্ত্রটা তুলতে পাবার আগেই দেয়ালে ফুটবলের মত বাড়ি খেয়ে ওর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল চৌহান। লম্বা সে, শরীরে মেদ নেই, পেশি পাকানো রশির মত শক্ত। রানার হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নেয়ার জন্যে টানাটানি শুরু করল সে। দু'জনের শরীরই গড়িয়ে জানালার দিকে চলে যাচ্ছে।

ডান হাত দিয়ে তার মাথায় ঘুসি মারল রানা, কপালটা মেঝেতে ঠুকে গেল। বেদির পিস্তল নিয়ে তাবাসসুমকে সিধে হতে দেখল রানা, দেখল লাফ দিয়ে বেডরুমে ঢুকল আলবার্ট। তার আসতে দেরি হবার কারণ সম্ভবত অস্ত্রটা–সঙ্গে ছিল না–একটা মাউজার 7.75 প্যারাবেলাম অটোমেটিক। প্রচণ্ড রাগে লাল হয়ে উঠেছে চোখ-মুখ, গুলি করল আলবার্ট, সেই সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় খিস্তি। তার টার্গেট ছিল তাবাসসুম, কিন্তু নিশানা ভাল হয়নি, মাথার ছ'ইঞ্চি ওপর দিয়ে চলে গেল বুলেটটা। পাল্টা গুলি করল পিএনএসএ এজেন্ট, আলবার্টকে পর পর দুটো খাওয়াল–বুক আর গলায়।

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েই দরজার দিকে ছুটল চৌহান। এখনও মেঝেতে পড়ে রয়েছে, হাত বাড়িয়ে তার একটা পা ধরতে চেষ্টা করল ও। প্রচণ্ড বেগে লাথি ছুঁড়ল চৌহান। সরে যাবার চেষ্টা করলেও, জুতোটা ঘষা খেলো ওর মাথার এক পাশে। চৌহানের গোড়ালি ওর হাত ছাড়া হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার সেটার নাগাল পাবার আগেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেল চৌহান, তীরবেগে সদর দরজার দিকে ছুটছে।

দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল রানা। বেদি নড়ছে না; চিৎ হয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে আলবার্ট, মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে ছোট ছোট দম ফেলে। 'ওকে বাঁধো,' তার দিকে হাত তুললে তাবাসসুমকে বলল ও। 'আমি দেখি চৌহানকে ধরতে পারি কিনা।'

ওয়ালথারটা খুঁজে বের করার সময় নেই রানার। ক্রীম কালারের টয়োটার দিকেই ছুটছিল চৌহান, যখন মনে পড়ল সঙ্গে চাবি নেই, সঙ্গে সঙ্গে দিক বদলে সুইমিং পুল আর চিলড্রেন'স পার্কের দিকে ঘুরে গেল। রানা যখন পিছু নিল, সে ততক্ষণে একশো গজেরও বেশি এগিয়ে গেছে।

কিছু গাছপালাকে পিছনে ফেলে আসতেই সুইমিং পুল আর তার পাশে পিএনএসএ অফিস থেকে বরাদ্দ করা সিতারা রোড কিং দেখতে পেল রানা। চৌহানকেও দেখতে পেল, ছোট একটা সাদা ফিয়াট গাড়িতে উঠে এঞ্জিন স্টার্ট দিচ্ছে। রানা ভাবতে যাচ্ছিল, লোকে কেন যে ইগনিশনে চাবি রেখে যায়! তারপর মনে পড়ল—কেউ কেউ এভাবে চাবি রেখে যাওয়ায় জান বাঁচাবার জন্যে পালাবার সুযোগ পেয়েছে ও নিজেই বহুবার; আজ চৌহানের কপালে শিকে ছিঁড়লে কাউকে দোষ দেয়া ওর সাজে না।

গাড়িটা নিজে চালিয়ে এসেছে রানা, চাবি পকেটেই রয়েছে: ওটা বের করে স্টার্ট দিতে যাবে, হঠাৎ মনে হলো চাবিটায় কি যেন একটা খুঁত আছে। চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পিছু নিল ফিয়াটের। সাদা গাড়িটা কয়েকশো গজ দূরে, বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

সিতারা রোড কিং-ও ছোট গাড়ি, কিন্তু এঞ্জিন অত্যন্ত শক্তিশালী। দূরত্ব কমিয়ে একশো গজের মধ্যে আনতে বিশ মিনিট লাগল রানার। তবে এটা পাহাড়ী পথ, বাঁকগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক। দূরত্ব বাড়াবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল চৌহান, প্রতি বাঁকে প্রয়োজন অনুসারে স্পীড না কামানোয় হড়কে যাচ্ছে গাড়ির চাকা। রানার রোড কিং-ও বাঁক ঘুরছে দ্রুত, তবে সাবলীল ভঙ্গিতে নিরাপত্তা বজায় রেখে।

এক সময় দূরত্ব বলতে আর কিছু থাকল না। ফিয়াটকে পাশ কাটাতে চেষ্টা করছে রানা, উদ্দেশ্য সামনে পৌঁছে চৌহানকে থামতে বাধ্য করা। কিন্তু প্রতিবার বাধা দিল সে, ফিয়াটকে রঙ সাইডে সরিয়ে

আনল। এভাবে আরও তিনটে বাঁক পিছনে ফেলে এলো ওরা। একটা বাঁক ঘুরছে, ফিয়াটের সামনে দেখা গেল ঘোড়ায় টানা একটা এক্কাগাড়ি। হুইল ঘোরাল চৌহান ডান দিকে। গাড়ি হড়কে বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে। এক্কাগাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েও যেতে পারল না, ওটার পিছনের অংশে গুঁতো মারল ফিয়াট। কিনারা থেকে খসে পড়ল ঘোড়া ও কোচোয়ান সহ গাড়িটা–নিচে গভীর খাদ। গাড়িটা খসে পড়ার আগে কাত হলো, ফলে পিছনে বোঝাই করা খড় রাস্তার ওপর ছড়িয়ে পড়ল। চোখের পলকে ফিয়াটের উইন্ডস্ক্রীন ঢাকা পড়ে গেল খড়ে। বাঁক ঘোরা তখনও শেষ হয়নি চৌহানের, অথচ সামনের রাস্তা কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে। খাদে পড়ার ভয়েই সম্ভবত বন বন করে হুইল ঘোরাল। সরাসরি পাহাড় প্রাচীরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ। ছিটকে পিছিয়ে এলো গাড়ি, নাক ঘুরে গেছে, এঞ্জিন বন্ধ। রাস্তাটা খাদের দিকে ঢালু। নাক তোবড়ানো, উইন্ডস্ক্রীন ভাঙা ফিয়াট অলস ভঙ্গিতে এগোচ্ছে। হুইলে মাথা রেখে ঠিক যেন ঘুমাচ্ছে চৌহান। রোড কিং থামিয়ে নিচে নামল রানা, জানে কিছু করার সুযোগ পাওয়া যাবে না, তারপরও ফিয়াটটাকে ধরার জন্যে ছুটল।

ধরবে কি, পৌঁছানোই গেল না। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল রানা, তা না হলে ছুটে আসার ঝোঁকটা কিনারা থেকে ওকেও নিচের দিকে ফেলে দিত। উঁকি দিয়ে দেখল চারশো ফুট নিচে সরু খরস্রোতা নদীর ওপর ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়া আর কোচোয়ানের পাশেই পড়েছে ফিয়াট। কিছুই নড়ছে না। পতনের সময় জ্ঞান ছিল না, টয়োটার ভেতর থেকে তাই চৌহানের বেরিয়ে আসার প্রশ্নও নেই।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরল রানা। সুইমিং পুলের কাছে দেখা হলো তাবাসসুমের সঙ্গে, একটা ট্যাক্সি ভাড়া করছে। ড্রাইভারকে বিদায় করে দিয়ে রোড কিং-এ উঠে বসল সে। কি ঘটেছে শোনার পর রানার মোবাইল ফোন অন করে স্থানীয় পুলিসকে রিপোর্ট করল তাবাসসুম। তারপর রানাকে বলল, 'এবার শোনো রেস্ট হাউসে কি শুনলাম।'

'কি শুনলে?'

'মারা যাবার আগে সব কথা স্বীকার করে গেছে আলবার্ট,' বলল

তাবাসসুম। 'ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার, এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে, মানে আমাদের দু'দেশের আমলা ও মন্ত্রী-মিনিস্টার খুন করার সঙ্গে চৌহান অ্যান্ড গং-এর কোনই সম্পর্ক নেই বা ছিল না। ওরা এসেছিল পাকিস্তানের আবিষ্কৃত গাইডেড মিসাইলের ব্লুপ্রিন্ট ডিফেন্স মিনিস্ট্রি থেকে মিলিটারি হেডকোয়ার্টারে স্থানান্তর করার সময় ছিনতাই করতে।'

'তা কি করে হয়!' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল রানা। 'আমার জানামতে মিসাইল টেকনলজিতে ভারতের চেয়ে পিছিয়ে আছে পাকিস্তান। কাজেই ভারত কেন তোমাদের মিসাইলের ব্লুপ্রিন্ট চুরি করতে আসবে!'

তাবাসসুমের চেহারা ম্লান, প্রায় কালো হয়ে গেল। 'তোমাকে তাহলে সত্যি কথাটাই বলি,' খানিক পর দ্বিধা ঝেড়ে বলল সে। 'ব্লুপ্রিন্টটা ওদেরই, মানে ভারতেরই। এটা গোপন খবর, তবে পিএনএসএ-র আমরা কয়েকজন যেভাবেই হোক জেনেছি। ভারতের ওটা আইএসআই চুরি করে এনে ডিফেন্স মিনিস্ট্রিতে জমা দিয়েছিল।'

'দূর! দূর দূর!' গাড়ি চালাতে চালাতে হতাশায় স্টিয়ারিং হুইলের ওপর কিল মারল রানা। 'এই ক'দিন আমরা তাহলে মরীচিকার পিছনে ছুটেছি? আমার মন অবশ্য প্রথম থেকেই বলছিল, চৌহান খুনগুলো করছে না। কিন্তু, এই ষড়যন্ত্রে ভারতীয়রা যদি জড়িত না হয়, তাহলে কারা জড়িত?'

দশ

পাক সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-থ্রী। তিনতলা, পিএনএসএ হেড অফিস। নিজের চেম্বারে বসে ফটোস্ট্যাট করা ছবিটায় আঙুল বুলাচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি। তাঁর সামনে লাহোর, করাচী, মুলতান,

হায়দ্রাবাদ, কোয়েটা, বাহাওয়ালপুর ও রাজধানী ইসলামাবাদের বিভিন্ন থানা থেকে পাঠানো ফাইলের কয়েকটা স্তূপ দেখা যাচ্ছে।

'রব্বানির মেয়ের কাছ থেকে পাওয়া ফটোটায় বিশজন লোক রয়েছে,' রানাকে বললেন তিনি। 'একাত্তর সালে এরা সবাই পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈনিক ছিল। যুদ্ধের পর তাদের চাকরি চলে যায়। কিন্তু এ-সবের কোন দলিল, ডকুমেন্ট বা রেকর্ড নেই। কেন? এর কোন উত্তরও নেই। আমি নিজে একজন আর্মি অফিসার ছিলাম, বর্তমানে পিএনএসএ-র চীফ, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, সেনাবাহিনী থেকে এদের সম্পর্কে কোন প্রশ্নেরই জবাব পাইনি আমি। পরিষ্কার বলে দেয়া হচ্ছে—দেয়ার মত কোন ইনফরমেশন কোথাও নেই।'

'এরা একাত্তর সালে বাংলাদেশে গিয়েছিল কিনা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জবাব নেই।'

'এরা কি স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো নামে কোন ইউনিটের সদস্য ছিল?'

'জবাব নেই।'

'চাকরি করার সময় এদের রেকর্ড-বুক ছিল, সেগুলো থেকে কোন তথ্য...'

'কোন রেকর্ড বুকের অস্তিত্ব নেই।'

'তা কি করে হয়!' রানা শুধু হতভম্ব নয়, রাগে ওর মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে।

'এরা যে সেনাবাহিনীতে ছিল, তারই কোন রেকর্ড নেই, মিস্টার রানা—অন্তত আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে এই কথাই বলা হচ্ছে আমাকে।'

'তাহলে আপনি শুরুতেই কেন বললেন যে এরা সবাই পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈনিক ছিল?'

'হ্যাঁ, বলেছি।' ব্রিগেডিয়ার গম্ভীর। 'ব্যক্তিগত সূত্র থেকে জেনেছি, বিশ্বস্ত সূত্রও বটে, তাই বলেছি—আনঅফিশিয়ালি।'

'ঠিক আছে।' ঠোঁট কামড়ে রাগটা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করল রানা। 'যুদ্ধের পর ওদের চাকরি চলে গেল। তারপর কি হলো?'

আঙুল তুলে পাকিস্তানের বড় বড় শহরের বিভিন্ন থানা থেকে আসা ফাইলগুলোর দিকে আঙুল তাক করলেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি। 'সংক্ষেপে, উনিশজনই মারা গেছে। একটা মৃত্যুও স্বাভাবিক নয়। এরা সবাই একেকটা টপ-টেরর হয়ে ওঠে। নিজেদের এলাকা বেছে নিয়ে শুরু করে চাঁদাবাজি, ড্রাগ ব্যবসা। তবে প্রত্যেকেরই মূল ব্যবসা হয়ে ওঠে–চুক্তিতে মানুষ খুন। মাত্র তিনজন মারা যায় পুলিসের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে। আরও তিনজন খুন হয় নিজেদের মধ্যে শত্রুতার কারণে। বাকি কয়েকজনকে খুন করে আর্মির লোকজন। একসঙ্গে নয়, এক সময়েও নয়। পাকিস্তানে প্রায়ই গোপন সামরিক অভ্যুত্থান হয়, প্রতিবার টেররদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় আর্মি–এই রকম অভিযানে ওই বারোজন মারা যায়।'

'স্ট্রেঞ্জ!' রানার বিস্ময় নিখাদ। 'সৈন্যদের ছোট্ট একটা গ্রুপ। সবাই চাকরি হারাল, সবাই সন্ত্রাসী হয়ে উঠল, সবাই খুন হয়ে গেল–অথচ সেনাবাহিনীর খাতায় তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করা হচ্ছে না। ব্যাপারটা কি?'

'আই য়্যাম সরি, মিস্টার রানা।' ব্রিগেডিয়ারকে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। রানা বা তাবাসসুমের দিকে তিনি ভাল করে তাকাতেই পারছেন না।

রানা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। 'আঠারোজনের হিসাব পাওয়া গেল। বাকি দু'জনের একজন রব্বানি। আরেকজন?'

ফটোর এক সৈনিকের ওপর একটা আঙুল রাখলেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি, লেফটেন্যান্ট-এর ইনসিগনিয়া পরে আছে। 'এদের মধ্যে এই লোকটাই সবচেয়ে ভয়ংকর। লেফটেন্যান্ট ইলিয়াস মোস্তাফা।'

রানা দ্রুত চিন্তা করল, আরেকজন ইলিয়াস মোস্তাফা! ত্রিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে এমন একটা ফটো দিতে চেয়েছিল রব্বানি যেটায় ইলিয়াস মোস্তাফা নামে এক লোক আছে। তাহলে ধরে নিতে হবে এই নাম, এবং এই লোকই ক্লু বা ইনফরমেশন। ইঙ্গিতটা যাতে বুঝতে সুবিধে হয় সেজন্যে রব্বানি রানার ছদ্ম নামকরণ করেছিল 'ইলিয়াস মোস্তাফা'।

'ঠিক কোন্ হিসেবে সবচেয়ে ভয়ংকর?' পিএনএসএ চীফকে

জিজ্ঞেস করল ও।

'সম্ভবত সেনাবাহিনীতে চাকরি করার সময়ই, কোন যুদ্ধে বা অভিযানে, তার খুলির একটা অংশ ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। ডাক্তাররা তার মাথায় একটা ইস্পাতের প্লেট বসিয়ে দেন। সে যাই হোক, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন পর থেকেই ইলিয়াস মোস্তাফার কুখ্যাতি ছড়াতে শুরু করে। প্রথমে সে খুন করত বিনা কারণে বা নগণ্য কারণে। সিনেমা হলের ভেতর, দর্শক ভরা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে, লোকে লোকারণ্য মেলায় বা ধর্মীয় সমাবেশে ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করে শান্তভাবে হেঁটে চলে গেছে সে। তার চেহারায় বা চোখে, কিংবা হাবভাবে এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে যে লোকে তাকে ধরতে সাহস পায় না। আর পুলিস? তাদের বক্তব্য ইলিয়াস মোস্তাফাকে তারা চেনেই না, কারণ প্রতিটি খুনের আগে ও পরে নিজের চেহারা বদলে ফেলে সে।

'করাচী থেকে তার শুরু। অর্থাৎ মানুষ শিকার আরম্ভ। শুনে মর্মাহত হবেন, করাচীর বহু বাঙালী তার হাতে খুন হয়েছে। তারপর থেকে হায়দারাবাদ, বাহাওয়ালপুর, লাহোর, কোয়েটা, পেশাওয়ার, মারী, এবং সবশেষে রাজধানী ইসলামাবাদে সে তার নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। শুরু করার দু'বছর পর ধরনটা পাল্টে যায়। বিনা কারণে বা সামান্য কারণে, কিংবা ঝোঁকের মাথায় খুন করা বন্ধ করে সে। হাত দেয় খুনের ব্যবসায়। চুক্তিতে মানুষ হত্যা। আমাদের এই সমাজে একজন আরেকজনকে খুন করতে চায়, এমন লোকের সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না, আন্দাজ করেও হিসাব পাওয়া যাবে না। তবু পিএনএসএ একটা আনুমানিক হিসাব করেছে। ইলিয়াস মোস্তাফার হাতে সব মিলিয়ে খুন হয়েছে প্রায় পাঁচশো মানুষ।

'মোস্তাফার ক্রাইম শুধু মানুষ খুনের মধ্যে থেমে থাকেনি। ধীরে ধীরে সে আন্ডারওয়ার্ল্ডের গডফাদার হয়ে উঠল। শুরু হলো ড্রাগ ব্যবসা। শুরু হলো চাঁদাবাজি। সারাদেশের ব্রথেলগুলোর মালিক বনে গেল সে। আনুমানিক হিসাব, তার এ-সব অবৈধ ব্যবসা থেকে দিয়ে-থুয়ে মাসিক লাভ দাঁড়াল পাঁচ কোটি রুপিয়া...'

'পুলিস না হয় তাকে ধরতে পারেনি, কিন্তু সেনাবাহিনী?'

'পুলিস ধরতে পারেনি ঠিকই, তবে তার বিরুদ্ধে পাঁচটা খুনের

অভিযোগ আনে তারা। অকাট্য সাক্ষী-প্রমাণ থাকায় করাচী ও লাহোরের হাইকোর্ট ইলিয়াস মোস্তাফার অনুপস্থিতিতে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়…'

রানার ভুরু তির্যক একটা রেখা তৈরি করছে: ও ভাবছে, সম্ভবত এই লোককেই খুঁজছি আমরা।

পরমুহূর্তেই ব্রিগেডিয়ার কাজেমি ওকে হতাশার সাগরে ডোবালেন। 'এবার আপনি আবার সেই প্রশ্নটাই করবেন– সেনাবাহিনী কেন ইলিয়াস মোস্তাফাকে ধরতে পারেনি। সেনাবাহিনী তাকে ধরতেই গিয়েছিল, মিস্টার রানা, কিন্তু সে ধরা দেয়নি। সে-ও তো আজকের কথা নয়। প্রায় এক যুগ বা তারও আগের কথা। আর্মি তাকে ঘেরাও করে ফেলে। ঘটনাটা এই ইসলামাবাদেই ঘটে। ইলিয়াস মোস্তাফা মারা যায়।'

'মারা যায়? আপনি ঠিক জানেন? কিভাবে?'

ব্রিগেডিয়ারের মুখে ম্লান হাসি।

তিনি কিছু বলার আগে এই প্রথম রানার পাশ থেকে তাবাসসুম বলল, 'ঘটনাটা আমারও মনে আছে, যদিও তখনও আমি স্কুলে পড়ি। সারা দেশে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল…'

'হ্যাঁ,' বললেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি। 'ইলিয়াস মোস্তাফা মারা গেছে, এ খবর শুনে সারা দেশ উৎসবে মেতে উঠেছিল। সে-সময় দেশে সন্ত্রাসবিরোধী সেনা অভিযান চলছে। কন্ট্রোল রুমে অজ্ঞাতনামা কেউ একজন টেলিফোন করে জানাল কুখ্যাত ইলিয়াস মোস্তাফা একটা পেট্রল স্টেশনে লুকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে আর্মি, ফিলিং স্টেশনটা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। আর্মির একজন অফিসার স্নাইপার'স রাইফেলের টেলিস্কোপিক সাইট-এ তাকে দেখে চিনতে পারে। তারপর শুরু হয় গুলি বিনিময়। বন্দুকযুদ্ধটা দশ মিনিট ধরে চলে। তারপর গোটা ফিলিং স্টেশনে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যায়। নিশ্চয়ই একটা পেট্রল পাম্পে বুলেট লেগেছিল। আগুন নেভার পর ইলিয়াস মোস্তাফাকে পায় ওরা, স্রেফ পোড়া একটা কংকাল। তবে ওই কংকাল যে ইলিয়াস মোস্তাফার তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানা বলল, 'তারমানে আমাদের খুনীকে

এখনও আমরা চিনি না। যাকে চিনিই না, তাকে ধরব কিভাবে?'

'সরি, মিস্টার রানা,' পিএনএসএ চীফ বললেন। 'আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। পনেরো দিনের যে ডেডলাইন দেয়া হয়েছিল, সেটা পার হয়েছে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগে। এর একটা অর্থ এই হতে পারে যে মাথুর চৌহান তার আসল মিশনের রহস্য আলবার্টের কাছে প্রকাশ করেনি। সেক্ষেত্রে, মিস্টার রানা, আমাদেরকে ধরে নিতে হবে, আততায়ী চাঙ্গা মাঙ্গার কাছে খাদের নিচে পড়ে মারা গেছে। মূল ভিলেন আর তার ঘনিষ্ঠ সহকারীরা মারা যাওয়ায় তাদের মিশন ভণ্ডুল, অর্থাৎ ব্যর্থ হয়ে গেছে।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা, অর্থাৎ বোঝাতে চাইল যে একমত হতে পারছে না। 'আমি কোন যুক্তি দেখাতে পারব না,' বলল ও, 'তবে অনুভূতিটা ব্যাখ্যা করতে পারি।'

'ইয়েস, প্লীজ!' রানার অনুভূতি শোনার জন্যে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়লেন ব্রিগেডিয়ার।

'আমি খুনীর যে চেহারা ও আচরণ কল্পনায় দেখতে পাই, চৌহানের সঙ্গে তা এতটুকু মেলে না।'

চেয়ার ছেড়ে রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেইক করলেন ব্রিগেডিয়ার। 'প্রার্থনা করি আপনার ধারণা যেন মিথ্যে প্রমাণিত হয়। তবে এ-ও বলব যে তদন্ত বন্ধ করবেন না।'

রানার পর তাবাসসুমও চেয়ার ছাড়ল। 'আমরা বরং আমাদের কাজ ভাগ করে নিই। শুনলাম মন্ত্রীদের সিকিউরিটির আয়োজন আরও কড়া ও নিখুঁত করা হয়েছে, তা আসলে কতটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই আমি। তুমি কি বলো, রানা?'

'আমিও চাই, আপাতত আর যখন কিছু করার নেই,' বলল রানা।

'কিছু করার নেই, এ-কথা বোলো না,' হাসিমুখে বলল তাবাসসুম। 'খানিক আগে ঢাকা ও ইসলামাবাদ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে তোমাদের প্রধানমন্ত্রী আগামী হপ্তায় পাকিস্তান সফরে আসছেন। তোমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজই পৌঁছাবেন...' হাতঘড়ি দেখল সে, '...সরি, আধ ঘণ্টা আগেই পৌঁছে গেছেন তিনি। এই মুহূর্তে সম্ভবত আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করছেন...'

হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল রানা। 'তুমি কি আমার সঙ্গে আসছ?' বলে দরজার দিকে হাঁটা ধরল।

'আমাদের কাজ ভাগ করে নিলে ভাল হয় না?' রানার পিছু নিয়ে জিজ্ঞেস করল তাবাসসুম। 'তুমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাও, আমি যাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে?'

'ঠিক আছে।'

একই বিল্ডিঙের দোতলায় নেমে করিডর ধরে ধীর পায়ে হাঁটছে রানা। প্রথম দর্শনে মনে হবে পুরো অফিস বিল্ডিঙের সবাই দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজে ব্যস্ত। প্রাইভেট সেক্রেটারিরা দ্রুত পায়ে এক কামরা থেকে আরেক কামরায় আসা-যাওয়া করছে। বন্ধ দরজার ভেতর থেকে টেলিফোনে বলা কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। কাঁচ লাগানো জানালার ভেতর তাকালে চোখে পড়ে কমপিউটর ও, ফ্যাক্স মেশিন চলছে। তবে অনুভূতি প্রখর হলে উপলব্ধি করতে অসুবিধে হয় না যে গোটা পরিবেশে চাপা একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে।

আমলারা অন্ধকার করিডরে হাঁটছেন না। প্রাইভেট সেক্রেটারিরা খালি কোন ঘরে ঢুকছে না। মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর চেম্বারের দিকে যাবার পথে নতুন পাহারা বসানো হয়েছে, প্রায় সামরিক চেক পোস্ট-এর মত। দু'এক মিনিট পর পর রানাকে থামাচ্ছে–কখনও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স, কখনও আইএসআই, কখনও পুলিসের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ। পিএনএসএ চীফ ব্রিগেডিয়ার কাজেমি যে আই.ডি. কার্ডটা দিয়েছেন, প্রতিবার সেটা বের করে দেখাতে হচ্ছে ওকে। এই কার্ড জাল করা খুব কি কঠিন? এরকম একটা চিন্তা মাথায় আসাটা স্বাভাবিক। শুধু পিএনএসএ-র কার্ড কেন, আইএসআই থেকে শুরু করে যে পাঁচ-সাতটা সংস্থা এই তিন নম্বর সেক্রেটারিয়েট দালানে ডিউটি দিচ্ছে তাদের যে-কারও কার্ড জাল করা সম্ভব।

আরও একটা বাঁক ঘুরে পাকিস্তানী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দফতর এলাকায় ঢুকে পড়ল রানা। ঢোকার সময় এখানেও ওকে আই.ডি. দেখাতে হলো। এদিকের করিডরে প্রচুর লোকজন। বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট ছাড়াও সাদা পোশাকে পুলিস অফিসাররা হোলস্টারে পিস্তল নিয়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। একটা দরজার সামনে ইউনিফর্ম পরা সৈনিকদের ছোট একটা কনটিনজেন্ট দেখা গেল। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চেম্বারে ঢুকতে হলে ওই বিরাট দরজাটা টপকাতে হবে। এখানেও পরিচয়-পত্র দেখাতে হলো রানাকে। এখানে ওকে সবিনয়ে জানানো হলো, নিরাপত্তাজনিত কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে যাননি। শুধু তাই নয়, একই কারণে বাংলাদেশী মেহমানের প্লেন ইসলামাবাদে না নেমে পিণ্ডিতে নামবে, সেখান থেকে একটা হেলিকপ্টার গানশিপ সরাসরি এই দালানের ছাদে পৌঁছে দেবে তাঁকে। তাঁর পৌঁছানোর নির্দিষ্ট সময়েও পরিবর্তন আনা হয়েছে। আরও অন্তত এক ঘণ্টা পর পৌঁছাবেন তিনি।

সব শুনে রানা পাকিস্তানী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইল। উত্তরে ওকে জানানো হলো, নিরাপত্তাজনিত কারণেই এই মুহূর্তে নিজের চেম্বারে তাঁকে রাখা হয়নি, তাই দেখা করতে চাইলে রানাকে আরও অন্তত চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।

করিডরের আরও সামনে, সামান্য দূরে, আরেকটা দরজায় কোন পাহারা নেই: ভেতরে ফরেন মিনিস্ট্রিরই কয়েকটা অফিস স্যুইট রয়েছে।

এই দরজাকে পাশ কাটাবে রানা, ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলো। এর গায়ের সবুজ ইউনিফর্ম আগেও এই বিল্ডিঙের অনেকের গায়ে দেখেছে ও—দারোয়ান, পিয়ন, রাজমিস্ত্রী, ঝাড়ুদার। লোকটার এক হাতে বালতি, অপর হাতে মপ—লাঠির মাথায় ন্যাকড়া বেঁধে তৈরি করা ঝাড়ন। সাংঘাতিক ব্যস্ত সে, ধাক্কা দিয়ে রানাকে প্রায় ফেলেই দিচ্ছিল। রানা কোন রকমে তাল সামলে নিল, তবে লোকটার শরীর থেকে ঝনাৎ করে ধাতব কি যেন একটা পাকা মেঝেতে পড়ল।

ঝট করে নিজের কোমরে তাকাল লোকটা, জিনিসটা সম্ভবত ওখানেই ছিল। সেটা নেই দেখে মেঝেতে চোখ বুলাল। অনেক লোকের ভিড়ে মেঝে প্রায় ঢাকা, জিনিসটা কি বা কোথায় পড়েছে রানাও দেখতে পাচ্ছে না।

খুঁজে না পেয়ে চোখ তুলে দ্রুত, কঠিন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল লোকটা, তারপর ঝট করে ঘুরে আবার করিডর ধরে হন হন

করে এগোল, প্রায় দৌড়াচ্ছে। লোকটা বেশ লম্বা, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া কালো চুল, মুখেও খোঁচা খোঁচা কালো দাড়ি আর ঘন গোঁফ। গোঁফ জোড়া নকল কিনা, লোকটার পিছু নেয়া উচিত কিনা, এই সব ভাবছে রানা, এই সময় একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল।

মেঝেতে একজোড়া চাবি সহ একটা রিঙ পড়ে থাকতে দেখল রানা। ওটা তোলার জন্যে ঝুঁকেছে, এই সময় অফিস স্যুইটের দরজার ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এলো।

চাবির রিঙটা তুলে নিয়েই দরজার দিকে লাফ দিল রানা। সুট-টাই পরা এক লোক বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দরজা খুলে ফেলল ও।

একটা অফিস কামরায় ঢুকছে, পিছনে দরজাটা এখন খোলা, দেখল পাশের কামরায় ঢোকার মুখে চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক তরুণী। ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখল সে, চোখ দুটো আতংকে বিস্ফারিত হয়ে আছে, আবার চিৎকার করে উঠল। হাতে বোধহয় প্রচুর কাগজ-পত্র ছিল, সে-সব এখন তার পায়ের চারধারে ছড়িয়ে রয়েছে। তাকে পাশ কাটিয়ে ছোট একটা প্রাইভেট অফিসে ঢুকল রানা, শুনতে পেল ওর পিছনের করিডর থেকে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। ভেতরের অফিসে এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল রানা, দাঁড়িয়ে আছেন মেঝেতে পড়ে থাকা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর লাশের দিকে ঝুঁকে—তাঁর মুখ বারবার খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে, মাছের খাবি খাবার মত।

মহিলার চোখে আতংক দেখল রানা, চোখ নামিয়ে আতংকের কারণটাও দেখতে পেল। পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে খুন করা হয়েছে গ্যারট দিয়ে, যে-ধরনের গ্যারট যুদ্ধের সময় কমান্ডোরা ব্যবহার করে। তাঁর মাথা শরীর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ছোট্ট অফিসটার ভেতর বয়ে যাচ্ছে রক্তের বন্যা।

মহিলা রানার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করলেন, ইঙ্গিতে থামিয়ে দিয়ে তাঁকে ধরে একটা চেয়ারে বসাল রানা, তারপর কামরার চারদিকে চোখ বুলাল। কাছাকাছি ডেস্কের ওপর একটা কমপিউটর প্রিন্টআউট রয়েছে, তবে আপাতত সেটার দিকে এগোল না। সবুজ

ইউনিফর্ম পরা ঝাড়ুদারকে খুঁজতে বেরুবে কিনা ভাবল একবার, তবে চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল। ইতিমধ্যে পালিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে সে। লোকটার চেহারা মনে গেঁথে রাখার চেষ্টা করছে ও। কেন মনে হলো গোঁফ জোড়া নকল? শুধু গোঁফ নয়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর মাথার চুলও নিশ্চয় নকল–মাথায় ওটা অবশ্যই পরচুলা ছিল, কারণ ঘাড়ের পিছনে পাকা কিছু চুল দেখেছে ও।

অফিসে দু'জন লোক ঢুকল। 'কি ঘটছে এখানে?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'গজব হো গিয়া!' আরেকজন আঁতকে উঠে বলল, লাশটা দেখতে পেয়েছে।

'তুমি কে?' প্রথম লোকটা সন্দেহের চোখে তাকাল রানার দিকে।

রানা আই.ডি. কার্ড দেখাচ্ছে, ছুটে এসে আরও লোক ঢুকল অফিসে। 'আমি সম্ভবত খুনীকে দেখেছি,' বলল ও। 'এই বিল্ডিঙের সবুজ ইউনিফর্ম পরা। করিডর ধরে ছুটে পালাল।'

দু'জনের একজন দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় লোকটা সতর্ক চোখে রানাকে দেখছে, ওদিকে মন্ত্রণালয়ের আমলারা হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে ঢুকছেন। এতক্ষণে ডেস্কের কাছে এসে কমপিউটর কম্পোজ করা মেসেজটা দেখল রানা। তাতে লেখা হয়েছে–

'সময়সীমা একটু বাড়িয়ে দিয়ে দেখলাম সুযোগটা তোমরা গ্রহণ করো কিনা। এখন তোমাদের দেনার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াল বারো বিলিয়ন রুপিয়া। এই রুপিয়া নগদ ডলারে দিতে হবে। ওই ডলার একটা প্রাইভেট প্লেনে তুলে জেনেভায় পাঠিয়ে দাও। পরে আমরা যোগাযোগ করে জানাব টাকাটা জমা দেয়ার জন্যে কোন্ ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এবার কিন্তু টাকা দিতে ব্যর্থ হয়ো না, কারণ ইতিমধ্যে আমার ছক-এর সঙ্গে তোমাদের ভালই পরিচয় হয়ে গেছে–পনেরো দিন পর পর কামড় দিই আমি।' কমপিউটর কম্পোজ এখানেই শেষ, তবে তার নিচে হাতে লেখা কয়েকটা লাইন রয়েছে–'নসিবে নেই, এবারও বোনাসটা পেলাম না। তবে তার মানে এই নয় যে আদায় করার চেষ্টা করব না।'

রানা ভাবছে–'কামড়' তো বিছাই দেয়। এ-ও পরিষ্কার যে 'বোনাসটা পেলাম না' বলে বাংলাদেশী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে খুন করতে না পারার কথা বোঝাতে চেয়েছে খুনী।

কাগজটা পকেটে রেখে দিল রানা, পিএনএসএ হেড অফিসে গিয়ে ফটোস্ট্যাট করাবে। অফিস স্যুইট থেকে বেরিয়ে আসার আগে পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর লাশের পাশে আরেকবার দাঁড়াল ও।

এ আরেকটা অকারণ হত্যাকাণ্ড। অকারণ? কে যেন কোথায় লিখেছিল বা বলেছিল–এ পৃথিবীতে কোন কিছুই অকারণে ঘটে না। তা যদি সত্যি হয়, এই খুনগুলোর পিছনেও নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। তবে কার পাপে কে ভুগছে সেটার হিসাব পাওয়া বোধহয় সবসময় সম্ভব হয় না।

গ্যারট হলো–মেটালের তৈরি দুটো হাতল, মাঝখানে পিয়ানোর তার; সৈনিকদের, বিশেষ করে কমান্ডোদের অত্যন্ত প্রিয় একটা অস্ত্র। আক্রমণকারীকে তেমন কিছুই করতে হয় না, তারটা ভিক্টিমের মাথা দিয়ে গলিয়ে দু'দিকে টান দিলেই চলে। তারটা মাংস, পেশি, শিরা, এমনকি নরম হাড় পর্যন্ত কাটতে থাকে, যতক্ষণ না মাথাটা শরীর থেকে আলাদা হয়। আর কিছু না হোক, এ পদ্ধতি খুব সহজে মরে যেতে সাহায্য করে। স্বভাবতই রানার মনে পড়ল, অফিশিয়ালি স্বীকার করা না হলেও, সাইফুল রব্বানি পাকিস্তান আর্মির একজন সৈনিক ছিল, কমান্ডো ইউনিটের সদস্যও ছিল। ধরে নিতে হয়, সেই সূত্রেই খুনীকে চিনত সে। রব্বানির দেয়া ক্লুটা পরিষ্কার–ফটোর বিশজনের একজন, ইলিয়াস মোস্তাফা। কিন্তু ইলিয়াস মোস্তাফা অনেক বছর হলো মারা গেছে।

সত্যিই কি মারা গেছে?

এ-সব বিশ্লেষণ পরে করলেও চলবে, হাতে এই মুহূর্তে জরুরী কাজ অনেকগুলো। প্রথম কাজ, বাংলাদেশী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিরাপত্তা সম্পর্কে খোঁজ নেয়া। খুনী 'বোনাস' না পাওয়ায় খেদ প্রকাশ করেই বিরত থাকেনি, বলেছে আদায় করার চেষ্টা করবে–অর্থাৎ সুযোগ পেলে হামলা চালাবে সে।

বিশ মিনিট পর দালানের অপরপ্রান্তে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটা অফিস

কামরায় তাবাসসুমকে পেল রানা। সর্বশেষ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এখনও কিছু শোনেনি সে, রানাকে দেখেই হেসে ফেলল। 'এইমাত্র সৈয়দ একরামুল আলভির সঙ্গে দেখা হলো, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটা সুপারিশ নিয়ে এসেছিল,' হালকা সুরে বলল সে। 'একই জেদ, আমি যেন ফোন করি তাকে। কি, জেলাস ফিল করছ নাকি?'

'কিছু ফিল করার সময় কোথায়!' রানার চেহারা থমথম করছে। 'তোমাদের ফরেন মিনিস্টার এইমাত্র খুন হয়েছেন।'

শিউরে উঠল তাবাসসুম। নীল চোখ বিস্ফারিত। তারপর শক্ত হলো চোয়াল। 'আমার চীফ জানেন?'

'তোমার অফিসে গিয়েছিলাম খুনীর রেখে যাওয়া চিঠিটা ফটোস্ট্যাট করতে, ওখান থেকে মিস্টার কাজেমির সঙ্গে ইন্টারকমে কথা বলেছি। আমি বলার আগেই খবরটা পেয়েছেন উনি। তার কাছ থেকে আমিও জানতে পারলাম, হেলিকপ্টার গানশিপে হামলা করা হয়েছিল, তবে আমাদের ফরেন মিনিস্টার অক্ষত আছেন। এও শুনলাম যে তোমাদের প্রধানমন্ত্রী দেরি না করে খুনীর দাবি মিটিয়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন।'

'এগারো···বারো বিলিয়ন রুপিয়া?' অবিশ্বাসে ঢোক গিলল তাবাসসুম। 'উনি হয়তো ভয় পাচ্ছেন এরপর তাঁকেই টার্গেট করা হবে।'

'হয়তো?' মাথা নাড়ল রানা। 'পরবর্তী টার্গেট অবশ্যই তোমাদের প্রধানমন্ত্রী, আর বোনাস হিসাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী।'

'ওহ্, গড!' দু'হাতে মুখ ঢাকল তাবাসসুম। তারপর হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় আসতে হাত নামিয়ে বলল, 'যেভাবেই হোক তোমাদের প্রধানমন্ত্রীর এই সফর বাতিল করতে হবে, রানা!'

রানার চোখে সংশয়। 'হ্যাঁ, সে চেষ্টাই করা হবে। তবে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত পাল্টাবেন কিনা বলা মুশকিল।'

রানার একটা হাত ধরল তাবাসসুম। 'এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে চলো আমার অফিসে গিয়ে বসি। বস্ হয়তো আমাদের খোঁজ করতে পারেন।'

'চলো।' তাবাসসুমের সঙ্গে করিডরে বেরিয়ে এলো রানা।

...ওর মোবাইলটা এখনও তাবাসসুমের পার্সে রয়েছে, হঠাৎ সেটা বেজে উঠল। পার্স খুলে ফোনটা বের করে কানে ঠেকাল সে। 'হ্যালো?'

অপরপ্রান্তে কেউ কথা বলছে না। আরও কয়েকবার হ্যালো হ্যালো করার পর কান থেকে নামিয়ে ফোনের ডিসপ্লেতে তাকাল তাবাসসুম। কলার যে-ই হোক, সে তার ফোন নম্বর গোপন রাখতে চায়, সেজন্যেই নম্বরটা ডিসপ্লেতে নেই। 'কানেকশন কেটে দিল। কে হতে পারে বলো তো?'

'হয়তো রঙ নাম্বারে করেছে বুঝতে পেরে সাড়া দেয়নি,' বলল রানা।

নিজের অফিসে ঢুকে সেক্রেটারিকে ডেকে দু'কাপ কফি দিতে বলল তাবাসসুম। তার কথা শেষ হয়নি, আবার বেজে উঠল মোবাইল।

ডেস্কের ওপর রয়েছে ওটা, হাত বাড়াল দু'জন এক সঙ্গে। রানার হাত লম্বা, ক্ষিপ্রও বটে। 'হ্যালো?'

অপরপ্রান্ত থেকে অত্যন্ত মার্জিত নারীকণ্ঠ উর্দু ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ, বলছি,' জবাব দিল রানা। 'আপনি, ম্যাডাম?'

'আমি কি বা কে সেটার কোন গুরুত্ব নেই,' অপরপ্রান্ত থেকে ভদ্রমহিলা বললেন। 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনাকে জানতে হবে কর্নেল শাহিন শিকদার কোথায় আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে পারলে অনেক তথ্য পাবেন। আপনাকে আরও পেতে হবে স্পেশাল ত্র্যাক কমান্ডোর ফাইল। ওগুলো পঞ্চাশ বছর পর ডি-ক্ল্যাসিফাইড হবার কথা...'

'কিন্তু আপনি কিভাবে জানলেন যে...'

রানাকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না, ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি জানি কর্নেল শাহিন শিকদার কোথায় আছেন। কিন্তু জানলেও তথ্যটা আমার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয় বিশেষ কারণে।'

'তাহলে ফোন করেছেন কেন?' রানা জানে ওর প্রশ্ন একটু রূঢ় হয়ে গেল। খেয়াল করল, ডেস্ক ঘুরে ওর পাশে চলে আসছে

তাবাসসুম। রানার কানের কাছে কান সরিয়ে এনে অপরপ্রান্তের কণ্ঠস্বর শোনার চেষ্টা করছে সে।

'ফোন করেছি এজন্যে যে আমি জানি কাকে ধরলে কর্নেল শাহিন শিকদারের হদিস আপনি পাবেন।'

'কাকে?'

'পাকিস্তান আর্মির চীফকে। একমাত্র তাঁরই ক্ষমতা আছে শাহিন শিকদারের সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে দেয়ার। এবং ডি-ক্ল্যাসিফাইড হবার আগে একাত্তরের স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো বা তাদের মিশন কেএইচকেএল সম্পর্কে জানতে হলে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে ধরতে হবে।'

'আই সী,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু আপনার পরিচয়টা যদি জানতে পারতাম...'

ভদ্রমহিলা কানেকশন কেটে দিলেন।

'রানা!' উত্তেজনা ও উল্লাসে প্রায় কাঁপুনি ধরে গেছে তাবাসসুমের শরীরে। 'এই গলার আওয়াজ আমি চিনি!'

'হোয়াট!' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'কে?'

জবাব না দিয়ে দরজার দিকে ছুটল তাবাসসুম, চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বাইরে গলা বের করে সেক্রেটারির উদ্দেশে চিৎকার করে বলল, 'কফি দরকার নেই!' তারপর দরজা বন্ধ করে ছুটে ফিরে এলো রানার কাছে। 'আম্মি পাকিস্তানে ফিরে এসেছে! ওটা আমার আম্মির গলা, রানা!'

'সে কি!' রানা হতভম্ব। 'কিন্তু তিনি কিভাবে কর্নেল শাহিন শিকদার সম্পর্কে জানবেন? তাছাড়া, আমি যে তাকে খুঁজছি, এ-ও তো তাঁর জানার কথা নয়।'

রানাকে ধরে রীতিমত ঝাঁকাল তাবাসসুম। 'আমি এখন এ-সব প্রশ্নের উত্তর জানি, রানা। এখন আমার মনে পড়েছে কর্নেল শিকদারের কি গল্প আম্মি আমাকে শুনিয়েছিল। আমি তখন ইসলামাবাদে বোর্ডিং স্কুলে পড়ি। পিণ্ডি থেকে আম্মি একবার একাই দেখতে এলো আমাকে। আব্বু এলো না কেন জিজ্ঞেস করায় আম্মি বলল, "তোমার ড্যাডি লাহোর সেন্ট্রাল জেল থেকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এক বাঙালী কয়েদীকে নিজের জেলে আনিয়েছেন। একাত্তর

সালে তোমার ড্যাডির বস্ ছিলেন ভদ্রলোক। এখন সারাদিন সেই বাঙালী কয়েদীর সঙ্গে দাবা নিয়ে মেতে আছে"। আমাকে অবাক হতে দেখে আম্মি তখন এই কয়েদী ভদ্রলোক সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলেছিল–উনি কর্নেল ছিলেন। কোর্ট মার্শালে পদক ও পদোন্নতি বাতিল করা হয়, জেল হয়...'

'ঠিক আছে, এটুকু বুঝলাম...'

'বাকিটুকুও পরিষ্কার, রানা,' বাধা দিয়ে বলল তাবাসসুম। 'মুখে তোমাকে যাই বলুক, আব্বু আসলে এই কেসে আমাদেরকে সাহায্য করতে চাইছে–বিশেষ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুন হবার পর। খবরটা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সারা দেশ জেনে গেছে, তাই না? যাই হোক, ইচ্ছে থাকলেও আব্বু আমাদেরকে প্রকাশ্যে বা সরাসরি সাহায্য করতে পারবে না–আইনগত বাধা আছে। অফিশিয়াল অ্যাক্ট লংঘন করার অপরাধে জেইলার সাহেবেরই জেল হয়ে যেতে পারে। তাই আম্মি লন্ডন থেকে চলে আসায় সুযোগটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়েছে, তাকে দিয়ে ফোন করিয়েছে তোমাকে। কলটা প্রথমবার আমি রিসিভ করায় আম্মি কথা বলেনি, কারণ জানে আমি তার গলার আওয়াজ চিনে ফেলব।'

'কিন্তু এই মোবাইলের নম্বর ওঁরা পেলেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেন, যে-সব রিটায়ার্ড আর্মি জেনারেলদের ফোন করলাম তাঁরা আব্বুর বন্ধু নন? আমার করা প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা আব্বুর সঙ্গে আলাপ করেননি? তাঁদের কারও কাছ থেকে মোবাইল নম্বরটা জেনে নিয়েছেন।' রানা অন্যমনস্ক দেখে ভুরু কোঁচকাল সে। 'এই, কি ভাবছ?'

'ভাবছি তোমার আম্মির দেয়া তথ্য আদৌ কোন কাজে লাগবে কিনা,' ম্লান হেসে বলল রানা। 'একাত্তর সালে কোর্ট মার্শাল হয়েছে এমন এক বাঙালীর সঙ্গে তোমাদের আর্মি চীফ বাংলাদেশী একজন এসপিওনাজ এজেন্টকে দেখা করার অনুমতি কেন দেবেন? কর্নেল শিকদার অনেক গোপন তথ্য জানেন, সে-সব প্রকাশ পেলে পাকিস্তান আর্মির নতুন আরও কলঙ্ক বা নৃশংস ঘটনা প্রকাশ পাবে। কাজেই কোন আর্মি চীফই এ অনুমতি দিতে পারেন না...'

'এত হতাশ হয়ো না,' বলল তাবাসসুম। 'স্কেল দিয়ে মেপে বলো দেখি বিপদটা এখন কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে? ভেবে দেখো, পরবর্তী টার্গেট দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী। কাজেই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে আর্মি চীফকে অনুরোধ করলে ঠিকই কাজ হবে।' রানার হাত ধরল সে। 'এসো, আমার বসের চেম্বার থেকে যোগাযোগ করি।'

'তবে আমরা শুধু শাহিন শিকদারের সঙ্গে দেখা করতে চাইব না,' বলল রানা, তাবাসসুমের পিছু নিয়ে করিডর ধরে হাঁটছে। 'স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডোর ফাইল আর মিশন কেএইচকেএল সম্পর্কেও জানতে চাইব।' পকেটে রাখা চাবির রিঙটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বের করে দেখছে। এই চাবি কোথায় যেন আগেও দেখেছে, কিন্তু কোথায় ঠিক মনে করতে পারছে না। রিঙে দুটো চাবি, হুবহু একই রকম দেখতে। প্রতিটি চাবির গায়ে খোদাই করা কিছু বিন্দু রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে এই বিন্দুগুলোর একটা অর্থ আছে, অর্থটা ওর অজানাও নয়, অথচ মনে পড়ছে না। 'আমার ধারণা এই চাবিটা খুনীই ফেলে গেছে,' তাবাসসুমকে বলল ও। 'দেখো তো, বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য তোমার চোখে ধরা পড়ে কিনা।'

রিঙটা নিয়ে চাবি দুটো পরীক্ষা করল, তারপর ফেরত দিল তাবাসসুম। 'না, আমার চোখে কিছু ধরা পড়ছে না। কেন, এগুলোর কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'মনে হচ্ছে আগে কোথায় যেন এই চাবি দেখেছি। এই, তোমার রোড কিং-এর চাবিটা কোথায়?'

'লাহোর থেকে ফিরে এসে গাড়ি আর চাবি আফতাব ড্রাইভারকে বুঝিয়ে দিয়েছি,' পার্স খুলে ভেতরে হাত গলিয়ে বলল তাবাসসুম। 'তবে একটা চাবি রেখে দিয়েছি নিজের কাছে।' হাতটা বের করল পার্স থেকে। 'এই যে।'

সিতারা রোড কিং-এর চাবি আকারে একটু ছোট, অন্তত কুড়িয়ে পাওয়া রানার চাবিগুলোর তুলনায়; তাছাড়া, রোড কিং-এর চাবিটা মসৃণ, তাতে কোন বিন্দু খোদাই করা নেই।

এগারো

প্রথমে ব্রিগেডিয়ার কাজেমি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চীফ মেজর জেনারেল ওয়াদুদ খটক্-এর মাধ্যমে পাক সেনাপ্রধান জেনারেল কুতুব-উদ-দীন আম্বিয়া-র নাগাল পাবার চেষ্টা করলেন। ঘটনা ও পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ শোনার পর মেজর জেনারেল ওয়াদুদ খটক্ বললেন—এ-ধরনের গুরুতর ও স্পর্শকাতর একটা বিষয়ে সুপারিশ করতে যাওয়া হবে এত কষ্টে গড়ে তোলা তাঁর ক্যারিয়ারের গোড়ায় সি-ফোর বিস্ফোরক বসানো। মাফ করবেন, ভাই, একাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

পিএনএসএ চীফ হতাশ হতে জানেন না, তিনি সরাসরি সেনাপ্রধান জেনারেল আম্বিয়াকে ফোন করলেন। অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো, তিনি দেশের সীমান্ত সংলগ্ন ক্যাম্পে সামরিক অফিসারদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করছেন, এখনই বলা যাচ্ছে না কখন বা কবে তিনি রাজধানীতে ফিরবেন।

এভাবে কাজ হচ্ছে না দেখে সরাসরি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি। কিন্তু সরকারী বাসভবনে টেলিফোন করে প্রাইম মিনিস্টারকে পাওয়া গেল না; পররাষ্ট্রমন্ত্রীর লাশ ইতিমধ্যে পার্লামেন্ট ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আনুষ্ঠানিকভাবে শোক প্রকাশ করার জন্যে সেখানে গেছেন তিনি।

পিএনএসএ চীফের চেম্বারেই ফ্যাক্স মেশিন ও টেলিফোন নিয়ে রানারও খুব ব্যস্ত সময় কাটছে। কখনও গিলগিটে, সোহেলের সঙ্গে কথা বলছে। কখনও লং ডিসট্যান্স টেলিফোন কলে ওর বস্ রাহাত খানের পরামর্শ চাইছে।

এক নাগাড়ে তিন ঘণ্টা চেষ্টা করার পর কপালে আংশিক সাফল্য জুটল। বিসিআই চীফ রাহাত খান বাংলাদেশ সেনাপ্রধানের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করলেন। স্পেশাল হটলাইন-এর মাধ্যমে পাক সেনাপ্রধানের সঙ্গে টেলি যোগাযোগ সম্ভব হলো। সব কথা শোনার পর জেনারেল আম্বিয়া এক শর্তে পুরানো কয়েদী শাহিন শিকদারের সঙ্গে বাংলাদেশী একজন প্রতিনিধির দেখা করার ব্যবস্থা করতে রাজি হলেন। শর্তটা হলো–পাক প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পেতে হবে তাঁকে।

সময় নষ্ট না করে পার্লামেন্ট ভবনের উদ্দেশে ছুটলেন পিএনএসএ চীফ ব্রিগেডিয়ার কাজেমি, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জানাজায় অংশ নেবেন তিনি, সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি আলাপও করবেন।

দু'ঘণ্টা পর রাত আটটায় ব্রিগেডিয়ার কাজেমি পার্লামেন্ট ভবন থেকে অফিসে ফোন করলেন। তাবাসসুমের অফিসে তাবাসসুমই রিসিভার তুলল।

ব্রিগেডিয়ার জানালেন, 'এখানে আমি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলছি, এই সময় দেখলাম একটা হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে স্বয়ং আর্মি চীফ জেনারেল আম্বিয়া নেমে আসছেন। ওখানে দাঁড়িয়েই বিষয়টা নিয়ে আলাপ করলাম আমরা। প্রধানমন্ত্রী বিচলিত, বললেন যে-কোন মূল্যে এই হত্যাকাণ্ড থামাতে হবে। তাঁর মৌখিক নির্দেশই যথেষ্ট, সেনাপ্রধান সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলে জানালেন। একটু পরই জানতে পারব মিস্টার রানা কয়েদী ভদ্রলোকের সঙ্গে কখন দেখা করতে পারবেন। ক্ল্যাসিফাইড মিলিটারি ফাইল সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি।'

আধ ঘণ্টা পর আবার তাঁর ফোন পেল তাবাসসুম। এবার রিসিভারটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে, বলল, 'বস্ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।'

রিসিভার নিয়ে রানা বলল, 'হ্যাঁ, বলুন, মিস্টার কাজেমি।'

'কাল সকাল আটটায়, মিস্টার রানা,' বললেন পিএনএসএ চীফ। 'পিণ্ডি জেলে। তবে বলে দেয়া হয়েছে, আপনার সঙ্গে আমাকেও থাকতে হবে–কয়েদী ভদ্রলোক রাষ্ট্রের জন্যে ক্ষতিকর কোন তথ্য প্রকাশ করে দেন কিনা দেখার জন্যে। আর জেইলার ইলিয়াস মোস্তাফা

তো আমাদের সঙ্গে থাকবেনই...'

রানা বাধা দিয়ে জানতে চাইল, 'স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডোর ফাইল, মিস্টার কাজেমি? একাত্তরে তাদের মিশনের নাম ছিল–কেএইচকেএল। সেই মিশনের রিপোর্ট?'

'এই বিষয়টা অত্যন্ত স্পর্শকাতর, এমনকি বিপজ্জনকও বটে, মিস্টার রানা,' বললেন পিএনএসএ চীফ। 'আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, প্রধানমন্ত্রী নিজে আগে ফাইলগুলো দেখতে চাইছেন। এই দেখার জন্যে এমনকি তাঁকেও কিছু নিয়ম পালন করতে হবে–কারণ ফাইলগুলো একাত্তর সাল থেকে ধরে পঞ্চাশ বছরের জন্যে ক্ল্যাসিফাইড-এর তালিকায় রাখা হয়েছে। ডি-ক্ল্যাসিফাইড হওয়ার আগে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ওগুলো খোলা যেতে পারে। তবে সর্বসাধারণের জন্যে তা প্রকাশ করা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী ফাইলগুলো দেখার পর সিদ্ধান্ত নেবেন...'

অফিসের গাড়ি নিয়েই বেরুল তাবাসসুম, রানাকে ওর হোটেলে নামিয়ে দিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে যাবে। রাস্তায় বেরুতে বোঝা গেল দেশের কি অবস্থা। পুলিস তো আছেই, সীমান্তরক্ষী আর সেনাবাহিনীও ভ্যান ও জীপ নিয়ে টহল দিচ্ছে প্রতিটি মেইন রোডে। মোড়ে মোড়ে চেক পোস্ট বসানো হয়েছে। সুপার মার্কেটগুলোর সামনে প্রচুর মানুষ ভিড় করে টিভির খবর শুনছে। একটা বেসরকারী চ্যানেল পররাষ্ট্রমন্ত্রীর লাশ লাহোরে নিয়ে যাবার দৃশ্যটা সরাসরি সম্প্রচার করছে। অনেক গাড়িতেও টিভি বা রেডিও চলতে দেখা গেল।

রানার কথায় অভিজাত এক রেস্তোরাঁয় থামল গাড়ি, রাত খুব একটা বেশি না হলেও রাজধানীতে আতংক ছড়িয়ে পড়ায় টেবিল পেতে কোন অসুবিধে হলো না। ডিনার পরিবেশন করল দুই থাই তরুণী। কে বিল মেটাবে, এ নিয়ে রানা ও তাবাসসুম সহজে একমত হতে পারল না। তবে অন্য একটি বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করল না–ওরা এখন এতটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে যে রানার হোটেল স্যুইটে তাবাসসুম যদি যায় সেটাকে কোনভাবেই বেমানান বলা যাবে না, তেমনি তাবাসসুমের ফ্ল্যাটে রানার পদার্পণ ঘটলেও সেটাকে অশুদ্ধ বলে মনে

করার কোন কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত রফা হলো–বিল দেবে রানা, আর ওকে নিজের ফ্ল্যাটে মেহমান হিসেবে পাবে তাবাসসুম।

সেই একেবারে প্রথমদর্শনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল ওরা; তারপর কত রকম বিপদ, ঝুঁকি, শোক, আনন্দ, দুঃখ আর উদ্বেগ ভাগাভাগি করে নেয়ার মধ্যে দিয়ে একজন আরেকজনের খুব কাছে চলে এসেছে। দু'জনের স্নায়ুই পেশাগত উত্তেজনায় টান-টান হয়ে আছে, ক্লান্ত শরীর, মনও নিস্তেজ; এই অবস্থায় পরস্পরকে একান্তভাবে কাছে পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা উন্মুখ করে তুলেছে দুজনকেই।

রাত দশটায় তাবাসসুমের ফ্ল্যাটের সমস্ত আলো নিভে গেল। এর ঠিক এক ঘণ্টা পর, এগারোটায়, ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোনটা। বিছানা থেকে টেলিফোন অনেক দূরে, কাজেই কে ফোন করেছে জানতে হলে খাট থেকে তাবাসসুমকে নামতেই হবে, আর খাট থেকে নামার আগে গা থেকে সরাতে হবে চাদর, রানার একটা পা ও একটা হাত। শুধু কি তাই, ফোন ধরার আগে তাবাসসুমকে আবার কাপড়চোপড়ও পরতে হবে।

সবই করল তাবাসসুম। তারপর রিসিভার তুলে চিৎকার জুড়ে দিল। 'আম্মি! সত্যি তুমি? পিণ্ডিতে কোথায় উঠেছ?…আব্বুর ওখানে সেই…সত্যি বলছ? নেই? চলে গেছে…চিরকালের জন্যে!…তুমি আসছ…!'

এদিকে ধীরে-সুস্থে খাট থেকে নেমে কাপড়চোপড় পরে নিচ্ছে রানাও। তাবাসসুম তার আম্মির সঙ্গে ফোনে কথা বলা শেষ করে খাটের দিকে ফিরতেই রানাকে একেবারে তৈরি অবস্থায় দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। 'মানে?'

'কংগ্রাচুলেশন্স, তাবাসসুম,' হাসিমুখে বলল রানা। 'সত্যি অত্যন্ত ভাগ্যবতী মেয়ে তুমি। এখন আর বলতে পারবে না যে বাবা-মার আদর-যত্ন থেকে তুমি বঞ্চিত। এই সুখ আর শান্তি তোমার মত মেয়ের অবশ্য পাওনাই।'

'ধন্যবাদ, রানা,' বলল তাবাসসুম, এগিয়ে এসে রানার সামনে থামল। 'তুমি চলে যাচ্ছ?'

'সেটাই কি উচিত নয়?' হাসল রানা। 'ফোনে তোমার কথা শুনে

যতটুকু বুঝলাম, উনি তোমাকে পিণ্ডিতে নিয়ে যেতে আসছেন। রওনা হয়েছেন আগেই, এখানে পৌঁছাতে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগবে না। এসে যদি আমাকে দেখেন...'

'দেখল তো দেখলই, তাতে কি হলো?' এ ঠিক তাচ্ছিল্য নয়, এমনকি বিদ্রোহও নয়, এ হলো প্রথা আর বিধি-নিষেধ না মানার জেদ। 'জিজ্ঞেস করলে বলে দেব, তোমাকে আমি ভালবাসি।'

'তার আগে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া উচিত নয়?' নরম সুরে, সাবধানে জিজ্ঞেস করল রানা; নিজেকে তিরস্কার করছে–একটা মেয়ের সঙ্গে খুব বেশি জড়িয়ে পড়ার মজা এবার বোঝো! ভালবাসার কথা বলছে তাবাসসুম, এখন যদি বিয়ের কথাও বলে?

'নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া?' হেসে উঠল তাবাসসুম। 'আমি বড় হয়েছি, কাজেই নিজের ভাল-মন্দ বোঝার জ্ঞানও আমার হয়েছে। সত্যিকার একজন ভদ্রলোককে আমি ভালবাসি, ব্যস, ভালবাসি। কখনোই চাইব না চিরকাল কারও দাসী হয়ে থাকতে, কিংবা তাকেও খাঁচার পাখির মত বন্দী করে রাখব না। এরপর আর বোঝাপড়ার কিছু আছে?'

'তুমি সত্যি একটা ইকসেপশন্যাল মেয়ে। আবারও ধন্যবাদ, তাবাসসুম। পাকিস্তান বা পাকিস্তানীদের সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা তোমাকে দেখে অনেকটাই বদলে যাচ্ছে।' কব্জির রোলেক্সের ডায়ালে চোখ রাখল রানা। 'আমি যাই। কাল পিণ্ডি সেন্ট্রাল জেলে আবার দেখা হবে...,' বোতামে হাত পড়তে দেখে হঠাৎ প্রায় আঁতকে উঠল রানা। '...এই, কি করছ?'

তাবাসসুম এক মনে নিজের কাজ করে যাচ্ছে, কোন বিরতি ছাড়াই। তবে রানার প্রশ্নের জবাবে বলল, 'ঠিক আছে, বাবা, ঠিক আছে–তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না, সব আবার আমিই পরিয়ে দেব। আম্মির পৌঁছাতে দেরি আছে।'

ট্যাক্সি নিয়ে ইসলামাবাদ ম্যারিওটে ফেরার পথে সোহেলের ফোন পেল রানা। 'বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকার সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ আছে

তার, কাজেই রানার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল সে। যৌথ সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে গোপন আলোচনা বহুদূর এগিয়েছে, এমন কি একটা খসড়া চুক্তিও তৈরি করা হয়েছে। দাবির টাকা অর্ধেক কমাতে বলেছিল পাকিস্তান, কমালেই ওদের প্রাইম মিনিস্টার খসড়া চুক্তিপত্রটা অনুমোদন করবেন। এরপর বাকি থাকবে শুধু পার্লামেন্টের অনুমোদন। অধিবেশন যেহেতু চলছে, বাংলাদেশী প্রধানমন্ত্রীর ইসলামাবাদ সফর শেষ হবার আগেই চুক্তিটা প্রস্তাব আকারে ভোটে দেয়া হতে পারে। তবে এটাই হচ্ছে বড় বাধা, কারণ প্রস্তাবটা পাস হবার জন্যে দুই তৃতীয়াংশ সাংসদের ভোট দরকার। সরকারী দলের সবাই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেও দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন পেতে আরও বারোটা ভোটের দরকার হবে। সোহেলের বক্তব্য হলো, চুক্তিটা পার্লামেন্টে পাস করানোর ব্যাপারে সরকারকে এখন পর্যন্ত আন্তরিক বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু বিরোধী পক্ষের বারোটা ভোট তারা যদি সংগ্রহ করতে না পারে, এই চুক্তি কার্যকর করা যাবে না; অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘদিন, যতদিন কোন রাজনৈতিক দল পার্লামেন্ট নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়।

রানার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে সোহেল জানাল, পাওনা টাকার অঙ্কটা বিরাট, টাকা হাতে আসার এমন উজ্জ্বল সম্ভাবনা এর আগে কখনও দেখাও যায়নি, তাই বিভিন্ন মহলের আপত্তি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নিজের সিদ্ধান্তে অটল রয়েছেন–নির্দিষ্ট তারিখে অবশ্যই তিনি ইসলামাবাদ সফর করবেন, এবং চুক্তিতেও সই করবেন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল বাংলাদেশী প্রধানমন্ত্রী সরকারী অতিথি ভবনে উঠবেন। পরে তাঁর নিরাপত্তার কথা ভেবে সিদ্ধান্ত বদলানো হয়েছে। এখন তিনি মেজবান প্রাইম মিনিস্টারের সরকারী বাসবভনে উঠবেন। পর্যবেক্ষক মহল থেকে মন্তব্য করা হয়েছে, দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী মহিলা বলেই এই নতুন ও অভূতপূর্ব আয়োজন সম্ভব হতে পারছে।

এরপর সোহেলকে কাগজ-কলম নিতে বলল রানা। বেশ কয়েকটা জিনিস দরকার ওর। ওগুলো সংগ্রহ করে গিলগিটের রামা-য়, রানা এজেন্সির সেফ হাউসেই যেন রাখা হয়। প্রয়োজন বা ব্যবহারের সময় যেন হাতের কাছে পাওয়া যায়। সবশেষে চুপিসারে হামলা করার

একটা প্ল্যান দিল রানা—এই আক্রমণে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োজন হবে না: গ্যাস বোমা, গেরুয়া বসন, টাকসহ মুখোশ ইত্যাদি দরকার হবে। এরপর সোহেলকে মনে করিয়ে দিল রানা—ওর কাছে অতি ক্ষুদ্র একটা মাইক্রোফোন আছে, সেটা অন করলে বীপ রিসিভারে ইলেকট্রিক সংকেত পৌঁছাবে। বীপ রিসিভারটা সোহেলের সঙ্গেই আছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সে যদি কোন সংকেত পায় হামলাটা করার জন্যে রানা এজেন্সির এজেন্টদের নির্দেশ দিতে হবে—কালবিলম্ব না করে।

রাত বারোটা দশ। ক্লান্ত রানা ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধাতব কোন শব্দ, দূর থেকে ভেসে আসায় খুবই অস্পষ্ট, তারপরও ঘুমটা ভাঙিয়ে দিল। ঘুম ভাঙলেও, প্রথমে বুঝতে পারল না কেন ভেঙেছে। তারপর আবার হলো শব্দটা। অস্পষ্ট ঠুন, ধাতব আওয়াজ। কিসের শব্দ? স্যুইটের ভেতর, না বাইরে?

কান পেতে শুয়ে থাকল রানা। প্রচণ্ড ঘুমে চোখ বুজে আসতে চাইছে, তবে জানে এটা বিপজ্জনক বিলাসিতা হয়ে উঠতে পারে। মাঝরাতে এ-ধরনের অস্পষ্ট শব্দকে গ্রাহ্য না করায় অনেক এসপিওনাজ এজেন্টকে ঘুমের মধ্যে প্রাণ হারাতে হয়েছে।

এক চুল নড়ছে না, তাকিয়ে আছে অন্ধকারে। নিস্তব্ধতা একটা মোড়কের মত ঘিরে রেখেছে ওকে, সেই মোড়ক মাঝেমধ্যে ফুটো হচ্ছে রাস্তা থেকে ভেসে আসা যানবাহনের শব্দে, বেশিরভাগই পুলিস বা সামরিক বাহিনীর ভারী ট্রাক বা জীপ। একবার একটা ট্যাংকও গেল। আবার না পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে যায়! নাকি গোটা ব্যাপারটাই আসলে ক্যু-র একটা অংশ? তিন-তিনজন মন্ত্রী খুন হয়ে গেছে, ভাবা যায়! অথচ তদন্ত ঠিকমত এগোচ্ছে না। সবচেয়ে জরুরী প্রশ্নটা তুলছেই না কেউ—এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মোটিভটা কি? আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, জাতীয় কলঙ্ক গোপন রাখার অপচেষ্টা ইত্যাদি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এগোতে পারছে না তদন্ত।

কই, আর তো কোন শব্দ হচ্ছে না?

বোতাম টিপে রোলেক্স ঘড়ির ডায়াল আলোকিত করল রানা। ঘুম ভাঙার পর পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে। একটা হাই তুলল ও,

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল ঘুম তাড়াবার জন্যে। আধঘণ্টা। পঁয়ত্রিশ মিনিট। নাহ্, নিশ্চয় ভুল শুনেছে। ঘুম এবার পেয়ে বসছে ওকে। আহ্, কি আরাম আর কী শান্তি, গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া। চোখ বুজল রানা। বিস্ফারিত হয়ে খুলেও গেল।

আবার সেই শব্দ। এবার পরিষ্কারই শুনেছে ঠুন করে ঘষা খেলো কিসের সাথে কিছু একটা-দুটোই ধাতব জিনিস। তালায় চাবি ঢোকাবার আওয়াজ? তালা না খোলায় বারবার চেষ্টা করা হচ্ছে?

শব্দটা আসছে সিটিং রুম থেকে, তালাটা খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে করিডরে দাঁড়িয়ে। শব্দটা আবার হলো। লোকটা যে-ই হোক, রানা ঘুমাচ্ছে ধরে নিয়ে খুশি।

বিছানা থেকে নিঃশব্দে নামল রানা। জানালা আর দরজার নিচের সরু ফাটল, শুধু এই দুই উৎস থেকে ক্ষীণ আলো ঢুকছে স্যুইটে। দরজার নিচের সরু আলোর ফিতেটা একটা ছায়া ঢেকে দিল। নিশ্চিত হওয়া গেল বাইরে একজন আছে, এবং এখুনি ভেতরে ঢুকবে সে।

দ্রুত কাপড় পরছে রানা, তাকিয়ে আছে দরজার নবের দিকে। তালার ভেতর থেকে শব্দটা বেরিয়ে এলো—ক্লিক। দরজার নব ঘুরতে শুরু করল। চেয়ারের দিকে সরে এলো রানা, ওটার পিঠে ওর জ্যাকেটটা ঝুলছে। জ্যাকেটের নিচে চাপা পড়ে আছে শোল্ডার হোলস্টার, সেটা থেকে ওয়ালথারটা বের করে নিয়ে দ্রুত বিছানার কাছে ফিরে এলো, এক টানে বালিশগুলো ঢেকে দিল চাদর দিয়ে। দরজার কবাট যখন ফাঁক হলো রানা তখন চেয়ারের পিছনে গুড়ি মেরে বসে আছে।

লোকটার কাঁধ দুটো চওড়া। খুব সাবধানে ভেতরে ঢুকল, ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, পিস্তল ধরা হাতটা সামনে বাড়ানো। আর একটা ছায়ামূর্তি রয়েছে পিছনে, একটু বেশি লম্বা আর রোগা। এ-ও কোন শব্দ করছে না।

বিছানার দিকে মুখ করে পাশাপাশি দাঁড়াল দু'জন। দাঁড়িয়েই থাকল। কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। একটু পরই বোঝাও গেল অপেক্ষা করার কারণ। রাস্তা থেকে ভারী যানবাহনের শব্দ ভেসে এলো। হোটেলের সামনে দিয়ে সম্ভবত একটা মিলিটারি কনভয় পার

হচ্ছে। মোটা লোকটা মাথা ঝাঁকাল। তিন সেকেন্ড পর একসঙ্গে গুলি করল ওরা। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল, ভোঁতা ঢপ-ঢপ শব্দ হলো। ঘরের ভেতর গাঢ় ছায়া আর অন্ধকার। ওরা ধরে নিয়েছে বিছানার চাদরের তলায় ওটা রানা, বালিশ নয়।

গুলির শব্দ না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর হাত তুলে আলোর সুইচ অন করল। 'সারপ্রাইজ!' হাতের ওয়ালথার ওদের দিকে তাক করে ধরে আছে।

চরকির মত ঘুরতে শুরু করে রানার দিকে ফিরল লোক দু'জন, চোখে-মুখে হতচকিত ভাব। দু'জনের কাউকেই রানা আগে কখনও দেখেনি।

'হাতের ওগুলো ফেলে দাও!' ভারী গলায় বলল রানা।

মোটা লোকটা ওর কথা শুনল না। পিস্তল ধরা হাত ওপরে তুলছে, একই সঙ্গে ভাঁজ করছে একটা হাঁটু। গুলি করল মেঝেতে হাঁটুটা ঠেকতে। সামনের চেয়ারটাই রানার কাভার, চেয়ারের ফ্রেম থেকে কাঠের খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। দ্বিতীয় বুলেট আসছে দেখে মাথাটা নিচু করল রানা। এই গুলিটা চেয়ারের গদি ফুটো করে দিল।

চেয়ারের পিছনে মেঝেতে পড়ল রানা, গড়ান দিল একটা, সিধে হবার সময় বেডরুমের দূরপ্রান্তে একটা গুলি করল। সাইলেন্সার নেই, ওয়ালথারের গর্জনে গোটা হোটেল যেন কেঁপে উঠল। চওড়া কাঁধ কোন কাজে এলো না, বুকের গর্তটা দু'হাতে চেপে ধরে বসে পড়ল লোকটা, তারপর কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল।

দ্বিতীয় আততায়ী যেন সঙ্গীর ব্যর্থতা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিল। এবার সে-ও শুরু করল। তার প্রথম গুলিটা লাগল রানার মাথার পাশে দেয়ালে। ট্রিগারে টান দিতে যা দেরি, ডাইভ দিয়ে বিছানার পিছনে আড়াল নিল সে।

রানা গুলি করলেও লাগাতে পারল না, একটা নাইট টেবিলের পায়াই শুধু ভাঙতে পারল। আবার সেই মজবুত চেয়ারটার পিছনে আড়াল নিয়েছে ও। মেঝেতে একটা অ্যাশট্রে পড়ে থাকতে দেখে তুলে ডান দিকে ছুঁড়ে দিল, আততায়ী লোকটা খাটের আড়াল থেকে গুলি

করল সেদিকে। হাসি চেপে সিধে হলো ও, বাম দিকে লাফ দিয়ে সুইচ অফ করল। ঘর এখন অন্ধকার। হামাগুড়ি দিয়ে ওয়ার্ড্রোবের আড়ালে চলে এলো রানা।

লোকটা দাঁড়াল। বিছানাকে পিছনে ফেলে খুব সাবধানে দরজার দিকে এগোচ্ছে, একের পর এক গুলি করছে রানার দিকে। ওয়ার্ড্রোবের কিনারা ভেঙে ফেলছে বুলেটগুলো। এক কোণে কুঁকড়ে বসে থাকতে বাধ্য হলো রানা। এই সুযোগে দরজা দিয়ে করিডরে বেরিয়ে গেল আততায়ী।

লাফ দিয়ে রানাও বেরুল, কিন্তু ততক্ষণে করিডরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে লোকটা, বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। করিডরের আরেক দিকে তাকাতে পিস্তল হাতে দু'জন সিকিউরিটি গার্ডকে এগিয়ে আসতে দেখল রানা। 'হোটেলের পিছনে পার্কিং এরিয়ায় যাচ্ছে খুনী। দেখো তাড়া করে ধরতে পারো কিনা।'

রানার দেখানো পথ ধরে ছুটল তারা।

স্যুইটে ফিরে ব্রিফকেস থেকে স্পেয়ার ম্যাগাজিন বের করে ওয়ালথারে ভরল ও, তারপর আবার করিডরে বেরিয়ে এলো। হোটেল সিকিউরিটির আরও কয়েকজন গার্ডকে ছুটে আসতে দেখা গেল। নিজের আই.ডি. কার্ডটা তাদেরকে দেখিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল ও, কিন্তু পার্কিং এরিয়ায় কাউকে দেখা গেল না। সিকিউরিটি গার্ড দু'জন সারি সারি গাড়ির ওপর বোকার মত চোখ বুলাচ্ছে।

এই সময় একটা গাড়ি স্টার্ট নিল। অনেক দূরে, একেবারে খোলা গেটের কাছে। হোন্ডা সিভিক গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, একই সময় গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে একটা টয়োটা স্প্রিন্টার। ছুটল রানা। গার্ড দু'জন ছায়ার মত লেগে আছে পিছনে।

টয়োটার পথ আগলে দাঁড়াল রানা। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দরজা খুলে নিচে নামল সিল্ক শাড়ি ও হাতকাটা ব্লাউজ পরা এক তরুণী, নেপালি কিংবা ভারতীয় হতে পারে। সিঁথিতে সিঁদুর। বউ যারই হোক, সদ্য ফোটা গোলাপের মত সুন্দর; তবে দু'কোমরে হাত রেখে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে, যেন ফণা তোলা সাপ। নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দুটো একটু তুলে তাকে পাশ কাটাল রানা। স্টার্ট দেয়া গাড়ির দরজা

বন্ধ করে ইউ টার্ন নিল, তরুণী বা গার্ডদের দিকে একবারও না তাকিয়ে বেরিয়ে এলো গেট দিয়ে।

হোন্ডা সিভিককে খুঁজে পেতে বিশেষ সময় লাগল না। নাজিম-উদ-দীন রোড ধরে ছুটছে ওটা।

বিশ কিলোমিটার পর বাম দিকে বাঁক নিল ওরা, রমনা নাইন্থ অ্যাভিনিউ ধরে আল্লামা ইকবাল ওপেন ইনিভার্সিটিকে পাশ কাটাল। মারগুল্লা রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে গাড়ি থামিয়ে ভেতরে ঢুকল আততায়ী। রানাও পিছু নিয়ে ছুটল। লোকটাকে জীবিত ধরতে চায় ও। কথা বলাতে পারলে আসল ভিলেন বা কালপ্রিট সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

দেশের অবস্থা ভাল নয়, রাতও গভীর, স্টেশনে লোকসমাগম কম। সিঁড়ি বেয়ে একটা ব্রিজে উঠল রানা লোকটার পিছু নিয়ে। 'হল্ট! রুখো!' চিৎকার করল ও। 'নেহি তো গোলি চালেগি!' কিন্তু লোকটা থামলও না, গুলিও করল না।

ব্রিজ থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে থাকল না লোকটা, লাইনগুলোকে আড়াআড়িভাবে পার হচ্ছে। একটা ট্রেন আসছে। ধীরে ধীরে থামছে সেটা। সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও লোকটা সেটায় চড়ল না। ট্রেনটার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে তাকে। ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে একবার দেখল। রানা ছুটছে, তবে জানে লোকটার কাছে পৌঁছাবার আগেই ট্রেনের শেষ বগি তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। লাইন টপকে আবার ছুটতে শুরু করবে লোকটা।

ঘটলও ঠিক তাই। রানা এখনও বিশ গজ পিছনে। লোকটার সামনে ফাঁকা লাইন। ছুটল সে। লাইন টপকাল। সামনে আরও একজোড়া। সেটাও টপকাচ্ছে। উল্টোদিক থেকে এলো আরেকটা ট্রেন। লোকটা কিছু বুঝে ওঠার সময় পেল না। ট্রেনটা তার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। দুটো ট্রেনের হুইসেল একই সঙ্গে বাজছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে হেঁটে আসছে রানা। এখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। হাতে এখনও চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমাবার সময় আছে, পুলিস এসে পড়লে সেটাও হারাতে হবে।

কি ঘটেছে জানাবার জন্যে পাবলিক বুদ থেকে ফোন করে

পিএনএসএ চীফের ঘুম ভাঙাতে হলো। সবশেষে অনুরোধ করল, ব্রিগেডিয়ার কাজেমি যাতে এমন ব্যবস্থা করেন যে রানা হোটেলে ফিরলে সিকিউরিটি গার্ড বা পুলিস ওকে কোন প্রশ্ন না করে, এবং হোটেলে ফিরে ও যেন দেখে ব্রিফকেস সহ ওর ব্যক্তিগত সব জিনিসপত্র অন্য একটা স্যুইটে আনা হয়েছে, যেখানে বাকি রাতটুকু নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারবে ও।

বারো

ঘড়িতে অ্যালার্ম দেয়া ছিল। শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়েছে রানা, কাপড়চোপড় পরাও শেষ, এই সময় রুম সার্ভিস ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলো।

ঠিক সাতটার সময় হোটেলের সামনে থেকে ওকে নিজের মার্সিডিজ গাড়িতে তুলে নিলেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি। সরাসরি রাওয়ালপিণ্ডির সেন্ট্রাল জেলে যাচ্ছে ওরা। জেইলার ভদ্রলোক, সাবেক জেনারেল ইলিয়াস মোস্তাফা, ওদেরকে নিজের কোয়ার্টারে অভ্যর্থনা জানাবেন। কোর্ট মার্শালের গোপন বিচার ও রায়ে সাজাপ্রাপ্ত (কর্নেল) শাহিন শিকদারকে রাখা হয়েছে সলিটারি কনফাইনমেন্ট-এ। এই জেলখানায় হাজার হাজার কয়েদী আছে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মেলামেশা তো দূরের কথা, দেখা পর্যন্ত করতে দেয়া হয় না তাঁকে।

একটা অতি গোপন তথ্য রানা জানে, আর হয়তো জানেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি। সেটা হলো, অনেক কৌশল ও কাঠখড় পুড়িয়ে লাহোর জেল থেকে শাহিন শিকদারকে পিণ্ডি জেলে নিয়ে আসেন জেইলার ইলিয়াস মোস্তাফা। শুধু নিয়ে আসেননি, গোপনে তাঁকে সঙ্গও দিয়েছেন বা হয়তো এখনও দিচ্ছেন। রানা জেনেছে তাবাসসুমের কাছ

থেকে, আর ব্রিগেডিয়ার কাজেমি জেনেছেন তাবাসসুমের আব্বুর কাছ থেকে, কারণ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁরা।

পিণ্ডি সেন্ট্রাল জেলের ভেতর সকাল ঠিক সাড়ে সাতটায় পৌঁছাল মার্সিডিজ। জেইলার ইলিয়াস মোস্তাফা সাহেব নিজেই গাড়ি-বারান্দায় বেরিয়ে এসে ওদেরকে রিসিভ করলেন, সঙ্গে রয়েছে প্রথমপক্ষের ব্রিটিশ স্ত্রী মিস মার্গারেট, ওঁদের একমাত্র সন্তান দীনা তাবাসসুম। ভেঙে পড়া এই পরিবারটি সম্ভবত কাল রাতে পুরোপুরি জোড়া লেগেছে, তিনজনের চোখে-মুখেই আনন্দ ও প্রশান্তির ছাপ লক্ষ করা গেল। করমর্দন, কুশল বিনিময় ইত্যাদির পর সরাসরি ডাইনিং হলে গিয়ে ব্রেকফাস্টে বসার অনুরোধ জানালেন জেইলর ইলিয়াস মোস্তাফা। তারপর যখন শুনলেন যে ওরা নাস্তা খেয়ে এসেছে, বললেন, 'তাহলে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে আর অপেক্ষা করিয়ে রাখা উচিত হবে না। চলুন, জনাব শিকদার সাহেবের সঙ্গে ইয়াংম্যান মাসুদ রানার সাক্ষাতের ব্যবস্থাটা সেরেই ফেলি।'

ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে রানার দৃষ্টি বিনিময় হলো। বোঝা গেল জেইলার ভদ্রলোকের কথা দুজনের কারুরই বোধগম্য হয়নি। রানাই জিজ্ঞেস করল, 'কাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা উচিত হবে না, মিস্টার মোস্তাফা?'

'আমাদের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীকে,' বললেন সাবেক মেজর জেনারেল। 'ঠিক আছে, চলুন আমরা রওনা হই। অনেকটা পথ পেরুতে হবে, যেতে যেতে বলছি সব।'

মার্সিডিজেই আবার চড়ল সবাই। রানা বসল ব্যাকসিটে, ওর পাশের সিটে তাবাসসুমকে উঠতে দেখে জেইলার ভদ্রলোক মেয়েকে বললেন, 'তোমারও কি যাওয়া দরকার?'

তাবাসসুম জবাব দিল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, আব্বু, এটা আমার আর রানার যৌথ মিশন।'

পিণ্ডি সেন্ট্রাল জেল পঞ্চাশ একর জায়গা নিয়ে বিস্তৃত। সলিটারি কনফাইনমেন্ট সেকশনটা একেবারে শেষ মাথায়। লোহার একটা দোতলা বিল্ডিং। পাঁচিল, গেট, দেয়াল, করিডর, সিঁড়ি ও সেল, সবই ইস্পাত কিংবা লোহা দিয়ে তৈরি; তবে কয়েদীরা যাতে দেয়ালে মাথা

ঠুকে আত্মহত্যা করতে না পারে তার জন্যে সেলের দেয়ালে ও মেঝেতে প্যাড লাগানো আছে।

আজ সকালে এই লোহার দোতলা ভবনে জেইলার আসবেন, তাঁর সঙ্গে আরও লোকজন থাকবে, এ-খবর কাউকে জানানো হয়নি। কারারক্ষীদের জন্যে এটা একটা সারপ্রাইজ ভিজিটই হতে যাচ্ছে।

নতুন করে প্রশ্ন করতে হলো না, জেইলার ভদ্রলোক প্রসঙ্গটা নিজেই তুললেন। প্রথমে একটা ভূমিকা করলেন তিনি। প্রাইম মিনিস্টার ও সেনাপ্রধান কাল গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক করেছেন। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রাইম মিনিস্টারকে জানানো হয় একাত্তর নয়, সত্তর সালে স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো নামে একটা বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। ওই বাহিনীতে ছিল দশটা গ্রুপ, প্রতিটি গ্রুপে ছিল বিশজন করে কমান্ডো। দশটা গ্রুপকে একাত্তরে একই মিশনে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান) পাঠানো হয়। মিশনের নাম ছিল–কেএইচকেএল।

একাত্তর সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো গ্রুপগুলোকে লাহোরে ফিরিয়ে আনা হয়। প্রাইম মিনিস্টার এর কারণ জানতে চাইলে বর্তমান সেনাপ্রধান সঠিক কোন উত্তর দিতে পারেননি, তবে তাঁর ব্যাখ্যা থেকে অন্তত দুটো সম্ভাব্য উত্তর আঁচ করা যায়–এক, কেএইচকেএল-এর প্রয়োজনীয়তা ওই সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল; দুই, কমান্ডোরা অতিমাত্রায় নৃশংসতার পরিচয় দিচ্ছিল।

প্রধানমন্ত্রীকে আরও জানানো হয়, এই স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো বাহিনী গঠন করার প্রতিবাদ করায় একাত্তর সালের প্রথম দিকে কর্নেল শাহিন শিকদারকে গ্রেফতার করা হয়। সামরিক আইন ভঙ্গ করার গুরুতর অপরাধে পঞ্চাশ বছরের জেল হয় তাঁর। শুধু তাই নয়, কোর্ট মার্শালের রায়ে বলা হয়, তাঁর সমস্ত পদক ও পদোন্নতিও প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

এরপর সেনাপ্রধান প্রাইম মিনিস্টারকে ব্যাখ্যা করেন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তানে কি ঘটেছিল। গোপন সামরিক ট্রাইবুনাল গঠন করে সে-সময় বিভিন্ন বিষয় তদন্ত করা হয় এবং বিচার করে রায় দেয়া হয়। স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডোরা সংখ্যায় ছিল দুশো, মার্চ মাসের

পঁচিশ তারিখ থেকে নভেম্বর মাসের পনেরো তারিখ পর্যন্ত এদের সত্তরজন খুন হয় বাংলাদেশী মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। আর পনেরোজন মারা যায় বিভিন্ন দুর্ঘটনায়–সাঁতার না জানায় পানিতে ডুবে, সাপের কামড়ে, ধর্ষণ করতে গিয়ে বাঙালী মেয়ের ক্ষুরের পোঁচ খেয়ে। কারণটা স্পষ্ট নয়, জানা যাবে তাদের ফাইল দেখলে, বাকি একশো পনেরোজনের বিচার করা হয় গোপন সামরিক ট্রাইবুনালে। ট্রাইবুনালে তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয়েছিল, মিশন কেএইচকেএল-এর অর্থ কি, এই মিশন নিয়ে বাংলাদেশে যাবার পর গ্রুপের কমান্ডোরা কি ধরনের অপরাধ করেছিল, নাকি অপরাধ নয় বরং আদেশ পালন করতে গিয়েই যা করার করেছিল তারা–এ-সব প্রশ্নের উত্তর আছে ট্রাইবুনালে গোপন অধিবেশনের লিখিত বিবরণে, বিচারকদের রায়ে, কমান্ডোদের দেয়া বক্তব্যে। সমস্ত দলিল, রেকর্ড ও ডকুমেন্ট ক্লাসিফাইড ঘোষণা করা হয়। রায়ে বলা হয়, পঞ্চাশ বছর পর ডি-ক্লাসিফাই করা হবে, তখন কাউকে না দেখিয়ে সব পুড়িয়ে ফেলা বাধ্যতামূলক।

প্রাইম মিনিস্টার তখন সেনাপ্রধানকে যুক্তি দেন, ডকুমেন্টগুলো ক্লাসিফাইড করা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। কেন? এর একমাত্র জবাব হলো–রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজন হলে ডকুমেন্টগুলো দেখা যাবে। সেনাপ্রধান একমত হয়ে জানালেন, রায়ে এ-ধরনের একটা কথা বলা আছে যে ট্রাইবুনালে যারা বিচারকের ভূমিকা পালন করলেন তাঁদের অন্তত একজনের সম্মতিতে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী ওই ক্লাসিফাইড ফাইল খুলতে পারবেন।

তাঁর কথা শেষ হতে রানা জানতে চাইল, 'এত কথা আপনি জানলেন কিভাবে?'

এর জবাবে সাবেক মেজর জেনারেল, পিণ্ডির বর্তমান জেইলার ইলিয়াস মোস্তাফা বললেন, 'জেনেছি প্রধানমন্ত্রী জানানোয়। কাল রাত আড়াইটার সময় প্রাইম মিনিস্টার আমাকে ফোন করেছিলেন।'

'কেন?' রানা, ব্রিগেডিয়ার কাজেমি ও তাবাসসুম প্রায় একযোগে জানতে চাইল।

'এই জন্যে যে ওই গোপন সামরিক ট্রাইবুনালে আমিও একজন বিচারক ছিলাম। এবং বিচারকদের মধ্যে আমিই একমাত্র বেঁচে আছি

এখনও।'

'যুদ্ধের সময় আপনি মেজর ছিলেন,' বলল রানা। 'গোপন কোন ট্রাইবুনালের বিচারক কি একজন মেজর হতে পারেন?'

'যুদ্ধের পর আমি ব্রিগেডিয়ার হই।'

'গ্রুপ ফটোটা দেখে আপনি আমাকে বলেছিলেন, স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডোর ওই বিশজন সদস্য আপনার রেজিমেন্টের সোলজার ছিল,' বলল রানা, গলার আওয়াজ শুকনো ও ঠাণ্ডা। 'তাহলে আমরা এ-ও ধরে নিতে পারি যে অন্তত ওই গ্রুপটাকে মিশন কেএইচকেএল-এর জন্যে আপনিই ট্রেনিং দিয়েছিলেন?'

উত্তর দিতে দু'সেকেন্ডে দেরি করলেন সাবেক মেজর জেনারেল। 'আপনার এ প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক, মিস্টার রানা। তবু আমি উত্তর দিচ্ছি সৌজন্যবশত। হ্যাঁ, ওদেরকে আমিও ট্রেনিং দিয়েছিলাম। তবে আমরা ক'জন ট্রেইনার ছিলাম, কি ট্রেনিং দিয়েছিলাম, কেন দিয়েছিলাম, বা বাংলাদেশেও আমি ওদেরকে নেতৃত্ব দিই কিনা, এ-সব কোন প্রশ্নেরই উত্তর আপনি পাবেন না।'

খুক করে কেশে পিএনএসএ চীফ বললেন, 'আমরা বরং আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আপনার কথা শুনে মনে হলো প্রাইম মিনিস্টার আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন...'

'হ্যাঁ, সত্যি তিনি অপেক্ষা করছেন,' বললেন জেইলার ভদ্রলোক। 'তাঁকে বলা হয়েছে স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডোদের কি ট্রেনিং দেয়া হয়, মিশন কেএইচকেএল-এর মানে কি ইত্যাদি বহু তথ্য শাহিন শিকদার জানেন। মিস্টার রানা তাঁর বক্তব্য শোনার পর যদি বুঝতে পারেন যে আততায়ীকে ধরার জন্যে প্রয়োজনীয় ক্লু তিনি পেয়ে গেছেন, প্রাইম মিনিস্টার তাহলে ক্লাসিফাইড ফাইল দেখতে চাইবেন না। শাহিন শিকদারের কথা শোনার পর মিস্টার রানা কি বলেন শুনে প্রাইম মিনিস্টারকে ফোন করব আমি...'

মার্সিডিজের সামনে ও পিছনে ইউনিফর্ম পরা কারারক্ষীদের দুটো জীপ রয়েছে। সামনের জীপের গতি কমে আসছে দেখে তাবাসসুম রানার ডান পাশ থেকে বলল, 'আমরা বোধহয় পৌঁছে গেছি।'

গাছপালার আড়ালে থাকায় লোহার দোতলা দালানটা এতক্ষণ

ওরা দেখতে পাচ্ছিল না। এক মিনিট পর গাছগুলোকে পাশ কাটিয়ে আসতেই দেখা গেল। এরকম লোহার তৈরি দালান আগে কখনও দেখেনি রানা। বাইরে থেকে দেখে দালান বা বাড়ি বলে মনেই হয় না, যেন অসংখ্য লোহার রড দিয়ে প্রকাণ্ড একটা খাঁচা বানিয়ে রাখা হয়েছে।

দালানের সামনে কয়েকজন সশস্ত্র কনেস্টবলকে নিয়ে পাহারায় রয়েছে একজন হাবিলদার। জেইলার সাহেবকে স্যালুট করল তারা, চেহারার হতচকিত ভাব। হাবিলদারও নার্ভাস, তবে সেটা সে চেপে রাখতে পারছে। সে জানে জেইলার সাহেব প্রায়ই পুরানো কয়েদী শাহিন শিকদারের সঙ্গে দাবা খেলতে আসেন, এবং খবর না দিয়ে কখনোই আসেন না। কিন্তু নিজের মেয়ে সহ দু'জন অচেনা মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সারপ্রাইজ ভিজিটে আসার পিছনে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে।

'হাবিলদার কিসমত খান!' বললেন জেইলার। 'আমরা সাতশো সতেরো নম্বর কয়েদী শাহিন শিকদারের সেলে যাব এখন। আমাদের সঙ্গে একা শুধু তুমি যাবে, তবে আমাদেরকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবে। তার আগে বলো, শিকদার সাহেবের আশপাশের সেলে কারা আছে?'

'ওনার দু'পাশের দুটো করে চারটে সেলই খালি, স্যার,' জবাব দিল হাবিলদার কিসমত খান। 'খালি উল্টোদিকের সবগুলো সেলও...'

'অর্থাৎ দোতলায় একা আছেন উনি?'

'ইয়েস, সার।'

'শিকদার সাহেবকে নাস্তা খাওয়ানো হয়েছে?' জানতে চাইলেন জেইলার।

হাবিলদার হাতঘড়ি দেখল। 'নাস্তা আসে ন'টায়, সার।'

'ঠিক আছে, আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো,' বললেন জেইলার।

গেটের পাশে লোহার একটা বাক্স খুলে ভেতর থেকে চাবির যে গোছাটা হাবিলদার কিসমত খান বের করল, রানার মনে হলো সেটার ওজন সের পাঁচেকের কম হবে না। বড় একটা চাবি দিয়ে গেটের তালা

খোলা হলো। নিচতলার প্রতিটি সেল নিশ্ছিদ্র ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি। দরজাগুলো লোহার ও অসম্ভব ভারী। সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে আরও তিনটে গেটের তালা খুলতে হলো হাবিলদারকে। প্রতিটি গেট পার হবার পর আবার তালা লাগিয়ে দিচ্ছে সে। তাবাসসুম জিজ্ঞেস করায় জানাল–এটাই নিয়ম।

নিয়মের প্রসঙ্গ ওঠায় তাবাসসুমের কৌতূহল বেড়ে গেল। হাবিলদার সবিনয়ে ও সসম্ভ্রমে তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল। সলিটারি কনফাইনমেন্টের কয়েদীকে সেল থেকে মাসে মাত্র একবার দিনের আলোয় বের করা হয়। ছোট্ট একটা ফাঁকা মাঠে আধ ঘণ্টা একা হাঁটাহাঁটি করতে পারে সে। তাকে দিনে তিনবার খেতে দেয়া হয়। কারারক্ষী যারা দালানের মূল গেটে পাহারা দেয় তারাই কয়েদীর সেলে খাবার পৌঁছে দেয়। প্রতিবার দু'জন করে আসে তারা। চব্বিশ ঘণ্টায় তিনবার কারারক্ষীদের পালা বদল ঘটে, ফলে তিন দলকেই খাবার নিয়ে দালানের ভেতর ঢুকতে হয়। তিনটে দলকেই দু'মাস পর জেলখানার অন্য কোথাও ডিউটি দেয়া হয়, তাদের জায়গায় আসে নতুন তিন দল কারারক্ষী।

দোতলায় উঠেও তিনটে গেটের তালা খুলতে হলো, এবং অবশেষে ওদের সবাইকে নিয়ে শাহিন শিকদারের সেলের সামনে হাজির হলো হাবিলদার কিসমত খান।

কৌতূহলী তাবাসসুমকে দরজার গায়ের ছোট্ট, চৌকো একটা রেখা দেখাল হাবিলদার। 'এটা একটা জানালা। এই জানালার তালা খুলে ভেতরে খাবার দেয়া হয়। তবে কয়েদীকে বের করার প্রয়োজন হলে দরজার তালা খুলতে হয়।' জেইলারের দিকে তাকাল সে। 'খুলি, সার?'

'হ্যাঁ, খোলো,' বললেন জেইলার।

'কিন্তু ভেতরে তো বসার কোন জায়গা নেই, সার।' হাবিলদার ইতস্তত করছে। 'আপনারা এতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

'আমরা দাঁড়িয়েই কথা বলব,' ধমকের সুরে বললেন জেইলার। 'তুমি সেলের দরজা খোলো।'

'জ্বী, সার,' বলে গোছা থেকে সবচেয়ে বড় চাবিটা বেছে নিয়ে

প্রকাণ্ড তালায় ঢোকাল হাবিলদার কিসমত।

এই মুহূর্তে রানার অনুভূতি বলার মত নয়। এই ভারী লোহার দরজার ওপারে আজ দুই যুগেরও বেশি একজন প্রতিবাদী বাঙালী সামরিক অফিসারকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছে। তাঁর পরিবার, স্ত্রী, বাচ্চা, বন্ধু, আত্মীয় কেউ জানে না আজও তিনি বেঁচে আছেন, নাকি মারা গেছেন। এরকম অমানবিক আচরণ করে মানুষ পার পেয়ে যাচ্ছে, অথচ আমরা সভ্যতার প্রশংসা করি, নিজেদের দাবি করি সৃষ্টির সেরা জীব; ভুলেও একবার ভাবি না যে এরকম বর্বর ও নির্মম আচরণ কোন পশু কখনও করবে কিনা।

সেলের তালা খোলা হলো। ভাবাবেগের লাগাম টেনে সবার সামনে থাকার জন্যে এগোল রানা। হয়তো ওর মনের অবস্থা আন্দাজ করতে পেরেই তাবাসসুম, জেইলার ও পিএনএসএ চীফ একটু সরে গিয়ে ওকে জায়গা করে দিলেন। খোলা দরজা দিয়ে শাহিন শিকদারকে দেখতে পেল সবাই ওরা। রানাই প্রথমে ভেতরে ঢুকল, ওর পিছু নিয়ে বাকি সবাই। সালাম দিল ও। 'আসসালামালায়কুম, কর্নেল শাহিন শিকদার সার।' সুপিরিয়র অফিসার ছাড়া আর কাউকে কখনও সার বলেছে কিনা মনে পড়ে না। আজ শব্দটা অন্তরের গহীন গভীর থেকে বেরিয়ে এলো। শুধু তাই নয়, পাষাণ হৃদয় মাসুদ রানার চোখ দুটো এই মুহূর্তে ভিজে উঠতে চাইছে, ইচ্ছে হচ্ছে এই মহান বাঙালী বীরকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

তিনি, শাহিন শিকদার, ওর সালামের কোন জবাব দিলেন না। মেঝের ওপর বিছানো কম্বলের ওপর ওদের দিকে পিছন ফিরে শুয়ে আছেন। দেখে মনে হলো এখনও ঘুমাচ্ছেন। তবে সেলের অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে রানাই সবার আগে উপলব্ধি করল, কর্নেল শাহিন শিকদারের ঘুম আর কোনদিনই ভাঙবে না। তাঁর খুলির পিছনে, ঘাড়ের ওপর গভীর কাটা দাগটা নিঃশব্দে সেই কথাই বলতে চাইছে।

তেরো

জেইলারের অফিস থেকে ইসলামাবাদে, বাংলাদেশ হাইকমিশনে ফোন করল রানা। হাইকমিশনারকে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার পর বলল, পিণ্ডি জেল কর্তৃপক্ষ পোস্টমর্টেম করার পরপরই কর্নেল শাহিন শিকদারের লাশ চার্টার করা প্লেনে তুলে ঢাকায় পাঠাতে হবে। ইতিমধ্যে বসের সঙ্গেও আলাপ হয়েছে ওর, বস্ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে; জানা গেছে শাহিন শিকদারকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হবে।

পাকিস্তান সরকার এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উন্মোচনের জন্যে অবসরপ্রাপ্ত তিনজন বিচারপতিকে নিয়ে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কমিটি রিপোর্ট দেবে সাতদিনের মধ্যে। প্রাথমিক তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ মাত্র একটা তথ্যই গোয়েন্দা পুলিস জানতে পেরেছে, তা হলো–কাল সন্ধ্যায় কারারক্ষীদের যে দু'জন কনেস্টবল শাহিন শিকদারকে রাতের খাবার দিয়ে এসেছিল তাদেরকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে এরা দু'জনই খাবার দিতে গিয়ে শাহিন শিকদারকে তাঁর সেলে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেছে।

রানার সামনেই, অফিস থেকে, নিজেদের প্রাইম মিনিস্টারকে ফোন করে ঘটনার বিবরণ দিলেন জেইলার ইলিয়াস মোস্তাফা। পরিস্থিতির এরকম মর্মান্তিক অবনতি ঘটায় প্রাইম মিনিস্টার সরাসরি রানার সঙ্গে কথা বলে শোক প্রকাশ করলেন, তারপর জানালেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জানাজার সময়টায় তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে থাকার জন্যে লাহোরে যেতে হচ্ছে তাঁকে, তবে সঙ্গে করে ক্লাসিফাইড ফাইলটা নিয়ে যাচ্ছেন, আসা-যাওয়ার পথে চোখ বুলাবার চেষ্টা করবেন। ওটা পড়া শেষ হলে

তাঁর প্রতিক্রিয়া ও সিদ্ধান্ত রানাকে জানানো হবে।

সকাল এগারোটার কিছু আগে ইসলামাবাদে ফিরে এলো ওরা। সামনের সিটে, ড্রাইভারের পাশে বসেছেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি। রানা ও তাবাসসুম ব্যাকসিটে।

একদিকে প্রবল শোকে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, আরেকদিকে যেন চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে রানা। বস্ ওকে ঢাকা থেকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর ইসলামাবাদ সফর বাতিল করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। অর্থাৎ তিনি আসছেনই। আর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে নাগালের মধ্যে পেলে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ী তাঁকে হত্যার করার এত বড় সুযোগ অবশ্যই হাতছাড়া করবে না। রানা এখন প্রায় নিশ্চিত, একের পর এক এই যে খুনগুলো হচ্ছে, নিহতদের মধ্যে পাকিস্তানী মন্ত্রীরা সংখ্যায় বেশি হলেও, গোটা ব্যাপারটার উৎসমূলে অবশ্যই বাংলাদেশের প্রতি ক্রোধ, আক্রোশ আর প্রচণ্ড ঘৃণা থাকতে বাধ্য। এই খুনী এতদিন কোথায় ছিল? যখনই বাংলাদেশের ন্যায্য পাওনা নিয়ে আলোচনা শুরু করার মত একটা পরিবেশ তৈরি হতে যাচ্ছে, অমনি এই আলোচনা বৈঠকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'দেশের আমলা ও মন্ত্রী-মিনিস্টাররা খুন হতে লাগল–এ থেকেই তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

পথে কোন কথা হয়নি। মার্সিডিজ রাজধানীতে ঢোকার পর রানা ভাবল, হোটেলে ফিরে পাক প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করবে ও। কিন্তু কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। তাবাসসুমকে ও জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জানাজা শেষ হবে কখন?'

তাবাসসুম মাথা নাড়ল। 'তা তো জানি না।'

সামনের সিট থেকে ব্রিগেডিয়ার কাজেমি বললেন, 'উনি লাহোর থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্য ছিলেন, নিজের এলাকায় তাঁর জনপ্রিয়তা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। এটাই শেষ জানাজা, কাজেই সময় তো লাগবেই।'

তিনি থামতেই ড্রাইভার অনুমতির অপেক্ষা না করে ড্যাশবোর্ডের পাশে বসানো ছোট, নয় ইঞ্চি কালার টিভিটা অন করল। পিটিভি জানাজা অনুষ্ঠানটা লাইভ দেখাচ্ছে। ব্রিগেডিয়ার আর ড্রাইভারের

মাথার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে টিভির স্ক্রীনে চোখ রাখল রানা। একটা স্টেডিয়াম দেখা যাচ্ছে। বিশাল স্টেডিয়ামে তিল ধারণের জায়গা নেই। আরেক ক্যামেরায় ছবিতে দেখা গেল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো বিপুল জনতার সামনের অংশ। ফাঁকা একটা জায়গায় সাদা চাদর ঢাকা খাট রাখা হয়েছে, চাদরের তলায় পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর লাশ। জানাজায় প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রীসভার সকল সদস্য, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আমলা ও বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে আত্মীয়-স্বজন এবং কয়েক লাখ সাধারণ জনতা অংশ নিচ্ছে। এতক্ষণ নিরব ছিল পিটিভি, নেপথ্য থেকে হঠাৎ অনুষ্ঠানের ধারা বিবরণী দেয়া শুরু হলো, আসসালামুলায়কুম, শোকাকুল দেশবাসীকে আমরা লাহোরের মোয়াম্মার আল গাদ্দাফি স্টেডিয়াম থেকে স্বাগত জানাচ্ছি...'

অকস্মাৎ রানার গলা থেকে আঁতকে ওঠার মত, বিস্ময়বোধক একটা শব্দ বেরিয়ে এলো, 'গড! ওহ্, গড! তাবাসসুম, এবার আমার মনে পড়েছে!'

'কি?' তাবাসসুম হতভম্ব হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে। 'কি মনে পড়েছে, রানা?'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালেন ব্রিগেডিয়ার, একাধারে কৌতূহলী ও উদ্বিগ্ন।

'ড্রাইভার, গাড়ি থামাও!' বলল রানা, প্রায় চিৎকারের মত শোনাল। 'মিস্টার কাজেমি, এখন সময় নেই, পরে সব ব্যাখ্যা করব আপনাকে। তাবাসসুমকে নিয়ে এক জায়গায় যেতে হচ্ছে আমাকে।'

মার্সিডিজ ভাল করে থামেনি, দরজা খুলে লাফ দিল রানা, তাবাসসুমের কব্জি ওর ডান হাতের মুঠোয়। হাত তুলতেই ঘ্যাঁচ্ করে থামল, হ্যাঁচকা টান দিয়ে দরজা খুলে হলুদ ট্যাক্সিটায় উঠে বসল রানা, এতক্ষণে মুঠো আলগা করায় নিজের কব্জি ছাড়িয়ে নিয়ে অপর হাত দিয়ে ডলতে শুরু করল তাবাসসুম। 'তোমার ওটা হাত, না লোহা!'

'কি?' রানাকে বিমূঢ় দেখাল। 'ও। সরি। শোনো...'

ড্রাইভার সামনে থেকে জানতে চাইল, 'কোথায়, সার?'

'সিতারা অটোমোবাইলের হেড অফিসে যাচ্ছি আমরা,' তাবাসসুমকে বলল রানা, 'ওটার মালিক একরামুল আলভি ওখানেই

যদি বসেন।'

'হ্যাঁ, সিতারা অটোমোবাইলের ফ্যাক্টরি ও হেড অফিস একই জায়গায়,' বলল তাবাসসুম। 'বাদশা ফয়সল মসজিদ থেকে দশ কিলোমিটার উত্তরে।' ড্রাইভারকে সেদিকে যেতে বলে আবার রানার দিকে তাকাল সে। 'খুলে বলো দেখি, আসলে কি ঘটছে।'

'মনে আছে, গাড়ির এই চাবি দুটো তোমাকে দেখতে দিয়েছিলাম?' পকেট থেকে বের করে রিঙ সহ চাবি দুটো তাবাসসুমকে দেখাল রানা 'তোমাদের বিল্ডিঙের দোতলায় সবুজ ইউনিফর্ম পরা এক লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে আমার, লোকটার হাতে বালতি ছিল–সম্ভবত জ্যানিটার। চাবিটা তার কোমর থেকে পড়ে যায়। লোকটা এক মুহূর্ত ইতস্তত করে চাবিটা না নিয়েই প্রায় ছুটে পালিয়ে যায়। যে অফিস স্যুইট থেকে সে বেরুল সেখানে ঢুকে আমি দেখলাম তোমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুন হয়েছেন...'

'হ্যাঁ, এ-সব তুমি আগেও আমাকে বলেছ। তো কি হলো?'

'চাবির গায়ে খোদাই করা বিন্দুগুলোর কোন অর্থ আছে কিনা আমি জানি না,' বলল রানা। 'তবে এই একই রকম চাবি আমি দেখেছি লিবিয়ায়। প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফিকে তোমাদের সরকার একটা গাড়ি প্রেজেন্ট করেছেন, ঘটনাচক্রে সেই গাড়িটা ব্যবহার করার সুযোগ হয় আমার। টেলিভিশনে যেই গাদ্দাফির নাম শুনলাম অমনি কথাটা মনে পড়ে গেল...'

'ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না...'

'প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফিকে প্রেজেন্ট করা ওই গাড়িটা ছিল সিতারা অটোমোবাইলস-এর তৈরি একটা রোড মাস্টার এক্সওয়াইজেড। ওই রোড মাস্টারের চাবিও ঠিক এগুলোর মত–এই আকার, এই আকৃতি, গায়ে এরকম বিন্দুও খোদাই করা।'

তাবাসসুমের একটা হাত গালে উঠে গেল। 'ইয়া আল্লাহ! রানা, সিতারা অটোমোবাইলস রোড মাস্টার গাড়ি কম করেও বিশ হাজার ব'নিয়েছে, কিন্তু সেগুলো সবই রোড মাস্টার এক্সওয়াই। এক্সওয়াইজেড নয়। এরকম একটা গাড়ি আব্বুরও আছে, সেটার চাবি তোমার এই চাবির চেয়ে ছোট, তাতে কোন বিন্দুও খোদাই করা নেই।

তবে... '

'তবে?'

ড্রাইভার একমনে গাড়ি চালাচ্ছে। সুন্দরী একটা মেয়ে আর সুদর্শন একজন পুরুষকে প্যাসেঞ্জার হিসেবে পেয়ে প্রেমালাপ শোনার যে প্রত্যাশা সে করেছিল সেটা পূরণ না হওয়ায় খানিকটা হতাশ ও মনঃক্ষুণ্ন।

'তবে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এক্সওয়াইজেড মডেলের মাত্র একশো গাড়ি তৈরি করে সিতারা অটোমোবাইলস, বলা হয় এগুলো বিক্রির জন্যে নয়–কোম্পানির মালিক তাঁর ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু ও কয়েকজন প্রিয় আত্মীয়কে প্রেজেন্ট করবেন। বিজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছিল, একশোটা গাড়ির মধ্যে পঞ্চাশটাই উপহার দেয়া হবে পাকিস্তান সরকারকে।'

'তারমানে...'

'তারমানে তোমাদের সরকার একটা রোড মাস্টার এক্সওয়াইজেড লিবিয়ার প্রেসিডেন্টকে প্রেজেন্ট করেন...'

'ঠিক আছে, করেছেন।'

'এখন বলো,' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল রানা, 'তুমি কি জানো, একরামুল আলভি কি গাড়ি ব্যবহার করেন?'

'জানি–রোড মাস্টার এক্সওয়াইজেড।' হাত তুলে রানাকে কথা বলতে নিষেধ করল তাবাসসুম। 'তবে এ-ও জানি যে তার অন্তত তিনজন ম্যানেজারও এক্সওয়াইজেড ব্যবহার করে।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কি করে জানলে?'

'গত বছর ইসলামাবাদে দেশী অটোমোবাইলের একটা একজিবিশন হয়েছিল, সেখানে দেখেছিলাম।'

'ওদেরকে তুমি চেনো, মানে পরিচয় আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নাম জানি; ব্যস, এই পর্যন্তই–কেন?'

'আমি দৈহিক বর্ণনা দিচ্ছি, শুনে বলো ওদের কারও সঙ্গে মেলে কিনা। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা, বয়স কমবেশি চল্লিশ, চৌকো কাঠামো...'

'তুমি তো আলভির বর্ণনা দিচ্ছ!'

মাথা নাড়ল রানা। 'তিন নম্বর সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিঙে সবুজ ইউনিফর্ম পরা যে জ্যানিটার লোকটাকে দেখেছিলাম, এটা তার দৈহিক বর্ণনা।'

তাবাসসুমের ঠোঁটে বাঁকা, তিক্ত হাসি। 'মেলে।'

'কার সঙ্গে?'

'তিন ম্যানেজারের সঙ্গেই।'

'তাদের বয়স?'

'প্রত্যেকেরই ত্রিশ-বত্রিশ।'

'ওহ্, গড! মেলে না।' রানা হতাশ, পরমুহূর্তে উত্তর পেতে উন্মুখ, 'পুলিসের খাতায় এদের কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আছে কিনা জানো?'

'ওরা তিনজন–জিয়াউল হাসান, আসিফ কারদার, হাসিব নকভি–এ-দেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও বিখ্যাত সেলস প্রোমোটর। এদের কারও বেতনই এক লাখ রুপিয়ার কম ছিল না। সিঙ্গার, গান্ধারা আর টয়োমেনকা কোম্পানি থেকে বেশি বেতনের লোভ দেখিয়ে এদেরকে ভাগিয়ে এনেছে আলভি। আমি বলতে চাইছি, এ-ধরনের লোকদের ক্রাইম রেকর্ড থাকে না।'

হাইওয়ের নাম খাইয়াবান-ই-মারগালা, সুদৃশ্য ফয়সল মসজিদকে ছাড়িয়ে আসার পর বাঁয়ে বাঁক নিল ওদের ট্যাক্সি। একটা প্রাইভেট রোডে ঢুকল ওরা, শেষ মাথায় সিতারা অটোমোবাইলস লিমিটেড-এর অত্যাধুনিক বিল্ডিং কমপ্লেক্স। মূল অফিস ভবন একুশতলা; পুরোটাই কাঁচ নয়, খয়েরি আয়না দিয়ে মোড়া। ভবনের পিছনে তিনশো বিঘা জমির ওপর ফ্যাক্টরি, সেটারও বহুতল কাঠামো, মূল ভবনের সঙ্গে ব্রিজ-এর মাধ্যমে সংযুক্ত।

বিশাল ওয়েটিংরুমে পাঁচ মিনিট বসতে হলো ওদেরকে। একরামুল আলভির একজন সেক্রেটারি জানতে চাইল, আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে কিনা। উত্তরে তাবাসসুম বলল, 'তা নেই, তবে মিস্টার আলভিকে আমার নাম দীনা তাবাসসুম বললেই হবে–উনি আমাদেরকে ডেকে পাঠাবেন।'

আরও মিনিট পাঁচেক পর সেক্রেটারি ফিরে এসে ওদেরকে পথ

দেখিয়ে এলিভেটরে চড়িয়ে বারোতলায় নিয়ে এলো।

একরামুল আলভির অফিস কামরার সব কিছু গাঢ় মেরুন রঙের। দেয়াল, কার্পেট, ফার্নিচার, এমনকি কোম্পানি মালিকের দামী সুটটাও তাই। রানার মনে হলো, অতীতে কোথাও প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে; সেই রক্তই শুকিয়ে মেরুন রঙ ধারণ করেছে এখানে। বরাবরের মত উচ্ছল, প্রাণচঞ্চল ও হাস্যমুখর একটা চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গেল আলভিকে, অন্তত তাবাসসুমের তাই মনে হলো। তবে রানাকে সে গ্রাহ্যই করছে না, সমস্ত মনোযোগ তাবাসসুমের দিকে। 'আল্লাহ্ মেহেরবান! আল্লাহ মেহেরবান! কিয়া জানে আজ সুরাজ কিধার সে নিকলা। দীনা তাবাসসুম, হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ!' ডেস্ক ঘুরে এসে এক সেট সোফার দিকে এগোল সে।

'আপনি যোগাযোগ রাখতে বলেছিলেন,' বলে আলভির বাড়ানো হাতটা ধরল তাবাসসুম, ধরার পর ছাড়ছে না। 'সেটা একটা কারণ, আরেকটা কারণ আমার এই নতুন বন্ধু মাসুদ রানা একজন ইমপোর্টার, ইনি আপনাদের প্ল্যান্টটা ঘুরেফিরে দেখতে খুব আগ্রহী।'

এক পলকে ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠল একরামুল আলভির চোখ জোড়া, যেন নেশা হয়েছে তার। এমনিতে অত্যন্ত সুন্দর, অভিজাত ও আকর্ষণীয় চেহারা তার; শুধু চোখে যখন এই দৃষ্টি ফোটে, সব একেবারে বদলে যায়। গা শিরশির করে উঠল রানার, ভয় লাগল লোকটার ভেতর দানবীয় বা অলক্ষুণে কি যেন একটা লুকিয়ে আছে অনুভব করে। 'এ তো অতি সুখবর!' তার হাসি দেখে মনে হলো প্রতিশোধ নিতে পেরে বা শায়েস্তা করতে পেরে তৃপ্তি বোধ করছে। 'ওদিকে আপনি মেশিন-পত্র দেখে সময় নষ্ট করুন, এদিকে আমি তাবাসসুমের সঙ্গে কথা বলে বেঁচে থাকার মজা লুটি।'

বসার পর তাবাসসুম তার দিকে একটু অনুরাগ ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আলভির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে রানা। এখন তাবাসসুমকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে লোকটা, যেন বুঝতে চাইছে মেয়েটা বন্ধু না শত্রু।

ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিয়ে সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিল আলভি, খায়ের খুররমকে যেন চেম্বারে পাঠিয়ে দেয়া হয়, মিস্টার

রানাকে প্ল্যান্টটা ঘুরিয়ে দেখাবে সে। 'ওই সময়টা তাবাসসুম আপনি আমার সঙ্গে লাউঞ্জে বসে চা খাবেন, ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'ওহ্, থ্যাঙ্ক ইউ।' হাসল তাবাসসুম।

খায়ের খুররমের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, রানা আলভিকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কোম্পানির রোড মাস্টার এক্সওয়াইজেড তো শুনেছি বিক্রির জন্যে নয়।'

'না, আপনি ঠিকই শুনেছেন, বিক্রির জন্যে নয়।' হাসি হাসি মুখ, আলভি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

'এক্সওয়াইজেডের চাবিতে কিছু বিন্দু খোদাই করা আছে,' বলল রানা। 'ওগুলো কেন, মিস্টার আলভি?'

'কেন মানে?' একরামুল আলভি কৌতুক বোধ করছে।

'আমি জানতে চাইছি ওই বিন্দুগুলোর কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে কিনা।'

'বিলিভ মি! গড! সত্যি বলছি, এ প্রশ্নটা কখনোই আমার মনে জাগেনি। সত্যিই তো, চাবিগুলোয় বিন্দু যখন আছে, ওগুলোর কোন অর্থও থাকা দরকার। মাফ করবেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। ডিজাইনারকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। না, তাও পারেন না।' মুখ শুকাল, চোখ ম্লান হলো, শোক প্রকাশের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'কারণ লোকটা মারা গেছে।'

মুঠোতেই ছিল, ঝনাৎ করে রিঙসহ চাবি দুটো নিচু টেবিলটার ওপর আলভির সামনে ফেলল রানা। 'দেখুন তো ভাল করে।'

রানা হতাশ, কারণ আলভি এক বিন্দুও চমকায়নি। মুখে আবার সহজ স্বাভাবিক হাসিটা ফিরে এলো। 'কি দেখব, মিস্টার রানা?'

'বিন্দুগুলো নতুন দৃষ্টিতে দেখুন, কোন তাৎপর্য ধরা পড়লেও পড়তে পারে,' বলল রানা। 'তারপর দেখুন চিনতে পারেন কিনা কার গাড়ির চাবি এগুলো।'

চাবি দুটো আলভি ছুঁলোই না। হেসে ফেলে বলল, 'ও আর নতুন করে কি দেখব, ওই একই চাবি তো আমার কাছেও একজোড়া রয়েছে।' শ্রাগ করল সে। 'কার গাড়ির চাবি···এ তো আপনারই জানার কথা, চাবিটা যখন আপনার কাছে রয়েছে।'

'এটা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি...'

পার্স খুলে ছোট্ট একটা আয়না বের করে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছিল তাবাসসুম, হঠাৎ কার্পেটের ওপর পড়ে গেল সেটা। রানা দাঁড়াল, যেন আয়নাটা তোলার জন্যে এগোচ্ছে, তবে ওর আগেই সোফা থেকে ঝুঁকে আয়নাটা তুলে তাবাসসুমের দিকে বাড়িয়ে ধরল আলভি। ঠিক সেই মুহূর্তে তাবাসসুমের দেয়া হাতঘড়ির খুদে একটা বোতামে চাপ দিল রানা। ঘড়িটা শুধু নিখুঁত সময়ই দেয় না, চমৎকার ফটোও তোলে।

চাবি ও গাড়ির প্রসঙ্গ ইচ্ছে করেই রানা আর তুলল না; এ-সবের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো একরামুল আলভির বয়স। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এই লোকের বয়স কোনক্রমেই আঠারো ছিল না, আরও অনেক কম ছিল—এবং উপ-মহাদেশের কোন সেনাবাহিনীতেই আঠারো বছর বয়স না হলে কাউকে ভর্তি করা হয় না। প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে থাকলে মুখে সূক্ষ্ম কিছু রেখা বা দাগ থাকত, তা নেই; তার বদলে মুখের মাংস ও পেশি উঁচু আর ফোলা। গলার বাম দিকে একটা রেখা আছে, ওখান থেকে আলাদা হয়েছে মুখ আর গায়ের চামড়ার রঙ। দাগটা শার্টের কলার দিয়ে সব সময় ঢাকা থাকলেও, ঝুঁকে বসলে কলারের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। বয়সের তুলনায় ভুরু জোড়া অনেক বেশি ঘন আর চওড়া। চোখ দুটো শীতল, নির্লিপ্ত, ঢুলুঢুলু।

'আপনি খুব অল্প বয়সে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন,' প্রশংসার সুরে বলল রানা। 'সরকারী কার পুল-এর সব গাড়িই তো দেখলাম সিতারার।'

তাবাসসুম বলল, 'তুমি বোধহয় জানো না, মিস্টার আলভি একেবারে স্ট্রীট লেভেল থেকে এখানে পৌঁছেছেন। আমি ওঁর অনেক সাক্ষাৎকারে পড়েছি, বাবা ও মা কলেরায় মারা যাবার সময় বয়স ছিল মাত্র চার। তারপর থেকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দিন কেটেছে। সাত বছর বয়সে এক ছেলেধরা তাকে নিয়ে অমৃতসরে পালিয়ে যায়। সেখানকার এক মোটর গ্যারেজের মালিক তাকে কিনে নেয়। সেখানেই গাড়ির কাজ শেখেন উনি। তারপর সারা ভারত ঘুরেছেন, কাজ শিখেছেন,

অবশেষে নিজের গ্যারেজ দিয়েছেন। এরপর দাঙ্গা শুরু হওয়ায় বেশ ভাল টাকা নিয়ে পাকিস্তানে চলে আসেন...'

তাবাসসুমকে বাধা দিয়ে ইন্টারকমটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে সুইচ অন করল আলভি। 'ইয়েস? গুড। এখুনি তাকে পাঠিয়ে দাও।' চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল। 'অবশেষে খায়ের খুররম আপনাকে নিতে আসছে।'

খায়ের খুররম সরল ও মিশুক প্রকৃতির একজন পালোয়ান, ওজন হবে কম করেও আড়াই মণ। লোকটাকে অস্ত্রাগার বললেও ভুল হবে না। দুটো হোলস্টার পরেছে সে, শোল্ডার ও হিপে। কোমরের বেল্টে ছোরা নয়, বেয়নেট গুঁজে রেখেছে। রানা সন্দেহ করল লোকটার কোটের পকেটে হয়তো বোমা বা গ্রেনেড আছে। গোড়ালির ওপর স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা পিস্তলের অস্তিত্বও টের পাওয়া গেল।

সেলস ডিভিশনে রানার সঙ্গে দু'জন ম্যানেজারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো—জিয়াউল হাসান অত্যন্ত স্মার্ট, সুদর্শন; আসিফ কারদার কালো, তবে লম্বা-চওড়া। তাবাসসুমের কথাই ঠিক, এদের বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি হবে না।

তাবাসসুমকে নিয়ে বিদায় নেয়ার সময় আলভিকে একটু আড়ষ্ট বলে মনে হলো রানার। ঠাণ্ডা ও নির্লিপ্ত চোখ ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল সে, বলার সুরে বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা থাকল না, 'যখন খুশি চলে আসবেন, মিস্টার রানা। আপনাকে পেলে সত্যি খুশি হব।'

রানার দৃষ্টি আরও বেশি শীতল, ততটাই কঠিন, ধারও খুব বেশি। 'অন্তত আবার দেখা হবে, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ধন্যবাদ, মিস্টার আলভি।'

প্রাইভেট রোড ধরে হাইওয়েতে ফেরার সময় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল ওরা। রানা বলল, 'সেলস ম্যানেজারদের কথা শুনে বোঝা গেল ওদের কোম্পানি ফিন্যানশিয়াল সঙ্কটে পড়েছে।'

'নগদ টাকার অভাব ওদের জন্যে কোন সমস্যা নয়, রানা,' বলল তাবাসসুম। 'শুধু সিতারা অটোমোবাইলস নয়, সিতারা গ্রুপ অভ ইন্ডাস্ট্রিজ-এর মালিক হলো আলভির স্ত্রী শাহনাজ শামিম আরা। শাহনাজের বাপ কে জানো? স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান-এর গভর্নর।'

শিস দিল রানা।

'আয়নাটায় আলভির আঙুলের ছাপ উঠেছে বলে মনে হয়। তুমি ফটো তুলতে পেরেছ তো?'

'ওর ছবি তো তুলেছিই, নিচু টেবিলটায় পড়ে থাকা কাগজপত্রের ছবিও তুলেছি—ওগুলোয় আলভির হাতের লেখাও আছে বলে ধারণা করছি,' বলল রানা। 'ওর দু'জন ম্যানেজারের সঙ্গেও কথা হয়েছে। তবে আমার ধারণা ওদের কাউকে নয়, তোমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খুন হবার দিন অফিস স্যুইট থেকে ছদ্মবেশী আলভিকেই আমি বেরিয়ে আসতে দেখেছিলাম।' পকেটে হাত ভরে চাবিটার অস্তিত্ব আরেকবার অনুভব করল রানা। 'আমার সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ায় চাবি দুটো তার কোমর থেকেই পড়ে গিয়েছিল।'

হঠাৎ রানার একটা হাত চেপে ধরল তাবাসসুম। 'রানা! আলভির সঙ্গে লাউঞ্জে বসে চা খাবার সময় হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল।'

'কি কথা?'

'স্মরণ করো যেদিন আমাদের ফরেন মিনিস্টার খুন হলেন। আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটা অফিসে ছিলাম, তোমাকে দেখেই বললাম যে সৈয়দ একরামুল আলভির সঙ্গে দেখা হলো, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে একটা সুপারিশ নিয়ে এসেছিল। মনে পড়ে?'

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'আমারও এখন মনে পড়ছে। তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে সে তোমাকে ফোন করতে বলায় আমি জেলাস ফিল করছি কিনা। খোঁজ নিয়ে দেখা দরকার সত্যি সত্যি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কিনা।'

'তা আসতে পারে,' বলল তাবাসসুম। 'প্রায় সব ক'জন মন্ত্রীর সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দেখা করাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো ঠিক ওই সময় ওই বিল্ডিঙে তার উপস্থিতি।'

'সবুজ ইউনিফর্ম পরা যে জ্যানিটর লোকটার কথা বলছি, সে-ও কিন্তু আলভির মত চৌকো ছিল—দৈহিক গঠন পুরোপুরি মেলে। শুধু চুল আর ভুরু মেলে না।'

'চলো,' হাইওয়েতে পৌঁছে হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামাল তাবাসসুম, 'অফিসে ফিরি। বসের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলা

দরকার। একরামুল আলভি গোটা পাকিস্তানে অত্যন্ত পরিচিত আর প্রভাবশালী একটা নাম। তার বিরুদ্ধে আঙুল তোলার আগে দশবার চিন্তা করতে হবে।'

চোদ্দ

পঞ্চাশ বছরের জন্যে ক্লাসিফাইড ঘোষিত ফাইলটা পড়ে শেষ করতে পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর সময় লাগল সব মিলিয়ে তিন ঘণ্টা। জরুরী সব সরকারী কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়ছিলেন, কিন্তু এক পর্যায়ে পৈশাচিকতার ভয়াবহ বর্ণনা তাঁকে অসুস্থ করে তুলল, বিবমিষার শিকার হলেন তিনি; সমস্ত অ্যাপয়েনমেন্ট এবং প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়ে লাহোর থেকে হেলিকপ্টার যোগে ফিরে এলেন ইসলামাবাদের সরকারী বাসভবনে, তারপর সরাসরি নিজের স্টাডিরুমে ঢোকার আগে সেক্রেটারি, এইড এবং আপনজনদের বলে দিলেন কোন অবস্থাতেই কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে।

ফাইলটা পড়া শেষ হলো দুপুর দুটোয়। প্রধানমন্ত্রী নিজেই দেরাজ হাতড়ে একজোড়া অ্যাসপিরিন বের করে খেলেন, ইন্টারকম অন করে একজন সেক্রেটারিকে বললেন এক কাপ গরম কফি দিতে। কফি পৌঁছানোর আগেই ফাইলটা বন্ধ করে দেরাজে রেখে দিলেন তিনি।

সেক্রেটারি স্টাডিরুমে ঢুকে দেখল ডেস্কে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।। 'ম্যাডাম, আপনার কফি,' লেডি সেক্রেটারি মৃদুকণ্ঠে বলল।

তার ধারণা ভুল, প্রধানমন্ত্রী ঘুমাননি; ট্যাবলেট খাওয়ায় ব্যথা কমলেও, বিশাল এক সমস্যার ভারে তাঁর মাথা নুয়ে পড়েছে। 'ট্রে রেখে চলে যাও,' বললেন তিনি, খানিক পর দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনে

মাথা তুললেন, তাকিয়ে আছেন স্টাডিরুমের সাদা ও ফাঁকা দেয়ালের দিকে।

পদমর্যাদার কারণে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী অন্য এক দেশের এসপিওনাজ এজেন্টকে নিভৃতে সাক্ষাৎ দান করেন না। এক্ষেত্রে দু'জনে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হওয়ায় ব্যাপারটাকে আরও বেশি আপত্তিকর বলার সুযোগ তৈরি হবে, দেশটায় যেহেতু মৌলবাদীদের প্রভাব অত্যধিক। কিন্তু সমস্যা হলো, এরইমধ্যে দেশের তিন-তিনজন মন্ত্রী খুন হয়েছেন, খুনী হুমকি দিয়েছে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে টাকা না দিলে তাঁকে এবং বাংলাদেশী প্রধানমন্ত্রীকেও হত্যা করা হবে। টাকা দেয়া হবে, এ সিদ্ধান্ত আগেই তিনি জানিয়েছেন। সে টাকা ইতিমধ্যে প্লেনে বোধহয় তোলাও শুরু হয়েছে। কিন্তু টাকা দিলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমনটি তো না-ও হতে পারে। কাজেই খুনীকে ধরার চেষ্টা বন্ধ করা যাবে না। আর খুনীকে ধরতে হলে বাংলাদেশী মাস্টার স্পাই মাসুদ রানাকে ডেকে এনে, নিভৃতে বসিয়ে সব কথা যতটা সম্ভব খুলে বলতে হবে–এবং টেকনিক্যাল বা কৌশলগত কারণে এ-কাজ একমাত্র তিনিই করতে পারেন, আর কেউ নয়।

প্রথম কারণ, ক্লাসিফাইড ফাইলটা একমাত্র তিনিই দেখেছেন। ওই ফাইল যেহেতু আর কারও দেখার অধিকার নেই, ফাইলের তথ্যও নিশ্চয়ই কারও জানার অধিকার নেই; কাজেই রানাকে যখন প্রধানমন্ত্রী ফাইলের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে একটা ধারণা দেবেন তখন সেখানে তৃতীয় কেউ উপস্থিত থাকতে পারবে না, থাকলে সে তো তথ্যগুলো জানবেই, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য বিদেশী স্পাইয়ের কাছে ফাঁস করেছেন বলে পরে সাক্ষ্যও দিতে পারবে।

কিভাবে কি করতে হবে সিদ্ধান্ত নিতে আরও বিশ মিনিট সময় নিলেন তিনি।

দশ মিনিট পর দেশের সেনাপ্রধান মাত্র সাত মিনিটের জন্যে প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে পৌঁছালেন। ফেরার সময় ক্লাসিফাইড ফাইলটা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তিনি।

সেনাপ্রধান বিদায় নিয়ে চলে যেতেই একজন এইড প্রধানমন্ত্রীকে

জানাল, 'মিস্টার মাসুদ রানার খোঁজ পাওয়া গেছে। সরকারী গাড়ি পাঠানো হয়েছে, পিএনএসএ হেড অফিস থেকে এখানে পৌঁছাতে খুব বেশি হলে মিনিট পনেরো লাগবে তাঁর।'

'ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনতলার রোজ গার্ডেনের সামনের লাউঞ্জে বসে কথা বলব আমি,' বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'লক্ষ রাখতে হবে আমাদের ধারেকাছে কেউ যাতে না আসে।'

রানাকে নিয়ে সিতারা অটোমোবাইলস থেকে নিজেদের হেড অফিসে ফিরে তাবাসসুম তার বস্ ব্রিগেডিয়ার কাজেমিকে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখতে পেল। ভদ্রলোক এইমাত্র ইসলামাবাদ ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারপোর্ট থেকে ফিরেছেন, একটা মিলিটারি কার্গো প্লেনে বারো বিলিয়ন রুপিয়ার সম পরিমাণ ডলার লোড করার কাজ তদারক করতে গিয়েছিলেন। ডলারের বড় অঙ্কের নোটের বান্ডিল ইস্পাতের বাক্সে ভরে প্লেনে তোলা হয়েছে, প্লেনটা পাহারা দিচ্ছে পিএনএসএ-র এজেন্টরা।

সিতারা অটোমোবাইলস-এর হেড অফিসে কি ঘটেছে তার বর্ণনা দিল তাবাসসুম, বসের কাছে জমা দিল ছোট্ট আয়না আর খুদে ক্যামেরা ফিট করা হাতঘড়ি। সময় নষ্ট না করে তখুনি ওগুলো পিএনএসএ-র সায়ান্টিফিক ডিভিশনে পাঠিয়ে দিলেন ব্রিগেডিয়ার। অপেক্ষার সময়টা লাঞ্চ খাওয়ায় ব্যয় করল ওরা।

মাত্র এক ঘণ্টা পর ফিঙ্গারপ্রিন্টের রেজাল্ট এসে পৌঁছাল। একজন ক্লার্ক ভাঁজ করা একটা ফোল্ডার দিয়ে গেল। সেটা খুলে পড়ার সময় ব্রিগেডিয়ার কাজেমির ভুরু জোড়া কুঁচকে জোড়া লেগে গেল। 'এখানে দেখা যাচ্ছে, মিস্টার রানা,' অবশেষে মুখ তুলে বললেন তিনি, 'আপনি আর তাবাসসুম একজন মরা মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এনেছেন।' বিস্মিত রানার হাতে ফোল্ডারটা ধরিয়ে দিলেন তিনি।

রানা প্রথম পাতাটায় চোখ বুলাল। কুখ্যাত ক্রিমিন্যাল ইলিয়াস মোস্তাফার পুলিস রেকর্ড। 'কোন সন্দেহ নেই?' জিজ্ঞেস করল ও।

ব্রিগেডিয়ার গম্ভীর, এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন। 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিখুঁতভাবে মিলে গেছে।'

'তাহলে সন্ত্রাসবিরোধী সেনা অভিযানের সময় ইলিয়াস মোস্তাফার মৃত্যু ছিল সাজানো একটা নাটক। কন্ট্রোলরুমে সে নিজেই ফোন করে জানায় যে একটা পেট্রল স্টেশনে কুখ্যাত ক্রিমিন্যাল ইলিয়াস মোস্তাফা লুকিয়ে আছে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা পৌঁছাবার পর পেট্রল পাম্পে আগুন ধরিয়ে দেয় সে। একটা লাশ যোগাড় করে রেখেছিল, আগুন চারদিকে ভাল করে ছড়াবার আগেই সেটা রেখে নিজে চুপিসারে পালিয়ে যায়। চেহারা? সেটা সে নিশ্চয়ই প্লাস্টিক সার্জারি করে বদলে নিয়েছে। রানার তোলা ফটোটা ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে। মানুষ খুন করে টাকা তো কম কামায়নি, অটোমোবাইল-এর ব্যবসায় নেমে পড়ে। তারপর থেকে এতগুলো বছর কোন ক্রাইমের সঙ্গে নিজেকে জড়ায়নি সে। কিন্তু হঠাৎ আবার কেন···?'

'সেটা জানা যাবে তাকে ধরে এনে ইন্টারোগেট করলে,' বললেন ব্রিগেডিয়ার, হাত বাড়ালেন টেলিফোনের দিকে। 'আমি এখুনি একদল এজেন্টকে সিতারা অটোমোবাইলে পাঠাচ্ছি···'

'কিন্তু,' সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল রানা, 'তার কি কোন প্রয়োজন আছে? আমি আর তাবাসসুমই তো তাকে ধরে আনতে পারি।'

তাবাসসুমও রানাকে সমর্থন করল। 'অ্যাসাইনমেন্টটা যেহেতু আমাদের, অন্যদের চেয়ে আমরাই ভাল বুঝব একরামুল আলভিকে কিভাবে ধরতে হবে···'

হাত তুলে ওদেরকে থামিয়ে দিলেন ব্রিগেডিয়ার। 'আলভিকে অ্যারেস্ট করতে হলে আর কারও না হোক, অন্তত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুমতি লাগবে। তাঁর অনুমতি পাওয়া গেলে তোমরাই তাকে ধরে আনতে যাবে। এখন আমি ওদেরকে পাঠাচ্ছি নজর রাখতে, আলভি যাতে পালিয়ে যেতে না পারে।' প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে ক্রেডলে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি।

দু'জনেই শান্ত হলো ওরা। তাবাসসুম জিজ্ঞেস করল, 'টাকা? ওগুলোর কি হবে?'

'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আজ সকালে আমার কথা হয়েছে,' বললেন পিএনএসএ চীফ। 'জানিয়েছেন, তিনি আমাদের কাজে সন্তুষ্ট নন। মাথুর চৌহানের কথা ভোলেননি। তাঁর নির্দেশে আজ সকাল থেকেই

পার্লামেন্ট ভবনের ছাদে সাদা পতাকা তোলা হয়েছে।'

'কিন্তু এখন তো পরিস্থিতি বদলে গেছে!' প্রতিবাদ করল তাবাসসুম।

ব্রিগেডিয়ার শান্ত গলায় বললেন, 'আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই মুহূর্তে প্রবল আতংক সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন ডেকে দাবি করা হয়েছে একের পর এক এই হত্যাকাণ্ড যে-কোন মূল্যে বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া; যদি প্রমাণ হয় যে একরামুল আলভিই খুনী তাহলে সুইটজারল্যান্ডেও টাকাটা আটকে দেয়া যাবে।'

ঠিক এই সময় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে ফোনটা এলো। তাঁর একজন এইড জানাল, মিস্টার মাসুদ রানাকে চা খেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি···

তিনতলার ছাদটা প্রায় এক একর জায়গা দখল করে রেখেছে, তারই একপাশে বিশাল গোলাপ বাগান; বহুবর্ণের বাহারি ফুলের মাঝখানে সিল্ক-এর সালোয়ার-কামিজ, দোপাট্টা, স্যান্ডেল, ঝুমকো ও মোতিহার–সবই সাদা–পরে একা একা পায়চারি করছেন পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার। বিষণ্ন ও ম্লান দেখাচ্ছে তাঁকে, একটু যেন নার্ভাসও। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে দূরে তাকালেন তিনি। তাঁর এই সরকারী বাসভবন থেকে এক ও দু'নম্বর সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং খুব বেশি দূরে নয়, কাছেই বলতে হবে পার্লামেন্ট ভবনও, তবে ডজন ডজন বহুতল ভবন আকাশ দখল করে ফেলায় ওগুলোর কোনটাই এখান থেকে দেখা যায় না।

একজন সেক্রেটারি এসে খবর দিল, মিস্টার মাসুদ রানা পৌঁছেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'এখানেই পাঠিয়ে দাও তাঁকে। আর শোনো, লাউঞ্জে আমাদেরকে চা দিয়ো।'

'ইয়েস, ম্যাডাম!' মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল স্মার্ট মেয়েটি।

একটু পরই একজন এইড সঙ্গে করে নিয়ে এলো রানাকে। 'মিস্টার মাসুদ রানা, প্রাইম মিনিস্টার···'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে স্মিত হেসে প্রধানমন্ত্রী বললেন,

'ঠিক আছে, আমরা নিজেরাই পরিচিত হব, প্লীজ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পিছু হটল এইড, তারপর সালাম দিয়ে ঘুরে চলে গেল।

রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চট করে একবার দেখে নিলেন প্রধানমন্ত্রী। সাবলীল ভঙ্গিতে ডান হাতটা বাড়ালেন। সেটা ধরার সময় রানা লক্ষ করল, ভদ্রমহিলার নখগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় এক ইঞ্চি করে বড়, এবং তাতেও প্রায় সাদা নেইল পলিশ লাগিয়েছেন। 'আমি আপনার নাম শুনেছি, কাজ সম্পর্কেও খোঁজ নিয়ে জেনেছি,' বললেন তিনি, রানার হাত দু'বার মাত্র ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিলেন বা ছাড়িয়ে নিলেন। 'আর আশা করা যায় আমার সম্পর্কেও আপনি জানেন। তো আমরা কেউ কারও সময় নষ্ট না করে হাতের তিক্ত কাজটা শেষ করে ফেললেই তো পারি, কি বলেন?'

'অন্তত আমার কোন আপত্তি নেই, মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার,' বলল রানা—হাসছে না, আবার গম্ভীরও নয়।

'আমরা মূল আলাপটা করব লাউঞ্জে বসে,' বললেন প্রাইম মিনিস্টার। 'তবে তার আগে আমি দু'একটা কথা বলে নিতে চাই।'

এবার একটু হাসল রানা। 'আপনি আমার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা না করলেও পারেন।'

'আপনাকে আমি যতটুকু বলব, ধরে নেবেন তার বেশি কিছু বলার নেই আমার,' বললেন প্রাইম মিনিস্টার।

'এর মানে আমি কোন প্রশ্ন করতে পারব না।' রানা গম্ভীর হলো।

'না-না, প্রশ্ন করতে পারবেন না কেন!' তাড়াতাড়ি বললেন প্রাইম মিনিস্টার। 'তবে যদি দেখেন যে আমি চুপ করে আছি তাহলে ধরে নেবেন আমি অসহায়।'

'আই সী।'

'আরেকটা কথা।' প্রাইম মিনিস্টারও ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছেন, চেহারায় আশ্চর্য কঠিন একটা ভাব ফুটছে। 'অতীতের যে ঘটনা আপনাকে আমি বলব, শুনতে আপনার ভাল লাগবে না। তবু আমি আশা করব আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ হবেন।'

রানা ভাবল, সার্চ করে আমার অস্ত্রগুলো রেখে দেয়ার পিছনে

এটাও তাহলে একটা কারণ? কথা না বলে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ও।

'চলুন তাহলে, লাউঞ্জে গিয়ে বসা যাক।'

লাউঞ্জটা বাগানের পাশেই, কয়েকটা ধাপ টপকে উঠতে হলো। বসার আয়োজনটা পরিকল্পিত বলে মনে হলো রানার। সিঙ্গেল দুটো সোফা খুব কাছাকাছি ফেলা হয়েছে, একটার উল্টোদিকে আরেকটা, মাঝখানে ছোট্ট ও নিচু একটা টেবিল রাখার পর আর কোন জায়গা অবশিষ্ট নেই। টেবিলে একটা ট্রে দেখা যাচ্ছে, তাতে কিছু ক্র্যাকার ও চা-এর সরঞ্জাম। আশপাশে কোন এইড বা সেক্রেটারিকে দেখা গেল না। 'ক'চামচ চিনি?' প্রাইম মিনিস্টার নিজেই চা পরিবেশন করছেন।

'এক, প্লীজ।'

এক মিনিট পর, দু'জনেরই চায়ের কাপে একবার করে চুমুক দেয়া হয়েছে, পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার সরাসরি রানার চোখে চোখ রেখে শুরু করলেন। তাঁর দীর্ঘ, আগোছাল বক্তব্য সংক্ষেপে সাজালে এরকম দাঁড়ায়:

উনিশশো সত্তর সালে 'স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো' নামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঞ্জাব রেজিমেন্ট 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন' তৈরি করেছিল একদল। ঘটনাচক্রে বা ভুলক্রমে নয়, দুশো কিলিং মেশিন তৈরি করা হয় একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে। 'কে কে হিন্দু খুন করার মেশিন হতে চাও?' এই শিরোনামে স্বেচ্ছাসেবক চেয়ে প্রচার-পত্র বিলি করা হয়েছিল। সাতশো আবেদনপত্র জমা পড়ে। পরীক্ষা, যাচাই-বাছাইয়ের পর দুশোজনকে ট্রেনিং দেয়ার জন্যে নির্বাচিত করা হয়। এদেরকে ট্রেনিং দেয় দশজন মেজর, একজন কর্নেল, ও একজন ব্রিগেডিয়ার; সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন একজন মেজর জেনারেল। ট্রেইনারদের মধ্যে সাইকিয়াট্রিস্ট ও মনোবিজ্ঞানীরাও ছিল, তারা রিক্রুটদের মগজ ধোলাই করে। শেখানো হয় হিন্দু মানে কাফের, কাফেরকে হত্যা করা পুণ্যের কাজ; বাঙালী মানে বেশিরভাগই হিন্দু; শেখ মুজিবর রহমান ঘৃণ্য একজন মানুষ, পূর্ব-পাকিস্তানকে ভারতের একটা রাজ্য বানাতে চায়; যে-বাড়িতে তার ছবি, রেকর্ড করা ভাষণ ইত্যাদি পাওয়া যাবে সেই বাড়ির লোকজনকে পাকিস্তানের দুশমন মনে করতে হবে। আরেকদল ট্রেইনার তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র চালানো

শেখায়–রাইফেল, পিস্তল, গ্যারট, ছুরি ইত্যাদি। ট্রেইনাররা পরস্পরকে চিনত না; তারা কে কাদেরকে কি ট্রেনিং দিচ্ছে, এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছিল। কর্নেল শাহিন শিকদারের ওপর দায়িত্ব ছিল ওদের শেখা বাংলা ভাষার ওপর এবং প্র্যাকটিস করা আন-আর্মড কমব্যাট-এর ওপর পরীক্ষা নিয়ে সার্টিফিকেট দেয়া। সে-সময়কার মেজর (পরে মেজর জেনারেল, বর্তমানে পিণ্ডি সেন্ট্রাল জেলের জেইলার) ইলিয়াস মোস্তাফার ওপর দায়িত্ব ছিল ছুরি চালানো শেখানো।

একজন মানুষকে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বা কিলিং মেশিনে পরিণত করা সহজ কথা নয়। মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ ঈশ্বর বা প্রকৃতির দান, স্বাভাবিক সহজাত প্রবৃত্তিই হলো একজন আরেকজনকে ভালবাসবে, অন্তত তার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে; তার ভেতর এর উল্টো ভাব ও প্রবণতা আনতে হলে মানুষটাকে বিশেষ কিছু কৌশলে অমানুষ বানাতে হবে। ঠিক তাই করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলখানা থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের গোপনে নিয়ে আসা হয় লাহোর ক্যান্টনমেন্টের আলাদা ট্রেনিং এরিয়ায়। 'এরা হিন্দু, এরা বাঙালী, এরা শেখ মুজিবের অনুসারী–কাজেই এদেরকে হত্যা করো!' এই নির্দেশ দিয়ে নিরস্ত্র লোকগুলোকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়া হয়। কমান্ডোদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় কে কার আগে কত বেশি 'হিন্দু, বাঙালী আর শেখ মুজিবের অনুসারীকে' খুন করতে পারে তার প্রতিযোগিতা, কারণ যে যত বেশি লোককে মারতে পারবে সে তত বেশি পুরস্কার পাবে।

বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে লাশ সংগ্রহ করে আনা হয়। ট্রেনিং এরিয়ার মধ্যে একটা বাড়িতে লাশগুলোকে যত্ন করে সাজানো ও শোয়ানো হয়। যেন তারা জীবিত মানুষ, তবে ঘুমাচ্ছে। তারপর সেখানে ক্র্যাক কমান্ডোদের পাঠানো হয় এই নির্দেশ দিয়ে–'যাও, ওই বাড়িটায় হিন্দু আর বাঙালীরা ঘুমাচ্ছে, প্রত্যেককে জবাই করে এসো।' মরা মানুষকে জবাই করলেও অন্ধকারে কমান্ডোরা সেটা টের পেত না।

ট্রেনিং শেষ হবার পর দেখা গেল কমান্ডোরা সত্যিকার অর্থে একজন করে অমানুষে পরিণত হয়েছে। একাত্তর সালের জানুয়ারী

মাসে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়। দুশো কমান্ডোর প্রত্যেককে জানানো হয়, তোমাদের কারও বাবা, কারও ভাই, কারও বন্ধু, কারও চাচা বা মামা, কিংবা কারও প্রিয় প্রতিবেশী হিন্দু ও বাঙালীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, শেখ মুজিবের ছয় দফা দাবি সমর্থন করে, কাজেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এদেরকে তোমরা খুন করে এসো।'

এই পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত সত্যি নেয়া হয়েছিল কিনা, নিলেও ডামি অথবা আসল মানুষের বদলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা, রানার জানার সুযোগ হলো না। ওকে শুধু বলা হলো, 'নির্মম ও অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে এই পরীক্ষায় দুশোজনই পাস করে ওরা। একশোয় একশো পেয়ে প্রথম হয় একজন, তার নাম লেফটেন্যান্ট ইলিয়াস মোস্তাফা।' রানার প্রশ্নের উত্তরে বলা হলো, ইলিয়াস মোস্তাফার পরিবার বা বংশ সম্পর্কে ফাইলে কিছু লেখা নেই, এমনকি কোথায় তার জন্ম তাও উল্লেখ করা হয়নি, শুধু জন্ম তারিখ দেয়া আছে–২ নভেম্বর ১৯৫০ ইং।

এরপর এলো একাত্তর সালের মার্চ মাস। পঁচিশ তারিখ। সেই রাতেই দুশো স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডোকে ঢাকায় নামানো হয়। পরে বিশজনের দশটা গ্রুপ তৈরি করে তাদেরকে ছড়িয়ে দেয়া হয় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহরে। প্রতিটি গ্রুপের একই মিশন ছিল, সেই মিশনের সাংকেতিক নাম ছিল–কেএইচকেএল। এর অর্থ হলো–কিল হিন্দু কিল লীগ। এখানে লীগ বলতে বোঝানো হয়েছিল আওয়ামী লীগ, অর্থাৎ আওয়ামী লীগারকে খুন করো।

একশো একটা প্রশ্ন করল রানা।

বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় গিয়েছিল এই অমানুষেরা? কোথায় কতদিন করে ছিল? এই অমানুষদের হাতে মানুষ যারা মারা পড়ল তাদের সংখ্যা কত, কি তাদের পরিচয় বা ঠিকানা?

একটা প্রশ্নেরও জবাব নেই।

পাক প্রাইম মিনিস্টারের বাকি বক্তব্য এরকম:

এই অমানুষ বা ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করে পাকিস্তান নিজেই মারাত্মক বিপদে পড়ে যায়। একাত্তর সালের মাঝামাঝি সময় থেকেই সেই বিপদ মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। দেখা যাচ্ছে আজও সেই বিপদ

থেকে পাকিস্তান রেহাই পায়নি।

একাত্তর সালের মাঝামাঝি সময়ে এই অমানুষগুলো ঠিক কি ধরনের বিপদ হয়ে দেখা দেয় তা পরিষ্কার জানা গেল না, শুধু কিছুটা আভাস পাওয়া গেল। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহর ও রণাঙ্গন থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে খবর আসতে লাগল পাকিস্তানী সৈন্যদের ক্যাম্পে একের পর এক গুপ্তহত্যার ঘটনা ঘটছে, অথচ একটারও কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি নেই, সেখানে একজন সৈনিকের গলা কাটা লাশ আবিষ্কৃত হলো; তাঁবুর ভেতর সকালে সবার ঘুম ভাঙার পর দেখা গেল হাতলটুকু বাদে পুরো একটা ছুরি ঢুকে আছে একজনের হৃৎপিণ্ডে; যে-সব বাঙালী মেয়েদের দীর্ঘদিন আটকে রাখার জন্যে ক্যাম্পে ধরে আনা হত, কে বা কারা যেন তাদের গলায় গ্যারট পরিয়ে মেরে ফেলছে।

গোপন তদন্তে জানা গেল যে-সব পাকিস্তানী সৈন্য খুন হয়েছে অবসর সময়ে সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ করার সময় তারা বাঙালীদের প্রতি বা শেখ মুজিবের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি প্রকাশ করেছিল, এবং এ-ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেখানে উপস্থিতি ছিল স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডোর কোন না কোন সদস্য। সেপ্টেম্বর মাসে এক পাকিস্তানী কর্নেলের প্রিয়তমা স্ত্রী, এক লেফটেন্যান্ট কর্নেলের কুমারী বোন, এক মেজরের সুন্দরী স্ত্রী খুন হয়ে গেল। তদন্তে প্রকাশ পেল, এই অন্যায় যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে প্রায়ই প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠত তারা।

এ-ধরনের ঘটনার সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় অক্টোবর-নভেম্বর মাসে একশো পনেরোজন অমানুষকে দেশে ফিরিয়ে এনে জেলখানায় আটকে রাখা হয়। এদের বিচার হয় বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বিশেষ গোপন সামরিক ট্রাইবুনালে। বিচারে এদের ত্রিশজনকে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠানো হয়। বাকিদের দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদী জেল হয়।

পাক সেনাবাহিনীর ক্লাসিফাইড ফাইলে আর কিছু নেই, বা থাকলেও রানাকে জানানো হলো না। তবে ঘটনা এখানেই শেষ নয়, বরং বলা যায় আসল কাহিনী এরপর থেকেই শুরু হলো। প্রাইম মিনিস্টার এ-সব তথ্য মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স থেকে জেনেছেন।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এই পঁচাশিজন কমান্ডোই নিজ শহরে বা এলাকায় মূর্তিমান আজরাইল হয়ে ওঠে, যাদের একমাত্র কাজ ছিল অকারণে বা নগণ্য কারণে মানুষের প্রাণসংহার। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও যেমন ধান ভানে, এই কিলিং মেশিনগুলো বেসামরিক জীবনে ফিরে এসেও তেমনি তাদের অভ্যাস ত্যাগ করতে পারল না। বলতে গেলে তখন থেকেই পাকিস্তানের গোটা সমাজ কাঠামোর প্রতিটি স্তরে খুন-খারাবির সূচনা ঘটে এদের হাতে। রাজনীতিকরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুন করাল। স্বামী খুন করাল স্বৈরিণী স্ত্রীকে। এভাবেই শুরু হলো ভাড়াটে খুনীকে দিয়ে শত্রু নিধনের দেশ জোড়া মহোৎসব। এক পর্যায়ে অতিষ্ঠ হয়ে এই ভাড়াটে খুনী অর্থাৎ কিলিং মেশিনগুলোকে অকেজো করার দায়িত্ব দিয়ে সেনা অভিযান শুরু করা হয়। একটা অভিযানে কাজ হয়নি; প্রায় প্রতিটি সরকারের আমলে সেনা অভিযান চলে। এক এক করে ধ্বংস করা হয় নিজেদেরই তৈরি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। একটা সময় আসে, সংশ্লিষ্ট সবাই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে ভীতিকর অভিশাপ থেকে অবশেষে মুক্তি পাওয়া গেছে।

কিন্তু এতগুলো বছর পর দেখা যাচ্ছে, না–বিপদটা এখনও কাটেনি। এখনও এক বা একাধিক কিলিং মেশিন রয়ে গেছে। কে সে? এতদিন কোথায় ছিল? হঠাৎ কেন আবার শুরু করল?

প্রাইম মিনিস্টার রানাকে জানালেন–ও পিএনএসএ অফিস থেকে রওনা হবার পর ব্রিগেডিয়ার কাজেমি তাঁকে ফোন করেছিলেন। বিখ্যাত শিল্পপতি একরামুল আলভির আঙুলের ছাপ স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডোর সদস্য লেফটেন্যান্ট ইয়াসিন মোস্তাফার সঙ্গে মিলে গেছে, এই খবরটা তাঁকে চমকে দিয়েছে। পিএনএসএ চীফকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যত রকম চাপই আসুক, সব অগ্রাহ্য করে এই কালপ্রিটকে ধরতে হবে–জীবিত হোক বা মৃত। এতদিন পর আলভি ওরফে মোস্তাফা আবার কেন হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠেছে, এর কারণও তিনি ব্যাখ্যা করলেন। ধোলাই করার পর তার মগজে ও মজ্জায় এখনও বাঙালী, বাংলাদেশী, হিন্দু ও শেখ মুজিব বিদ্বেষ পুরোপুরি রয়ে গেছে, পাকিস্তানের বিভক্তিও সে মেনে নিতে পারেনি। নতুন চেহারা ও পরিচয় নিয়ে ভালই ব্যবসা করছিল সে, কিন্তু যেই শুনল পাওনা টাকা

বাংলাদেশকে ফিরিয়ে দিতে হবে, অমনি আবার সেই পুরানো খুনের নেশাটা পেয়ে বসল তাকে। বাংলাদেশকে টাকা ফিরিয়ে দিতে যারা উদ্যোগ নিচ্ছে, তাদেরকে দিয়ে শুরু করল।

বিদায়ের আগে, কি অপরাধে উল্লেখ করলেন না, রানার কাছে আভাসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার, বললেন, 'আমি জানি আপনার মনে ব্যথা লেগেছে। বিশ্বাস করতে বলি, ওই ব্যথা আমিও অনুভব করছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি সত্যি দুঃখিত ও লজ্জিত।'

দ্বিতীয়বার হ্যান্ডশেইক করার সময়ও রানার মুখে হাসি থাকল না, লালচে ও থমথমে হয়ে আছে চেহারা। 'মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার, এই মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে। তিনি তাঁর সরকারী সফর বাতিল করবেন না বলেই খবর পাচ্ছি...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলা হাসলেন। 'কি বলবেন বুঝতে পারছি। শুধু বাংলাদেশী প্রধানমন্ত্রী কেন, কাইন্ডলি আমার কথাও ভাবুন। আমাদের দু'জনের নিরাপত্তাই নিশ্চিত করতে হবে—শুনেছি আপনি একাই যখন একশো; আপনাকেই। আমি সব ক'জন ইন্টেলিজেন্স চীফকে বলে দিচ্ছি, আপনার যখন যা দরকার সব যেন সঙ্গে সঙ্গে...'

'ধন্যবাদ, মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার।'

পনেরো

সরকারী গাড়িতে চড়ে তাবাসসুমের ফ্ল্যাটে যাচ্ছে রানা। মাথার ভেতর বারবার ফিরে আসছে তারিখটা—২ নভেম্বর ১৯৫০। এই দিন দুনিয়ার

বুকে একটা অমানুষ জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু তারিখটায় কি এমন আছে যে মনে বারবার খোঁচা মারবে? কেন মনে হবে এর বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে?

সরকারী গাড়ি ওকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল।

ওর অপেক্ষায় উত্তেজিত তাবাসসুম নিজের ফ্ল্যাটে পায়চারি করছিল। কলিংবেলের শব্দ আর তার পায়ের শব্দ প্রায় একই সময় শুনতে পাওয়া গেল। দরজা খুলে রানার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়লেও, হাত ধরে টেনে ভেতরে ঢোকাল। দরজা বন্ধ করছে, জানতে চাইল, 'কি বললেন প্রাইম মিনিস্টার?'

'প্লীজ,' নরম সুরেই বলল রানা, 'জানতে চেয়ো না। সব আবার স্মরণ করতে হলে আমার খুব কষ্ট হবে। তারচেয়ে তুমি কোন খবর পেয়ে থাকলে শোনাও।'

'কি আর শোনাব তোমাকে।' কানের ওপর থেকে চুল সরাল তাবাসসুম। 'আলভি পালিয়েছে।'

'হোয়াট!'

'আমরা তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পাঁচ মিনিট পর সে-ও বেরিয়ে গেছে,' বলল তাবাসসুম। 'তার বাড়ি এবং অন্যান্য অফিস ও ফ্যাক্টরিতে খোঁজ নিয়ে দেখা হয়েছে। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তার বাড়ি বা অফিসের লোকজনও কিছু বলতে পারছে না।'

'এটা আমাদেরই একটা ভুল,' বলল রানা। 'সে যে পালাতে পারে, এই চিন্তাটা মাথায় আসা উচিত ছিল। আর সব খবর?'

'তুমি ওর হাতের লেখার যে নমুনা ক্যামেরায় তুলে এনেছ, তা হুবহু মিলে গেছে শেষ চিঠিটার হাতের লেখার সঙ্গে। আর পিএনএসএ ল্যাব থেকে বলা হয়েছে, আলভির গলা থেকে ওপরের অংশের সমস্ত চামড়া শরীরের অন্য কোথাও থেকে তুলে ওখানে লাগানো হয়েছে। এক্সপার্টদের ধারণা, তার মুখ সম্ভবত আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। শুধু যে চামড়া বদলানো হয়েছে, তা নয়। তার ভুরু তার নয়, অন্য লোকের ভুরু কেটে তার কপালে বসানো হয়েছে। নাকটা তারই, তবে মডিফাই করা হয়েছে। তার চোখ আমরা যেমন দেখি আসলে ঠিক সেরকম নয়, কালো রঙের লেন্স পরে সে। লেফটেন্যান্ট ইলিয়াস মোস্তাফার চোখের

রঙ ছিল কটা।'

'অর্থাৎ এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে এই সৈয়দ একরামুল আলভিই আসলে লেফটেন্যান্ট ইলিয়াস মোস্তাফা।'

'না, কোন সন্দেহ নেই।'

'নভেম্বর মাসের দু'তারিখ–উনিশশো...' শুরু করল রানা।

ঝট করে এগিয়ে এসে রানার ঠোঁটে আঙুল চেপে ধরল তাবাসসুম। 'খবরদার!'

'মানে?' রানা বিস্মিত।

'মেয়েদের জন্ম তারিখ উল্লেখ করা যায়। কিন্তু জন্ম সাল বলতে নেই, এমনকি আন্দাজ করেও বলা নিষেধ।'

'আমি তো তোমার জন্ম তারিখ বা জন্ম সাল বলতে চাইনি!'

'তারমানে? নভেম্বরের দু'তারিখে জন্মেছে, এরকম মেয়ে আমি ছাড়া পাকিস্তানে আর কাকে চেনো তুমি, হ্যাঁ?' দু'কোমরে হাত রেখে রীতিমত রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করল তাবাসসুম, তার এই কৃত্রিম সকৌতুক ভঙ্গিটি পাকিস্তানী মেয়েদের একটা প্রচলিত অকৃত্রিম পুরুষালি ঢং বলে শনাক্ত করতে পারল রানা।

'আরে মেয়ে হবে কেন, ওটা ওই অমানুষটার জন্ম তারিখ, লেফটেন্যান্ট ইলিয়াস মোস্তাফার। উনিশশো পঞ্চাশ সালের...'

'ছিহ্, আমিও ওই একই দিনে জন্মেছি!' ঘৃণায় মুখ বাঁকাল তাবাসসুম। পরমুহূর্তে কি হলো, তার চেহারা ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল।

'তাবাসসুম!' সাবধানে, ভয়ে ভয়ে ডাকল রানা। 'কি ব্যাপার?'

উত্তরে এগিয়ে এসে রানাকে একটা চুমো খেলো পাকিস্তান ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি এজেন্সির অপারেটর মেয়েটা। 'ব্যাপার হলো জন্ম তারিখ সূত্রে আমি স্করপিয়ো, মানে বৃশ্চিক রাশির জাতিকা। বাকিটা বলব না, দেখি বাংলাদেশী মাস্টার স্পাই নিজেই বুঝে নিতে পারে কিনা।'

তাবাসসুমের কথা শেষ হবার আগেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে রিঙ সহ সিতারা রোড মাস্টার এক্সওয়াইজেড-এর চাবি দুটো বের করল, চাবির গায়ে খোদাই করা বিন্দুগুলোকে নতুন দৃষ্টিতে দেখছে।

বিন্দুগুলোর মাঝখানে যে ফাঁক আছে সেগুলো কল্পিত রেখা দিয়ে জোড়া লাগালে ছোট্ট অথচ বিষাক্ত একটা প্রাণীর আকৃতি তৈরি হয়। এই একই চাবি লিবিয়ায় দেখার সময় আকৃতিটা রানার চোখে ধরা পড়েনি, এতদিন পর এখন পড়ল। 'বিছা!' বিড়বিড় করল ও। মনে পড়ে গেছে, সাইফুল রব্বানি ওকে বলেছিল–"গোটা শহর বিছায় ভরে গেছে, দেখামাত্র কামড়ে দেবে আমাকে"। রব্বানি সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছিল, বিছার লোকে শহর ভরে গেছে। আর সেই বিছা বলতে খুনী ইলিয়াস মোস্তাফাকেই বোঝাতে চেয়েছিল সে।

ধীরে ধীরে ওকে আলিঙ্গন করল তাবাসসুম। 'শেষ চিঠিটায় খুনী লিখেছেও তাই–"পনেরো দিন পর পর কামড় দিই আমি"।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা, হঠাৎ উত্তেজনায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। 'পনেরো দিন পর পর। তারমানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইসলামাবাদ সফর করে ফিরে যাবার পর আবার আঘাত হানবে সে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তখনও যদি সে টাকা না পায়।'

'তুমি তার এই কথা বিশ্বাস করো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আর মাত্র তিনদিন পর আমাদের প্রধানমন্ত্রী আসছেন। আলভি এই সুযোগ ছাড়বে?'

'না,' ফিসফিস করল তাবাসসুম।

'এসো।' তাবাসসুমের হাত ধরে টান দিল রানা। 'ব্রিগেডিয়ার কাজেমির সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

পার্স থেকে দরজার চাবি বের করছে তাবাসসুম। 'চলো।'

এলাকাটা অভিজাত বলেই একদম ফাঁকা, ট্যাক্সির জন্যে দাঁড়িয়ে থাকাটা বোকামি হবে ভেবে হাঁটতে শুরু করল ওরা। একটা বাঁকের কাছে পৌঁছে গেছে, এই সময় অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটল। প্রকাণ্ড ও ঝকঝকে একটা সাদা রোলস রয়েস হর্ন বাজাল ঠিক ওদের পিছন থেকে। রানা ও তাবাসসুম একযোগে ঘাড় ফেরাতে দেখল, গাড়িটা ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে। জানালার টিনটেড কাঁচ নেমে গেল, ব্যাক সিট থেকে গাড়ির বাইরে বেরুল এক তরুণীর সুন্দর অবয়ব। মেয়েটিকে চেনা চেনা মনে হলো রানার, তবে কোথায় দেখেছে মনে

করতে পারছে না।

মেয়েটা হাসছে। হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল ওদেরকে। 'এই, তোমরা আমার গাড়িতে উঠে আসতে পারো। এদিকে ট্যাক্সি পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।'

রানা পা বাড়াতে যাবে, তাবাসসুম ওর কব্জিটা লোহার মত শক্ত হাতে ধরে ফেলল। 'সাবধান!' ফিসফিস করল সে। 'ওকে তুমি চিনতে পারছ না?'

এতক্ষণে রানার মনে পড়ল। আলভির সঙ্গে একটা রেস্তোরাঁয় মেয়েটাকে দেখেছিল ওরা। ফারজানা ফাহিমা। একজন মন্ত্রীর ভাগ্নী। ড্রাগ ডিলার।

'তাবাসসুম, তুমি যেন আমাকে চিনতেই পারছ না!' রোলস রয়েস থেকে অভিমানী সুরে বলল ফাহিমা। 'নাকি ভয় পাচ্ছ তোমার হ্যান্ডসাম সঙ্গীটিকে আমি কেড়ে নেব?'

'আমার কোন দায় পড়েনি যে তোমাকে আমার চিনতে হবে,' ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিল তাবাসসুম।

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল ফাহিমা। তার জানালার কাঁচ নামতে শুরু করেছে। ওভাবে হেসে ওঠার কারণটা অবশ্য এক সেকেন্ড পরই টের পেল ওরা।

'আমাদেরকে কিন্তু চিনতেই হবে,' রানা ও তাবাসসুমের পিছন থেকে বলল এক লোক। বাঁকের ওদিকে সঙ্গীকে নিয়ে অপেক্ষা করছিল সে। আগে থেকেই প্ল্যান করা ছিল, ফাহিমা ওদের মনোযোগ ধরে রাখবে, সেই সুযোগে নিঃশব্দ পায়ে বাঁক ঘুরে ওদের পিছনে এসে দাঁড়াবে তারা। 'নড়াচড়া না করে সার্চ করতে দাও। এরকম পরিস্থিতিতে সবাইকে আমি একটা কথাই বলি—মৃত্যুকে ডেকে এনো না।'

নিষেধ করা সত্ত্বেও ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। দ্বিতীয় লোকটা একটু পিছিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে অটোমেটিক মেশিন পিস্তল। না, ধরা দেয়াই উচিত। ঝুঁকি নিলে এখানেই খুন হয়ে যাবে।

তাসলিমার পার্স আর রানার শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল দুটো বের করে নিল লোকটা। রোলস রয়েস ওদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে

যাচ্ছে। সেটার জায়গায় আরেকটা প্রাইভেট কার এসে থামল। এটা একটা কালো রঙের মার্সিডিজ।

'কি ঘটছে এখানে? কারা তোমরা?' সবই জানা আছে, তবু না জানার ভান করল রানা। 'আমাদের কাছে কি চাও?'

দ্বিতীয়বার সার্চ করে ওর ছুরিটাও পেয়ে গেল লোকটা। 'আমরা হলাম বিছা, কামড় দিই,' বলে হেসে উঠল লোকটা। 'তবে কামড় খেতে না চাইলে কথা মত কাজ করুন, উঠে পড়ুন গাড়িতে।'

উপায় নেই, এই মুহূর্তে ওদের শিরদাঁড়ায় দুটো মেশিন পিস্তলের মাজল ঠেকে আছে।

গাড়িতে উঠতেই ড্রাইভার রওনা হলো।

'তোমরা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' হিসহিস করে জানতে চাইল তাবাসসুম।

কথা যা বলার প্রথম লোকটাই বলছে। তাবাসসুমের প্রশ্নের উত্তরে সে পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কাজটা কি আপনি ভাল করেছেন, ম্যাডাম?'

'মানে? কি কাজ?'

'উনি কত বড় মানুষ!' শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠল লোকটা। 'সমাজে ওনার কত সুনাম। দেশের, বিদেশের মন্ত্রী-মিনিস্টাররা পর্যন্ত ওনাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। আর আপনি কিনা এত বড় একটা মানুষকে মাসের পর মাস অপমান করে আসছেন! ইস, নিজের এত বড় সর্বনাশ কেউ করে! আপনার কথা ভাবলে আমার তো, বিশ্বাস করুন, ভয়ে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কি হত, একবার যদি তাঁর সঙ্গে রাত কাটাতেন?'

তাবাসসুম বাকশক্তি হারিয়ে বোবা হয়ে গেছে।

'এই যে তাকে অপমান করলেন, এখন তো তাঁর কামড় আপনাকে খেতেই হবে।' হাসছে লোকটা। 'বস্ বলেছেন, তিনি কামড় দেয়ার পর খুদে বিছা আমরাও একটা করে কামড় দিতে পারব। চিন্তা করবেন না, এই সব কামড়ে রসই শুধু থাকবে, সেই রসে বিষ থাকবে না।'

পিছনের সিটে শুধু রানা আর তাবাসসুম। তবে দরজা খুলে লাফ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে, সে সুযোগ রাখা হয়নি। দরজা লক করে চাবিটা পকেটে রেখে দিয়েছে প্রথম লোকটা। সে আর তার সঙ্গী

ড্রাইভারের পাশে রয়েছে, তবে বসেনি; সিটের ওপর হাঁটু গেড়ে ওদের দিকে মুখ করে রয়েছে, হাতে মেশিন পিস্তল।

প্রথম লোকটা মোটাসোটা, রসিয়ে কথা বলে সুখ পায়। সঙ্গীকে একবার জিজ্ঞেস করল, 'ইয়াল্লা, জুনায়েদ, তোর চোখে তো পলকই পড়ছে না! জানিস তো, শুধু চোখ দিয়েও একটা মেয়েকে রেপ করা যায়?'

দ্বিতীয় লোকটাও মোটা, এবং মোষের মত কালো। লোকটা মাথায় সরষের তেল মাখে, জুলফি থেকে একটু গড়াচ্ছে। উত্তরে সে বলল, 'রেপ করলে তুই করবি, জাম্বু। আমি ভাবছি বসকে বলে ওকে আমাদের গ্রামে নিয়ে যাব কিনা। ওখানে আমাদের সর্দার ফতোয়া দেন কোন মেয়ে জিনা করলে তাকে পাথর ছুঁড়ে মারতে হবে…'

এক সময় ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেল ওরা। ইসলামাবাদকে পিছনে ফেলে, মারীকে পাশ কাটিয়ে কাগন-এর দিকে যাচ্ছে ওরা। ফাঁকা হাইওয়েতে ড্রাইভার স্পীড তুলছে কখনও আশি, কখনও নব্বুই।

সন্ধ্যার পর তাবাসসুম রানার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। রানা যে শুধু জেগে আছে তা নয়, ওর মাথার ভেতর চিন্তার জাল বোনা চলছে। আলভির লোকেরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে? খুন করাই তো উদ্দেশ্য, তাই না? তাহলে নির্জন পাহাড়ী রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে কাজটা সেরে ফেললেই তো পারে। তা না করে এতদূরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

গিলগিটে? কেন, গিলগিটে কেন?

ওদেরকে গাড়িতে তোলা হয়েছে বেলা তিনটের দিকে। ইতিমধ্যে পাঁচ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, রাত বাজে সাড়ে ন'টা। এখন জুনায়েদ আর জাম্বু ওদের দিকে মুখ করে হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে নেই। সিটে বসেছে তারা, তবে জুনায়েদ সারাক্ষণ ঘাড় বাঁকা করে ওদের ওপর নজর রাখছে।

ইতিমধ্যে ছোট একটা শহরে একবার থেমেছিল ড্রাইভার পেট্রল নিতে। অনেক চেষ্টা করেও শহরটার নাম জানতে পারেনি রানা। তবে এই রাস্তাটা যে কারাকোরাম হাইওয়ে, তাতে কোন সন্দেহ নেই ওর। তারপর লাইটপোস্টের পাশে একটা মাইলস্টোন দেখার সুযোগ হলো।

গিলগিট থেকে আরও একশো বিশ কিলোমিটার দূরে রয়েছে ওরা। রাত এখন এগারোটা বাহান্ন।

সামনেই পড়ল ছোট্ট একটা পাহাড়ী শহর রামা। গুণ্ডারা কখনও উর্দু, কখনও পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলছে। কিছুটা রানা জানে, বাকিটা ওদের কথা থেকে পরিষ্কার হলো–চীন, আফগানিস্তান ও ভারত সীমান্ত থেকে গিলগিট উপত্যকা খুব বেশি দূরে নয়। রামা-য় একটা লেক আছে, দিনের বেলা সেখান থেকে আট হাজার একশো ছাব্বিশ মিটার উঁচু নাঙ্গা পর্বতমালার পুব পাশটা দেখা যায়।

এমনিতে গভীর রাত, তার ওপর নির্জন পাহাড়ী এলাকা, একটা সরু পাহাড়ী কার্নিস ধরে মার্সিডিজকে এগোতে দেখে নিজের অজান্তেই গা শিরশির করে উঠল রানার। তবে এই ভেবে আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করল যে ওদেরকে শুধু খুন করার ইচ্ছা থাকলে ইসলামাবাদ থেকে কয়েকশো মাইল দূরে আনার দরকার ছিল না। আলভি সম্ভবত রানাকে দিয়ে কোন কাজ করিয়ে নিতে চাইছে। সে কাজটা কি হতে পারে, আন্দাজ করা এমন কিছু কঠিন নয়। এই রামাতেই, কারাকোরাম হাইওয়ে থেকে মাত্র মাইল কয়েক দূরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একটা মঠে লুকিয়ে আছে বেঈমান কয়েকজন আইএসআই ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অফিসার, সঙ্গে আছে ডাকাতি করা দুটো ব্রিফকেস, আর তিনটে স্টীল কন্টেইনার। ব্রিফকেস দুটোতে মিনি অ্যাটম-বোমা, আর কন্টেইনারগুলোয় ইউরেনিয়াম আছে।

রানার সন্দেহ, আলভি এই গোপন খবরটা আংশিক হলেও জেনেছে। সে হয়তো চাইছে ওকে দিয়ে ওই বোমা আর ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করবে। তা না হলে এত থাকতে গিলগিটের রামা-য় কেন আনা হবে ওদরকে?

একটা ঢালের মাথায় উঠল গাড়ি। লোহার গেটের ভেতর আলো জ্বলছে। ভেতরে একটা পাকা বাড়ি। বাড়ির পিছনে উঁচু একটা টাওয়ার, চূড়াটা অন্ধকার আকাশে হারিয়ে গেছে।

লোহার গেট রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে খোলা হলো। পাকা চত্বর পেরিয়ে বাড়ির সামনে থামল মার্সিডিজ।

ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর রানা, দীর্ঘ ন'ঘণ্টা জার্নি সমস্ত শক্তি শুষে

নিয়েছে। তাবাসসুমের অবস্থা আরও কাহিল। তবু দু'জনেই জানে প্রাণে বাঁচতে হলে বাড়ির ভেতর ঢোকার আগেই কিছু একটা করতে হবে ওদেরকে।

চোখ ইশারায় কথা হলো। তাবাসসুম জানাল, সে রাজি।

কিছুক্ষণ আগেও জুনায়েদ ড্রাইভারের পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ঘুমিয়ে পড়তে নিষেধ করছিল। আর জাম্বু তো প্রায় দু'ঘণ্টা জুনায়েদের গায়ে হেলান দিয়ে নাক ডেকে ঘুমিয়েছে।

গাড়ি থামতে প্রথমে নামল জুনায়েদই; এক হাতে মেশিন পিস্তল, আরেক হাত দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে। গাড়ির আরেক দিক থেকে নামল ড্রাইভার, বাড়ির দরজার দিকে না গিয়ে পাকা চত্বরের শেষ প্রান্তের দিকে এগোচ্ছে, হাত দুটো ট্রাউজারের চেইন খুলতে ব্যস্ত।

ফ্রন্ট সিটে ঘুরে বসে ব্যাক সিটের দরজার তালা খুলে দিল জাম্বু। গাড়ির বাইরে থেকে হাতল ঘুরিয়ে দরজা মেলে ধরল জুনায়েদ। 'নামুন, ম্যাডাম,' তাবাসসুমকে বলল সে।

তাবাসসুম গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে, এই সময় দেখল মুখের সামনে খালি হাতটা তুলে হাই তুলছে জুনায়েদ। রানার সংকেত বা অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করল না, জুনায়েদের অস্ত্র ধরা হাতে বাড়ি মারল সে। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল জুনায়েদের শরীরেও–এক লাফে পিছাল সে, প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মেশিন পিস্তলের ট্রিগার টেনে দিল তাবাসসুমের বুক লক্ষ্য করে।

ওই একই সময় সামনের সিট থেকে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে জাম্বু। তাবাসসুম জুনায়েদের অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছে দেখে সে-ও প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মেশিন পিস্তলের ট্রিগার টেনে দিল।

হিসাবটা যেই করে থাকুক, এখানে এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ও অমূল্য বিবেচিত হলো; জুনায়েদ ও জাম্বু এক সঙ্গে গুলি চালিয়েছে, ওদের অস্ত্র থেকে বুলেট বেরুবার আগেই হ্যাঁচকা টান খেয়ে তাবাসসুম গাড়ির ভেতর রানার গায়ে ছিটকে পড়ল।

কেন কে জানে, দুটো মেশিন পিস্তলের সিলেক্টরই অটোমোটিকে দেয়া ছিল, জুনায়েদ ও জাম্বু পরস্পরকে যেন ঝাঁঝরা করার অবিশ্বাস্য প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। দু'জনের প্রাণহীন লাশ ঢলে পড়ল প্রায়

সঙ্গে সঙ্গেই।

তাবাসসুমকে রানা টেনে নিয়ে বাঁচাতে পারলেও, শেষ রক্ষা হলো না ওদের। পেচ্ছাব না করেই ছুটে ফিরে এলো ড্রাইভার, হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। বাড়ির ভেতর থেকে যমজ দুটো গরিলা বেরিয়ে এলো, যেমন কালো তেমনি লোমশ। সারা গায়ে চর্বি থলথল করছে। তাদের হাতেও পিস্তল।

তাবাসসুম গায়ের ওপর এমন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পড়ে আছে, তাকে সরিয়ে গাড়ির বাইরে বেরুবারই সুযোগ পেল না রানা। ওদেরকে টেনে-হিঁচড়ে বের করল গরিলারা। এক ভাই রানাকে ঘুসি আর লাথি চালায় তো আরেক ভাই ল্যাং মেরে ফেলে দেয়। যখন দেখা গেল রানা উঠছে না, দ্বিতীয় ভাই জ্যাকেটের কলার আর মাথার চুল ধরে খাড়া করল ওকে। প্রথম ভাই লক্ষ্যস্থির করে ঘুসি চালাল। দ্বিতীয় ভাই আবার ল্যাং মারল। এভাবে কতক্ষণ চলত বলা মুশকিল। অকস্মাৎ ড্রাইভারের আর্তনাদ শুনে গরিলারা চমকে উঠে ঘাড় ফেরাল।

ড্রাইভার দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল তাবাসসুমকে। সুযোগ করে নিয়ে তাবাসসুম ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে তার উরুসন্ধিতে সেই মারটা মেরেছে, যে মার কোন পুরুষমানুষের খাওয়া উচিত নয়।

পিস্তলের মুখে এই মুহূর্তে রানা ও তাবাসসুম অসহায়। গরিলা দু'জনকে রীতিমত ভয় পাচ্ছে রানা। বাড়ির ভেতর ঢোকানো হলো ওদেরকে। দু'জনের হাতেই হ্যান্ডকাফ পরানো হলো। প্রায় অন্ধকার করিডর ধরে এগোল ওরা। তারপর সিঁড়ি। বিধ্বস্ত শরীর, ধাপ টপকানোর সময় হাঁপাতে শুরু করল রানা। পাথরের সিঁড়ি, পাথরের দেয়াল, কামরাটাও তাই। ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার। বন্ধ হবার সময় আওয়াজটাই বলে দিল এই ঘরের দরজা লোহার।

ষোলো

'প্লীজ, রানা, প্লীজ! আমাকে তুমি মাফ করো! সত্যি দুঃখিত, এ আমার দ্বারা সম্ভব নয়!' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল তাবাসসুম। হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হাঁপাচ্ছে।

'ঠিক আছে, শান্ত হও, লক্ষ্মী!' নরম সুরে বলল রানা।

'সারারাত, তারপর সারাদিন কেটে যাচ্ছে,' বলল তাবাসসুম, কাঁদছে। 'এক ফোঁটা পানি পর্যন্ত দিচ্ছে না।' এবার নিয়ে ছ'বার রানার বেল্ট বাকল-এর ক্লপস্ খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো সে। কারণটা ওরা দু'জনেই জানে, তাবাসসুমের হাত ও আঙুল অস্বাভাবিক ফুলে উঠেছে, ফলে ওগুলো সুষ্ঠু সাবলীল ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করতে পারছে না। অথচ ওই বেল্ট আর বাকল খুব দরকার রানার।

'আরেকটু ধৈর্য ধরো, লক্ষ্মীটি,' বলল ও।

'তোমার কি মনে হয়, আদৌ আসবে কেউ?' জিজ্ঞেস করল তাবাসসুম।

'আসবে তো বটেই,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'আমার ধারণা আলভি নিজেই আসবে। এখানে আমাদেরকে নিয়ে আসার পিছনে নিশ্চয়ই তার কোন উদ্দেশ্য আছে।' তারপর রানা মনে মনে বলল, সে উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে আমি আঁচ করতে পারছি, কিন্তু দুঃখিত, তোমাকে সেটা বলা যায় না।

'উদ্দেশ্য? কি উদ্দেশ্য?' জিজ্ঞেস করল তাবাসসুম।

'হয়তো জানতে চায় তার সম্পর্কে কতটুকু কি জানি আমরা।'

খানিক পর ডাকল রানা 'তাবাসসুম?'

তাবাসসুম সাড়া দিল না। সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে। নাকি জ্ঞান

হারাল?

মুখ তুলে সিলিঙের কাছাকাছি লোহার রড লাগানো জানালাটার দিকে তাকাল রানা। আন্দাজ করল, খুব বেশি হলে আর ঘণ্টা তিনেক দিনের আলো থাকবে। ভাবল, বাড়িটা কি খালি? ওরা গাড়ির কোন শব্দ পায়নি। হয়তো ড্রাইভার যখন মার্সিডিজ নিয়ে চলে গেছে তখন ওরা ঘুমাচ্ছিল। তার সঙ্গে গরিলারাও চলে গেছে? গোটা বাড়ি খালি, এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। আবার ভাবছে, বাড়িতে কেউ থাকলে কিছু কি আর না খেতে দিত। অন্তত পানি না দিয়ে পারত কি?

বেল্ট ও বাকলের দিকে আবার চোখ নামিয়ে তাকাল রানা। ওগুলোর ভেতর বিস্ফোরক ছাড়াও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খুদে ব্লোগান আছে, আর আছে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি একটা মাইক্রোফোন। কিন্তু নাগাল না পেলে কাজে লাগাবে কিভাবে?

'আমি পানি খাব,' হঠাৎ জেদের সুরে বলল তাবাসসুম। 'এদিকে এসো, আমাকে তুমি চুমো খাও...'

'শ্-শ্-শ্!' ঠোঁটে আঙুল রাখল রানা, সিঁড়ির ধাপ থেকে একটা আওয়াজ ভেসে আসছে বলে মনে হলো। একটু পর পরিষ্কার হলো শব্দটা। কেউ একজন ওপরে উঠছে। 'শোনো,' তাবাসসুমকে বলল। 'ওরা আসছে।'

এক মুহূর্ত পর তালায় চাবি ঢোকাবার শব্দ শোনা গেল। ভারী দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে চৌকো দেশলাই আকৃতির কাঠামো নিয়ে সাবেক স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো ইলিয়াস মোস্তাফা ওরফে একরামুল আলভি। শার্টের ওপর জ্যাকেট পরে আছে সে, হাত দুটো সেই জ্যাকেটের পকেটে। হাসছে সে, ফলে মুখের ফোলা ফোলা অংশগুলো কুঁচকে আরও বেঢপ ও কুৎসিত হয়ে উঠল। 'বাহ্!' ভুরু নাচিয়ে বলল সে। 'আবার আমাদের দেখা হলো। তাও এত তাড়াতাড়ি!'

তাবাসসুমের চোখের রঙ গাঢ় হয়ে উঠল। 'ইউ ব্লাডি বাস্টার্ড!'

আপসোস বা খেদ প্রকাশের ভঙ্গিতে চু-চু আওয়াজ করল আলভি। 'একটা ভদ্র মেয়ের মুখে এই ভাষা!' চৌকাঠ ছেড়ে ঘরের ভেতর ঢুকল সে।

এতক্ষণে মার্সিডিজের ড্রাইভারকে দেখা গেল, হাতে পিস্তল নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। মালিকের দেখাদেখি সে-ও চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল।

'তবে তোমাকে নিয়ে আর যাই করি, গালমন্দ করতে পারব না—আফটার অল তোমার বাবা আমার একজন কমান্ডার ছিলেন,' বলে আবার হাসল আলভি। 'সময়টা কেমন কাটল তাই বলো। এ-কথা অন্তত বলতে পারবে না যে তোমাদের প্রেমে কেউ বাধা দিয়েছে। আমি ওদেরকে কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম, কেউ যাতে এক গ্লাস পানি দিতেও না আসে।'

রানা হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'অথচ তাবাসসুম আমাকে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছিল, তুমি নাকি তাকে সত্যি খুব পছন্দ করো! এই তার নমুনা, না?' তাবাসসুমের দিকে তাকাল ও। 'আর এই তোমার বুদ্ধি?'

'ও কি সত্যি···দীনা সত্যি তুমি—,' একটু বিহ্বল দেখাল আলভিকে, কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল সে। 'সত্যি যদি অবহেলা করা হয়ে থাকে,' গম্ভীর গলায় বলল আবার, 'সেজন্যে আমি দুঃখিত, দীনা।'

'শুকনো দুঃখ প্রকাশ করে লাভ কি,' বলল রানা। 'ওকে এক ঢোক পানি খাওয়াও, আর কাফ দুটো একটু আলগা করো।'

'তোমাকে মুঠোয় পেয়ে কি আনন্দ যে লাগছে আমার!' হাসছে আলভি, হাসতে হাসতেই দাঁতে দাঁত পিষল। 'তুম শালে বাঙ্গাল, বুড়বাক কাঁহিকে—আরেকটু হলে আমার সমস্ত প্ল্যান-প্রোগ্রাম ভণ্ডুল করে দিচ্ছিলে!'

'তা আর পারলাম কই,' জনান্তিকে বলল রানা। 'টাকাটা বোধহয় এতক্ষণে সুইটজারল্যান্ডে পৌঁছে গেছে।'

অকস্মাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠল আলভি। তারপর বিষম খেতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কথাটা এমনি এমনি বলা হত না, শালা বাঙ্গাল লোগ বুদ্ধু হ্যায়। আরে মিয়া বিসিআই এজেন্ট, টাকাটা তো স্রেফ অজুহাত বা ছুতো, আমার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই।'

'তুমি একটা সাইকো, ইলিয়াস মোস্তাফা,' রানা শান্ত, কথা বলছে নরম সুরে। 'পাঁচ-সাতশো তরুণের মধ্যে থেকে তোমাদের দুশোজনকে বাছাই করা হয়, কারণ সামরিক বাহিনীর মনোবিজ্ঞানীরা তোমাদের মধ্যে শুধু সাইকোপ্যাথিক লক্ষণ নয়, সেইডিজাম-এর লক্ষণও দেখতে পেয়েছিল। উর্বর একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই ছিল, মগজ ধোলাইয়ের পর তোমরা কেউ আর মানুষ থাকলে না।'

'দেখা যাচ্ছে আমার সম্পর্কে আমি যা জানি না, তাও তুমি জানো!' হাসল আলভি। 'বলতে পারবে, স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডোদের কি ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল?'

'তোমাদের মিশনের নাম ছিল–কেএইচকেএল,' বলল রানা। 'আরও শুনতে চাও?'

'শাবাশ, রানা, শাবাশ!' আলভির চোখে-মুখে হিংস্র উল্লাস ফুটে উঠল। 'ওরা আমাকে খুন করতে শেখায়, ওদের শেখানো বিদ্যাটাকে আমি অতুলনীয় একটা আর্ট-এর মর্যাদা দান করেছি। ছাত্র হিসেবে নিজেকে আমি দুনিয়ার সেরা বলে দাবি করতে পারি, কারণ আমিই একমাত্র ছাত্র যে শিক্ষকদের কাছ থেকে শেখা বিদ্যা শিক্ষকদেরকেই আবার শেখাচ্ছি। ওরা বলেছিল হিন্দু মারো, কারণ হিন্দুরা পাকিস্তানকে ভাঙছে; ওরা বলেছিল বাঙালী মারো, কারণ বাঙালীরা সব হিন্দু হয়ে গেছে–তো ওদের কথামত শয়ে শয়ে হিন্দু আর বাঙালী মেরেছি আমি। আমাকে শেখানো হয়েছিল, কেউ যদি হিন্দু আর বাঙালী আর শেখ মুজিবের প্রতি সহানুভূতি দেখায় তাকেও খুন করতে হবে। আমি আমার দায়িত্ব পালন করিনি, এ-কথা কেউ বলতে পারবে না। সে দায়িত্ব এখনও আমি পালন করছি। আমাকে কি শেখানো হয়েছিল, শিক্ষকরা তা ভুলে যেতে পারে, কিন্তু আমি ভুলিনি। এখন দেখছি শিক্ষকরাই হিন্দু, বাঙালী আর শেখ মুজিবের প্রতি সহানুভূতিশীল। শুধু কি তাই, তাদের প্রতি ভালবাসা এতই উথলে উঠছে যে হাজার বিলিয়ন টাকা পর্যন্ত দিতে রাজি...'

'একটু পানি! দয়া করো, এক ঢোক পানি খাওয়াও!' তৃষ্ণায় সত্যি খুব কষ্ট পাচ্ছে তাবাসসুম, তবে তার কাতর আবেদনে কিছুটা অভিনয়ও আছে।

'পরে, দীনা, পরে,' বলল আলভি। 'আগে বাঙ্গালী শালার সঙ্গে কথা বলে নিই।' রানার দিকে তাকাল সে। 'কোন প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো তুমি। আগে তোমার কৌতূহল মেটাই, তারপর কাজের কথা হবে।'

'আমার একটাই মাত্র প্রশ্ন,' বলল রানা। 'সাইফুল রব্বানি জানল কিভাবে যে তুমিই ব্যাপারটা শুরু করেছ?'

আলভির চেহারা আরও ফুলে মেরুন হয়ে উঠল। 'ও, ওর কথা বলছ। রব্বানি ছিল আমাদের ইউনিটের সবচেয়ে নরম ধাতুতে গড়া মানুষ। তবে বোকা আর লোভীও ছিল।' হঠাৎ চুটকি বাজাল সে। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার! পাকিস্তান ভেঙে যাবার পর হাসপাতালে পাশাপাশি বেডে ছিলাম আমরা। যুদ্ধ তো শেষ, এরপর কে কি করব, এই নিয়ে আলাপ করতাম। আমি বলেছিলাম, আমার যুদ্ধ শেষ হয়নি, হবেও না–হিন্দু আর বাঙালী যাকে পাব তাকেই কামড় দেব আমি। শুনে হাসত রব্বানি। ও জানত আমার রাশি বিছা, সুযোগ পেলেই কামড় দিতে চাই।

'প্রথম জোড়া খুনটার পর রব্বানি আমার কাছে টাকা চেয়ে ফ্যাক্স পাঠাল। এখন আর মনে নেই, সম্ভবত বিশ লাখ ডলার। দার-এস-সালামে লোক পাঠালাম, কিন্তু শালা পালিয়ে গেল। তারপর খবর পেলাম বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে জোড়া খুন সম্পর্কে ব্যাটা তথ্য দিতে চাইছে। কোত্থেকে? অ্যালেকজান্দ্রিয়া থেকে। বাধ্য হয়ে ভাড়াটে লোকজনকে দিয়ে খুন করাতে হলো। আর কোন প্রশ্ন?'

'প্রশ্ন করার দরকার নেই,' বলল রানা। 'কারণ জানি এরপর কি করবে তুমি।'

হাসতে গিয়েও আলভি হাসল না। একটা হাত তুলে মাথার পাশটা দেখাল। 'এখানে প্লেট লাগানো আছে। মাঝে মাঝে খুব ব্যথা পাই। এর জন্যে ওরা দায়ী, সরকারের লোকজন, সেনা কর্মকর্তা আর রাজনীতিকরা। একে একে সবাইকে ধরা হবে, বিছার কামড় থেকে কারও রেহাই নেই। আমার হাত কতটা লম্বা শাহিন শিকদার খুন হওয়ায় বুঝতে পারোনি? এখন আমার টার্গেট ওই মেয়েলোকটা, যে

হিন্দু আর বাঙালীদের টাকা দেয়ার চুক্তি করতে যাচ্ছে। আমি বেঁচে থাকতে এই চুক্তি হতে পারবে না। একই সঙ্গে বোনাস নেব তোমাদের ওই মেয়েলোকটাকে খুন করে…'

বন্দী হলে কি হবে, বাঘের মতই গর্জে উঠল রানা, 'খবরদার, মুখ সামলে কথা বলো!'

কৌতুক ঝিক করে উঠল আলভির চোখ দুটোয়। 'আচ্ছা, কথাটা কি মিথ্যে? তোমরা বাঙালীরা কি সত্যি হিন্দু হয়ে যাওনি?' হঠাৎ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। 'রানা, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি, হ্যাঁ? কিছু মনে কোরো না। তুমি কি? হিন্দু, না মুসলমান?'

গায়ে আগুন জ্বলছে, তবে কথা বলতে ঘৃণা হচ্ছে রানার।

এবার তাবাসসুমের দিকে তাকাল আলভি। 'দূর, কি বোকা আমি। রানার লজ্জা পাওয়াটা স্বাভাবিক, সত্যি যদি ওর মুসলমানী না হয়ে থাকে। কাজেই ওর কাছ থেকে উত্তরটা পাব না। তুমি তো বোধহয়…বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই জানো, তাবাসসুম। বলবে আমাকে? সত্যি কি ওর মুসলমানী হয়েছে? সত্যি ও হিন্দু নয়?'

মুখের ভেতর আগেই জমিয়ে রেখেছিল, ঝুঁকে পড়া আলভির মুখ লক্ষ্য করে থুথু ছুঁড়ল তাবাসসুম।

হেসে উঠে দ্রুত পিছিয়ে গেল আলভি। 'এরকম একটা তেজী বাঘিনীই আমার দরকার, পোষ মানাতে মজা পাব।' রানার দিকে এগোল এক পা। 'এবার কাজের কথা, রানা। কোত্থেকে জেনেছি জিজ্ঞেস কোরো না, জেনেছি। আমাদের দুটো ব্রিফকেস বোমা আর তিন কন্টেইনার ইউরেনিয়াম চুরি গেছে। ওগুলো এদিকেই, গিলগিটের কোথাও আছে।'

'এ-সব গাঁজাখুরি গল্প আমাকে শোনাবার মানে?'

'তুমি হিন্দু হও বা বঙ্গালী, হিসাব করে দেখলাম ওগুলোর দাম আমার কাছে তোমার চেয়েও বেশি,' বলল আলভি। 'চিন্তা-ভাবনা করে জবাব দাও। বিনিময়ে রাজি?'

'কিসের সঙ্গে কিসের বিনিময়?' রানার অভিনয় আকাশ থেকে পড়ার।

'আমার ধারণা বিসিআই জানে ওগুলো কোথায় আছে,' বলল

আলভি। 'বিসিআই মানে তোমাকে বোঝাতে চাইছি। মাসুদ রানাকে আমি নতুন জীবন দান করব, অর্থাৎ খুন করব না, বিনিময়ে সে শুধু আমাকে জানাবে ওগুলো ডাকাতরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে।'

'তুমি ভুল খবর পেয়েছ, আলভি,' বলল রানা। 'আমি অন্তত এ বিষয়ে সত্যি কিছু জানি না। তবে চুরি যাওয়ার একটা গুজব আমার কানেও একবার এসেছে, আমি সেটা মিথ্যে গুজব বলেই উড়িয়ে দিয়েছি।'

'ঠিক আছে, এসো একটা রফা করি।' আলভি সিরিয়াস, হাসছে না। 'ইউরেনিয়াম ভর্তি কন্টেইনার তিনটে তোমরা নিয়ে যেয়ো, আমি শুধু বোমা দুটো নেব। রাজি?'

কৌশল পাল্টাল রানা। 'চিন্তা করার জন্যে আমাকে সময় দিতে হবে।'

'জান বাঁচানো ফরজ, ঠিক?' হাসল আলভি। 'ঠিক হ্যায়, চব্বিশ ঘণ্টা সময় তুমি পেতেই পারো।' পিছন দিকে তাকিয়ে মার্সিডিজের ড্রাইভারকে ইশারা করল সে।

রানা বলল, 'তার আগে অন্তত একটু মানবতার পরিচয় দাও, আলভি। তাবাসসুমের হাত দুটো দেখেছ?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে পকেট থেকে নিজের পিস্তল বের করে ড্রাইভারকে ডাকল আলভি। 'এই, দীনার হ্যান্ডকাফ খোলো।'

মুক্ত দুই হাতের কব্জি ডলছে তাবাসসুম, আবার যাতে রক্ত চলাচল শুরু হয়।

তিন মিনিট পর আলভি আবার নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে, 'আবার ওর হাতে হ্যান্ডকাফ পরাও, তবে আগের মত আঁট করে নয়।' কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সে। 'মিস্টার বঙ্গালকা হ্যান্ডকাফ ঠিক হ্যায়, কিয়া?' ড্রাইভার চেক করে মাথা ঝাঁকাল। 'গুড।' খুশি দেখাল আলভিকে।

'পানি! একটু পানি!' তাবাসসুম বিড়বিড় করল।

মেঝেতে পড়ে শুকিয়ে আসা থুথুর ছিটার দিকে হাত তুলল আলভি। 'আপাতত নিজের থুথু চেটে পিপাসা মেটাও। রানা কি বলে শোনার পর সিদ্ধান্ত নেব পানি খেতে দেব, নাকি বিষ মেশানো

শরবত।' চলে গেল আলভি, তার পিছু নিয়ে ড্রাইভারও। লোহার ভারী দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তালার ভেতর চাবি ঘোরানোর আওয়াজ পেল ওরা।

তাবাসসুমের আরও কাছে সরে এসে হাত দুটো পরীক্ষা করল রানা। ধাতব আঙটাগুলো এখন আর তার মাংসের ভেতর ডেবে নেই। 'দু'হাত এক করে ঘষো, তাবাসসুম।'

কেঁদে ফেলল মেয়েটা। 'অসহ্য ব্যথা হচ্ছে, রানা!'

'জানি। কিন্তু তোমার আঙুলের ফোলা না কমলে আমার বেল্টের বাক্‌ল তুমি খুলতে পারবে না। ঠিকমত আঙুল চালাতে পারলে ক্লপস্ বের করে আনা পানির মত সোজা।'

'ঠিক আছে, ঘষছি।'

রাত নামল আবার। খিদে নয়, বেশি কষ্ট দিচ্ছে পিপাসা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে। মেঝেটা ঠাণ্ডা। পরস্পরের গায়ে গা ঠেকিয়ে উত্তাপ পাবার চেষ্টা করছে ওরা। প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ছে তাবাসসুম। অনেক সময় ইচ্ছে করেই নড়ছে রানা, তাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে তাবাসসুমের। আর ঘুম ভাঙলেই চেষ্টা করছে দুই হাতের তালু এক করে ঘষতে।

'আরেকবার দেখবে, খোলে কিনা?' নরম সুরে, যেন আদর করছে, জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্যথা কমে গেছে,' বলল তাবাসসুম। 'ফোলাও বোধহয় নেই। হ্যাঁ, আরেকবার দেখি চেষ্টা করে।'

দু'জনের হাতই পিছন দিকে। পরস্পরের দিকে পিঠ দিয়ে বসতে হলো।

'রাত এখন কত, আন্দাজ করতে পারো?' জিজ্ঞেস করল তাবাসসুম।

'ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, বেল্টটা পেয়েছ তুমি। এবার বাক্‌লটা নিজের দিকে টানো। গুড। এবার তোমার তর্জনীটা বাম দিকে সরাতে থাকো।'

'হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল তাবাসসুম।

'হচ্ছে। এবার ওটাকে তোমার ডানদিকে ঠেলতে হবে।'

'জানি, আমার মনে আছে,' বলল তাবাসসুম। 'কিন্তু হারামিটা কিভাবে যেন কোথাও আটকে আছে, রানা। আর তা না হলে গোটা ব্যাপারটাই আমি ভুল ভাবে করছি...'

'সব ঠিক আছে, কোথাও ভুল হচ্ছে না,' বলল রানা। 'ডান দিকে ঠেলার আগে বোতামটায় সামান্য একটু চাপ দাও–নিচের দিকে।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নিজের পিছনে হাত দুটো নাড়াচাড়া করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে তাবাসসুম, নিঃশ্বাস বেরুচ্ছে সশব্দ ও অনিয়মিত। অকস্মাৎ অস্পষ্ট একটা ধাতব শব্দ হলো, সেই সঙ্গে রানা অনুভব করল ঢিল পড়েছে ওর বেল্টে।

'তাবাসসুম! ইউ ডিড ইট!' চাপা গলায় বলল রানা।

বাকল ধরে টান দিয়ে রানার কোমর থেকে বেল্টটা খুলে নিল তাবাসসুম। তারপর দু'জনেই ঘুরে পরস্পরের দিকে মুখ করে বসল। বেল্টটা তাবাসসুমের হাতে, অর্থাৎ তার পিছনে। 'এখন কি?'

'এখন আবার ঘুরে বসব আমরা। তারপর আমি ওই একই ক্যাচ ব্যবহার করে বাকল-এর পিছনটা খুলব, তবে এবার নিচের দিকে ঠেলে। হাতে পেলে ব্লোগানটাকে আমরা লক পিক হিসেবেও ব্যবহার করতে পারব। সমস্যা হবে খুদে বর্শাকে এড়ানো। ডগার প্লাস্টিক মোড়ক ছিঁড়ে গায়ে যদি বিঁধে যায়–খেল্ খতম পয়সা হজম, ওখানে বিষ মাখানো আছে।'

তাবাসসুমের দিকে পিঠ, হাত দিয়ে বাকলটার নাগাল পাবার চেষ্টা করল রানা। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর ক্যাচটা পেল, ঘোরাল যেদিকে ঘোরানো দরকার। বাকল-এর পিছনটা ধাতব শব্দ তুলে খুলে গেল। অত্যন্ত সাবধানে ভেতরে আঙুলের ডগা ঢুকিয়ে প্রথমে মাইক্রোফোনের বোতামটা টিপে দিল রানা। সোহেল এই মুহূর্তে বীপ্ পাচ্ছে। তারপর বর্শাটার অস্তিত্ব অনুভব করল ও, হাতটা টেনে নিল সঙ্গে সঙ্গে। একটু পর আবার এগোল আঙুল, এবার স্পর্শ করল দু'ভাগে বিভক্ত খুদে ব্লোগানের বড় টুকরোটা। তবে বাকল থেকে বের করল সরু, দ্বিতীয় টুকরোটা; ঘাড় বাঁকা করে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে জিনিসটা একবার দেখেও নিল। 'বেল্ট ছেড়ে দাও,' তাবাসসুমকে বলল ও। 'তারপর তোমার

হ্যান্ডকাফ আমার হাতের যতটা পারো কাছে আনো।'

হ্যান্ডকাফের তালায় সরু মেটাল টিউবটা অনেক কষ্টে ঢোকাতে পারল রানা। তবে ঢোকাবার পর সেটাকে ঠিকমত পুরো এক পাক ঘোরাতে সময় লাগল পনেরো মিনিট। ক্লিক করে শব্দটা মধুর চেয়েও মিষ্টি কিছু বর্ষণ করল ওদের কানে। তাবাসসুমের হাত থেকে হ্যান্ডকাফ খসে পড়ল।

'এবার এই একই কাজ তোমাকে করতে হবে,' বলল রানা। কিন্তু অনুভব করল, তাবাসসুম নড়ছে না। 'কি হলো তোমার?' জিজ্ঞেস করল ও।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল তাবাসসুম, হাতের কব্জি ডলতে ডলতে রানার সামনে চলে এলো। 'প্লীজ, রানা, আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবো না। কিন্তু তোমার হ্যান্ডকাফ খোলার আগে আমাকে একটা প্রশ্নের জবাব পেতে হবে।'

'বেশ তো, কি জানতে চাও বলো!' বিস্মিত হবার ভান করল রানা, তবে মনে মনে হাসছে।

'ব্রিফকেস-বোমা আর ইউরেনিয়াম,' বলল তাবাসসুম। 'তুমি জানো ওগুলো কোথায় আছে। অস্বীকার কোরো না।'

'কেন অস্বীকার করব! কোথায় আছে জানিই তো!'

একটু হকচকিয়ে গেল তাবাসসুম। তবে দ্রুতই নিজেকে সামলে নিতে পারল। 'আমার ওপর অফিশিয়াল নির্দেশ আছে এই তথ্যটা, মানে কোথায় ওগুলো আছে, তোমার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে।'

হেসে ফেলল রানা। 'যে-ই তোমাকে নির্দেশটা দিয়ে থাকুক সে আসলে বোকা। ওগুলো কোথায় আছে জেনে কি লাভ তোমাদের, যেখানে আমরা নিজেরাই ওগুলো তোমাদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি?'

'সেরকম কথাই হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা তো ঘটবে দুই দেশের মধ্যে দেনা-পাওনার ব্যাপারে একটা চুক্তির মাধ্যমে ফয়সালা হবার পর।' তাবাসসুম গম্ভীর। 'ধরো চুক্তি হলো, কিন্তু জিনিসগুলো আমরা পেলাম না, তখন কি হবে? তাই চুক্তির আগেই আমাকে জানতে বলা হয়েছে...'

'আলভির মুখে তো শুনেছই, ওগুলো এদিকে কোথাও আছে,'

বলল রানা। 'হয়তো এই রামাতেই।'

'হয়তো?'

মাথা নাড়ল রানা। 'দুঃখিত, তাবাসসুম। এর বেশি কিছু জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'রানা, প্লীজ!'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা।

হঠাৎ কঠিন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটা ভাব ফুটল তাবাসসুমের চেহারায়। এই মেয়েকে রানা চেনে বলে মনে হলো না। 'সেক্ষেত্রে, রানা, আমিও দুঃখিত।'

'মানে?'

'তোমার বেল্টের ভেতর এক্সপ্লোসিভ আছে, তুমিই বলেছ,' বলল তাবাসসুম। 'আর ব্লোগানটা তো দেখতেই পাচ্ছ, শুধু জোড়া লাগাতে বাকি। বিস্ফোরকের সাহায্যে দরজাটা উড়িয়ে দিয়ে এখান থেকে একাই বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে। রামা-য় আমি আগেও এসেছি, শহরটা চিনি। টেলিফোন করে পিএনএসএ এজেন্টদের ডাকব আমি। সবাই মিলে খুঁজে বের করব ওগুলো…'

'কাজটা কি এতই সহজ?'

'সহজ নয়, তবে খুব কঠিনও হবে না,' বলল তাবাসসুম। 'একদল ঈমান আইএসআই এজেন্ট আর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের কয়েকজন অফিসার রামার মত জায়গায় দুটো ব্রিফকেস আর তিনটে ভারী কন্টেইনার নিয়ে কোন হোটেল বা মুসাফিরখানায় উঠবে না, উঠবে একটা সেফ হাউসে। এদিকে সেফ হাউস বলতে হয় গিরিখাদের ভেতর পাথুরে গুহা, নয়তো বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মন্দির। সময় লাগবে, তবে খুঁজে বের করে ফেলব আমরা।' বেল্টটা তুলে একটা ছোট্ট নব ধরে টান দিতে দু'ভাগ হয়ে গেল সেটা, সারি সারি সাজানো প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বেরিয়ে পড়ল, পুটিন-এর মত দেখতে। সঙ্গে ছোট্ট একটা ফিউজ আর দেশলাইও রয়েছে।

'নিচে ওরা ক'জন জানো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভেবেছ এই বাড়ি থেকে একার চেষ্টায় তুমি বেরুতে পারবে?'

'এটাই আমার মূল অ্যাসাইনমেন্ট, রানা,' বলল তাবাসসুম।

'কোথায় আছে জেনে নিয়ে ব্রিফকেস দুটো আর কন্টেইনার তিনটে উদ্ধার করা। কতটুকু কি পারব জানি না, তবে চেষ্টা করতে হবে আমাকে।'

'তুমি যদি পালাতে পারো,' জিজ্ঞেস করল, 'ভেবে দেখেছ আমার কি হবে? সঙ্গে সঙ্গে খুন করবে···'

এক্সপ্লোসিভগুলো দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে লোহার দরজার বিভিন্ন জায়গায় বসাচ্ছে তাবাসসুম। রানার কথার জবাব দিল না।

'তোমাদের এই আচরণের আসল অর্থ হলো,' বলল রানা, 'বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি না করা। সেজন্যেই এই বোমা আর ইউরেনিয়াম আগেভাগে হাতে পেতে চাইছ তোমরা, তাই না?'

এবারও তাবাসসুম কথা বলল না। রানার দিকে পিছন ফিরে কাজ করছে সে। হঠাৎ রানা খেয়াল করল ব্যাপারটা। মেয়েটা নিঃশব্দে কাঁদছে। খানিক পর পর ফুলে ফুলে উঠছে তার পিঠ। একটু পর নিজের ওপর তার আর কোন নিয়ন্ত্রণই থাকল না। ফোঁপাতে শুরু করল। তবে হাত দুটো থেমে নেই। 'সত্যি আমি অসহায়, রানা,' ধরা গলায় বলল সে। 'আমি আমার দেশকে ভালবাসি।'

রানা একটা ছুতো খুঁজছে, কিভাবে তাবাসসুমের মনে কোন রকম সন্দেহ না জাগিয়ে সত্যি কথাটা বলে ফেলা যায়।

এখন বললেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ প্রস্তুতি যা নেয়ার আগেই নিয়ে রেখেছে সোহেল। এরই মধ্যে ভোরের আলো ফুটেছে উপত্যকায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নানা কাজে দু'একজন করে মঠ থেকে বেরিয়ে আসবে। তাদের দু'জনকে ধরে এনে নিজেদের সেফ হাউসে আটকে রাখবে রানা এজেন্সির অপারেটররা: কাকতালীয় ভাবে, সেটা একটা পাহাড়ী গুহাই বটে। ওই সন্ন্যাসীদের ছদ্মবেশ নিয়ে মঠে ঢুকবে দু'জন অপারেটর–গেরুয়া বসনের ভেতর লুকানো গ্যাস বোমা নিয়ে। মঠে লুকিয়ে থাকা বেশিরভাগ ডাকাতরা এত সকালে ঘুম থেকে জাগেনি, তা জাগুক বা না জাগুক, বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে সবাই তারা জ্ঞান হারাবে। এরপর রানা এজেন্সির আরও অপারেটর ঢুকবে মঠে। তারা গাড়িতে তুলবে দুটো ব্রিফকেস-বোমা, তিনটে ইউরেনিয়াম ভর্তি কন্টেইনার ও দু'জন অজ্ঞান আইএসআই এজেন্টকে।

গিরিপথের সেফ হাউসে ফিরে এসে মাটি ও পাথর খুঁড়ে খুদে অ্যাটম-বোমা ও ইউরেনিয়াম পুঁতে রাখা হবে, ওগুলোর সঙ্গে কবর দেয়া হবে দুই আইএসআই এজেন্টকে—না, জ্যান্ত নয়, গুলি করে মারার পর।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কাজ শেষ হতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। তারও বিশ কি পঁচিশ মিনিট আগে রামা থেকে অজ্ঞাতনামার একটা টেলিফোন কল যাবে ইসলামাবাদে, পিএনএসএ চীফ ব্রিগেডিয়ার কাজেমির কাছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠটা রামার ঠিক কোথায়, এ তথ্য জানিয়ে তাঁকে বলা হবে, বোমা ও ইউরেনিয়াম সম্ভবত ওখানেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তবে পরামর্শ দিয়ে বলা হবে অকস্মাৎ হামলা না চালিয়ে মঠটার ওপর দু'চারদিন নজর রাখাই উচিত। প্রথমে নিশ্চিত হয়ে নিলে ভাল হয় যে জিনিসগুলো সত্যি ওখানে আছে।

বেঙ্গমান আইএসআই ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের সদস্যরা ধরা পড়ার পর কোন তথ্যই দিতে পারবে না। শুধু বলতে পারবে, জ্ঞান ফেরার পর তারা দেখেছে জিনিসগুলো নেই, আর নেই তাদের দু'জন লোক।

বোমা ও ইউরেনিয়াম কোথায়, পাকিস্তানের তরফ থেকে এ প্রশ্ন করা হলে বাংলাদেশ সুবিধে মত জবাব দেবে। দেনা-পাওনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে জবাব হবে এক রকম, আলোচনা ভেঙে গেলে হবে অন্য রকম, আবার চুক্তি হবার পর বাস্তবায়িত করতে গড়িমসি করলে আরেক রকম—অর্থাৎ কলকাঠি সব বাংলাদেশের হাতেই থাকবে, ন্যায্য পাওনা আদায় যাতে সম্ভব হয়। তবে ওই বোমা ও ইউরেনিয়াম কখনোই বাংলাদেশে নিয়ে আসা হবে না।

'কেঁদো না, লক্ষ্মীটি,' নরম সুরে বলল রানা, উদ্দেশ্য মায়া আরও বাড়িয়ে মেয়েটাকে আবেগে আপ্লুত করে তোলা। 'তোমার সমস্যা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমাকেও বুঝতে হবে যে আমিও আমার দেশকে ভালবাসি।'

'কিন্তু ওই বোমা আর ইউরেনিয়াম তোমাদের নয়,' যুক্তি দেখিয়ে বলল তাবাসসুম। 'ওগুলো তোমরা নিজেদের দেশে পাচার করতে

পারো না।'

'তা পারি না,' স্বীকার করল রানা। 'তবে পাচার করতে চাই, এ-কথাও সত্যি নয়। তোমরা আমাদের পাওনা টাকা যাতে দিতে বাধ্য হও, তাই আপাতত বলতে মানা ওগুলো কোথায় আছে।'

'আপাতত মানা? পরে বলবে?' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল তাবাসসুম।

'অবশ্যই পরে বলা হবে,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'সম্ভব হলে ওগুলো আমরা তোমাদের হাতে তুলে দেব।'

'তাহলে আমার একটা অনুরোধ রাখো,' বলল তাবাসসুম। 'আমি কথা দিচ্ছি, চুক্তি স্বাক্ষরের আগে আমার অফিসকে আমি কিছুই জানাব না—তুমি বিশ্বাস করে আমাকে বলো কোথায় আছে ওগুলো।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। এখান থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি কোন ফোনের কাছে যেতেও তাবাসসুমের সময় লাগবে অন্তত ত্রিশ মিনিট। ওদের লোকজন খবর পাবে, এক জায়গায় জড়ো হবে, তারপর রওনা হবে মঠের উদ্দেশ্যে—ততক্ষণে মঠে জিনিসগুলো থাকবে না। 'অফিসকে যদি না-ই জানাবে, তথ্যটা জানতে চাইছ কেন?' জিজ্ঞেস করল ও। পরমুহূর্তে ভাবল, প্রশ্নটা খুব কঠিন হয়ে গেল না তো? তাবাসসুম গ্রহণযোগ্য জবাব দিতে না পারলে ওরই সমস্যা হবে।

'এই অনুভূতিটা উপভোগ করতে চাইছি যে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো,' বলল তাবাসসুম। 'কারণ আমিও তো বিশ্বাস করেই তোমাকে মুক্ত হতে সাহায্য করব। আমাকে এ-ও বিশ্বাস করতে হবে যে মুক্ত হবার পর তুমি আমাকে খুন করে একা পালাবে না।'

মনে মনে মেয়েটার শুধু বুদ্ধির নয়, আন্তরিকতারও প্রশংসা করতে হলো রানাকে। এ পেশায় মনে দ্বিধা ও সংশয় থাকলে কাউকে বিশ্বাস করাটা নিজের ওপর মারাত্মক অন্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়।

'রামা-য় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কয়েকটা মঠ আছে,' বলল রানা। 'সবচেয়ে বড় মঠটা চমন পাস গিরিপথের উত্তরে। ওখানে।'

হেসে উঠল যেন একটা পাগলিনী। ধীরে ধীরে দাঁড়াল তাবাসসুম। এগিয়ে এসে রানার সামনে থামল। 'কি করে বিশ্বাস করলে আমি তোমার হাত খুলে দেব? তুমি বোকা? নাকি আমার প্রেমে পড়েছ?'

রানার পিছনে এসে বসল। ব্লোগানের টিউব দিয়ে ওর হ্যান্ডকাফের তালা খোলার চেষ্টা করছে।

বিস্ফোরণের শব্দে প্রাচীন পাথুরে টাওয়ার থরথর করে কেঁপে উঠল। লোহার কবাটের কোন ক্ষতি হয়নি, তবে কব্জায় বসানো বিস্ফোরক ওগুলোকে ভেঙে ফেলেছে, ফলে গোটা কবাট আছাড় খেয়ে পড়ল সিঁড়ির ধাপে। একটু পরই পায়ের শব্দ শুনল ওরা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। দরজা নেই, ফাঁক আছে, সেই ফাঁকের দু'ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে রানা ও তাবাসসুম। গরিলারা দুই ভাই আসছে, পায়ের ভারী থপ্-থপ্ আওয়াজই বলে দিল। যমজ ও একই চেহারার হওয়ায় বোঝা গেল না কে ঘরে ঢুকল। যে-ই ঢুকুক, তার পিস্তল ধরা হাতে ডান হাতের কোপ মারল রানা, পিস্তলটা মেঝেতে পড়ে হড়কে গেল একদিকে। কোপ-এর পরপরই লোকটার চোয়ালে একটা ঘুসিও মেরেছে রানা। লোকটা কিছুই করছে না, শান্তভাবে তাকিয়ে আছে–পিস্তলটাই হারিয়েছে শুধু সে, রানা তাকে এক চুল নড়াতে পারেনি।

একটা অজানা ভয়, সেই সঙ্গে প্রবল আতংক গ্রাস করতে চাইল রানাকে, সে-সব ঝেড়ে ফেলে কারাতে-কুংফু সহ যত রকম আন-আর্মড কমব্যাট শেখা আছে সব একে একে ব্যবহার করতে শুরু করল। ছুটন্ত কাঁধের ধাক্কা, জোড়া পায়ের উড়ন্ত লাথি, অব্যর্থ বুলেটের মত তারপর হাফ ডজন ঘুসি, ভাঁজ করা হাঁটুর গুঁতো, ল্যাং, চড়-থাপ্পড়-মোটকথা বাকি রইল শুধু দুই হাত এক করে মাফ চাওয়া; স্নেহপদার্থের মস্ত ডিপো জায়গা বদল না করে সর্বংসহা ধরণীর মত নির্বিকারচিত্তে সব হজম করেছে, তারচেয়ে মারাত্মক বিপদের কথা এই মুহূর্তে হাসছে সে, হাতের পেশি ফুলিয়ে দেখাচ্ছে রানাকে, প্রকাণ্ড উরুতে চাপড় মারছে বোমা ফাটানোর মত শব্দ করে।

এবার দ্বিতীয় গরিলাও ঘরে ঢুকল। তাকে সামলাবার কথা তাবাসসুমের। ব্লোগান মুখে পুরে অপেক্ষা করছিল সে। ফুঁ দিতেই ছুটল বর্শা। গলায় বিঁধল। দ্বিতীয় গরিলা সঙ্গে সঙ্গে চিৎপটাং। তাই দেখে হুংকার ছাড়ল প্রথম গরিলা, রানার দিকে পিছন ফিরে হাত

বাড়াল তাবাসসুমকে ধরার জন্যে।

আরেকবার ফুঁ দিল তাবাসসুম। প্রথম গরিলাও গলায় বর্শা নিয়ে ধরাশায়ী হলো, ফলে আরেকবার কেঁপে উঠল টাওয়ারটা।

তৃতীয় লোকটা, মার্সিডিজের ড্রাইভার, নিচতলায় অপেক্ষা করছিল। ওদের দু'জনকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখে পিস্তল তুলল সে, কিন্তু গুলি না করে হুমকি দিয়ে বলল, 'খবরদার! পালাতে চেষ্টা কোরো না। আমি কিন্তু গুলি করব...'

সে খেয়ালই করল না তাবাসসুম মুখে কি তুলছে। ডান বাহুতে বর্শাটা বিঁধতে তাকাল, বাম হাত দিয়ে ধরল সেটা। কিন্তু টান দেয়া আর হলো না, বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ায় সিঁড়ির গোড়ায় ঢলে পড়ল সে।

নিচে নেমে গোটা বাড়ি খালি পেল ওরা। লাইব্রেরী রুমের একটা দেরাজে ওদের অস্ত্রগুলো রয়েছে। মার্সিডিজটা সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ইগনিশনে চাবি নেই। ড্যাশ-এর নিচে হাত ঢুকিয়ে তারের সঙ্গে তার ঘষে এঞ্জিন স্টার্ট দিল রানা।

মার্সিডিজ ছুটল গিলগিট এয়ারপোর্টের দিকে। রানা জানে গিলগিট এয়ারপোর্ট থেকে প্রতিদিন পিআইএ-র একটা ফ্লাইট ইসলামাবাদে যায়। সময় লাগে এক ঘণ্টা।

সতেরো

রানাকে লুকিয়ে দু'বার নিজের অফিসে ফোন করল তাবাসসুম। প্রথমবার গিলগিট এয়ারপোর্টে প্লেনের জন্যে অপেক্ষা করার সময়, বাথরুমে যাবার নাম করে। রানা অবশ্য ঠিকই টের পেল কোথায় কি করতে যাচ্ছে সে। তাবাসসুম ফিরে এলো থমথমে চেহারা নিয়ে। রানা

দেখেও না দেখার ভান করল। ও জানে, পিএনএসএ হেড অফিস থেকে ঠিক কি বলা হয়েছে তাকে–অজ্ঞাতনামার টেলিফোন পেয়ে বোমা ও ইউরেনিয়াম উদ্ধারের জন্যে একটা বৌদ্ধ মঠে হানা দিতে গেছে এজেন্টরা, এখনও কোন রিপোর্ট এসে পৌঁছায়নি।

দ্বিতীয়বার রানাকে ইসলামাবাদ এয়ারপোর্টের কাস্টমস্ শেডে বসিয়ে রেখে 'আসছি' বলে চোখের আড়ালে চলে গেল তাবাসসুম, ফিরল বেশ দেরি করে। এবার রানাকে কিছু অনুমান করতে হলো না। অফিসে ফেরার সময় ট্যাক্সিতে নিজেই মুখ খুলল তাবাসসুম। 'অফিসে ফোন করেছিলাম। বসের সঙ্গে জরুরী কয়েকটা বিষয়ে কথা হলো।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'যেমন?'

'সব খবরই খারাপ, রানা,' ম্লান সুর তাবাসসুমের। 'সবচেয়ে খারাপ হলো, রামার সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠে পিএনএসএ ও আইএসআই এজেন্টরা যৌথ অভিযান চালিয়েছে, কিন্তু জিনিসগুলো উদ্ধার করতে পারেনি।'

'ওগুলো বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠে আছে, এ-খবর জানল কিভাবে?' রানার চোখে রাগ। 'নিশ্চয়ই গিলগিট এয়ারপোর্ট থেকে তুমি ফোন করে বলে দিয়েছ!'

'না! বিশ্বাস করো, আমি বলিনি!' রানার হাত চেপে ধরল তাবাসসুম। 'বস্ বললেন রামা থেকেই নিজের পরিচয় না দিয়ে এক লোক ফোন করে তাঁকে তথ্যটা দেয়। গিলগিটে আমাদের ও আইএসআই-এর এজেন্ট ছিল, তারা দ্রুত অভিযান চালিয়ে মঠের ভেতর ঢুকে পড়ে। দু'জন বাদে ডাকাতদের সবাই ধরা পড়েছে, বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ব্রিফকেস আর কন্টেইনার তিনটে পাওয়া যায়নি।'

'সর্বনাশ!' রানার শিউরে ওঠার অভিনয়ে এতটুকু খুঁত নেই। 'এর দায়-দায়িত্ব পুরোটা বিসিআইকে বহন করতে হবে। কারণ পাকিস্তান সরকারকে আমরাই জানিয়েছিলাম যে ডাকাতরা পাকিস্তান ছেড়ে পালাতে পারেনি, তারা কোথায় আছে আমরা জানি, কড়া নজরও রাখছি। তুমি যা বলছ তা যদি সত্যি হয়, আগামীকাল আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইসলামাবাদে নিশ্চয়ই আসছেন না, সম্ভবত এরইমধ্যে তাঁর

সফর বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে...'

বিষণ্ন চেহারা, ওপর-নিচে মাথা দোলাল তাবাসসুম। 'বসেরও ধারণা, সফরটা বাতিল করা হবে। কারণ ওগুলো বাংলাদেশ উদ্ধার করে দেবে, এই শর্তেই দেনা-পাওনার ব্যাপারটা আলোচনার মাধ্যমে ফয়সালা করতে রাজি হয় পাকিস্তান।'

বিচলিত ও উদভ্রান্ত, এটা বোঝাবার জন্যে মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে রানা। 'কিভাবে কি ঘটল জানা দরকার। বিসিআই-এর এই ব্যর্থতা আমি মেনে নিতে পারছি না। বাংলাদেশের কত বড় ক্ষতি হয়ে গেল, বুঝতে পারছ তুমি, তাবাসসুম?'

তাবাসসুম তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'তুমি শুধু বাংলাদেশের ক্ষতিটা দেখছ? এদিকে যে পাকিস্তানকে মারাত্মক একটা বিপদের মুখে পড়তে হয়েছে, সে-কথা একবারও ভাবছ না? ওই বোমা দুটো যদি আলভির হাতে পড়ে থাকে, তার পরিণতি কল্পনা করতে পারো? সে হয়তো একটা বোমা নয়া দিল্লিতে ফাটাবার ব্যবস্থা করছে–ফাটাবার পর বলবে, এর জন্যে পাকিস্তান দায়ী।'

বেশ বড় করে একটা ঢোক গিলে রানা বলল, 'ওহ্, গড! এ আলভির পক্ষে সম্ভব।' পরমুহূর্তে বড়বড় করল চোখ দুটো। 'কিন্তু আলভির রাগ তো হিন্দু, বাঙালী, বাংলাদেশী আর শেখ মুজিবের ওপর, তাই না? বোমা দুটো ভারতে নয়, বাংলাদেশেই ফাটাবে সে।'

'পাকিস্তান সরকারের ওপরও তার রাগ কম নয়,' মনে করিয়ে দিল তাবাসসুম। 'ইসলামাবাদে ফিরলাম বটে, কিন্তু এখানে কেউ আমরা নিরাপদ নই–যতক্ষণ না বোমাগুলো উদ্ধার হচ্ছে।'

'তোমার বস্ বিসিআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে জিজ্ঞেস করেননি, এতবড় অঘটন কিভাবে ঘটল?'

'অবশ্যই জিজ্ঞেস করেছেন,' বলল তাবাসসুম। 'তোমাদের তরফ থেকে ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে–এখনও বিসিআই-এর দৃষ্টিসীমার ভেতরই আছে ওগুলো, যদিও নাগালের মধ্যে আনতে আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন। বস্ রীতিমত খেপে আছেন, রানা। বলছেন, এটা কোন উত্তরই নয়, স্রেফ হেঁয়ালি।'

বড় করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাবাসসুমের হাত চাপড়ে

অভয় ও সান্ত্বনা দিল রানা। 'আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে আছে? আরে, এ-কথা আগে বলবে তো। এর মানে হলো, চোরের ওপর বাটপারি হয়েছে ঠিকই, তবে বাটপার দুজনকেই বিসিআই চেনে। শুধু চেনে না, চোখে চোখেও রেখেছে। এর মানে বোঝো? সবই আগের মতই আছে। কিছুই বদলায়নি।'

'সত্যি বলছ?' তাবাসসুম ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'বোমা দুটো আলভির হাতে পড়েনি?'

'আরে না! বিসিআই এত কাঁচা কাজ করে না!'

অফিসে ফিরতে দেখা গেল রানার ধারণাই সত্যি। নিজের চেম্বারে কার্পেটের ওপর দ্রুত পায়চারি করছেন ব্রিগেডিয়ার কাজেমি, তবে সেজন্যে বিসিআই দায়ী নয়, দায়ী লেফটেন্যান্ট ইলিয়াস মোস্তাফা ওরফে একরামুল আলভি।

রানার একটা প্রশ্নের উত্তরে রীতিমত গর্জে উঠলেন পিএনএসএ চীফ। 'আপনি বলতে পারেন, মিস্টার রানা, ওই বর্ণ মাস মার্ডারারটা আসলে কি চায়?' চিৎকার করার সময় খেয়াল ছিল না যে মুখে পাইপ রয়েছে, সেটা ছিটকে পড়ে গেল। দোপাট্টা সামলে কার্পেটে হাঁটু গেড়ে সেটা তুলল তাবাসসুম, পায়ের স্যান্ডেল খুলে বাড়ি মেরে আগুনের খুদে টুকরো নেভাচ্ছে। 'সুইটজারল্যান্ডে টাকা পাঠাবার যে নির্দেশগুলো দিল, প্রত্যেকটার একাধিক অর্থ হয়। ব্যাখ্যা চাইলাম আমরা, কিন্তু পেলাম না। তারপর আপনারা দু'জন যখন নিখোঁজ হয়ে গেলেন, বুঝলাম তার উদ্দেশ্য শুধু টাকা আদায় নয়, আরও মারাত্মক কিছু করতে চাইছে। তার সবগুলো অফিস আর বাড়ির ওপর নজর রাখা হচ্ছে, কিন্তু কেউ বলতে পারছে না কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে সে…'

'আমরা পালিয়ে আসায় সে-ও ইসলামাবাদে ফিরে আসবে,' ব্রিগ্রেডিয়ারকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'হ্যাঁ, আরও মারাত্মক কিছু করতে চাইছে সে। আগামীকাল সকালে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আসছেন। তাঁর সফর ও কর্মসূচি আমাকে দেখতে দিন, তাহলে আন্দাজ করা সহজ হবে কোথায় হামলাটা হবে…'

'কিন্তু তার টাকা তো সে পেয়ে যাচ্ছে, তারপরও হামলার কথা উঠছে কেন?' বললেন ব্রিগেডিয়ার। 'তাছাড়া, আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে

খুন করে তার লাভ কি?'

'আপনি কি কিছুই জানেন না, মিস্টার কাজেমি, নাকি জেনেও স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছেন?'

'জ্বী!' হাঁ হয়ে গেলেন পিএনএসএ চীফ।

'এই কাজ, বাঙালী খুন করা, আপনারাই তাকে শিখিয়েছেন,' বলল রানা। 'বাংলাদেশের টাকা ফিরিয়ে দেয়ার আলোচনা করতে পাকিস্তান রাজি হওয়ায় সেই বিদ্যা এতদিন পর এখন সে আবার কাজে লাগাচ্ছে। আমাদের বাংলা ভাষাতে একে বলেঃ গুরু-মারা বিদ্যা।'

'সে কি শুধু...নাকি আমাদের-?'

তাঁকে প্রশ্নটা শেষ করতে না দিয়ে তাবাসসুম বলল, 'জ্বী, সার। আপনার ধারণাই ঠিক। আলভি জানিয়েছে, দুই প্রধানমন্ত্রীকেই টার্গেট করবে সে।'

এগিয়ে এসে লাল একটা ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন পিএনএসএ চীফ। 'সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি নিয়ে প্রেসিডেন্টকে আমি আর্মির সহায়তা চাইতে অনুরোধ করি। রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রাইম মিনিস্টারের সরকারী বাসভবনে উঠছেন-চারদিক থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যরা ওটা ঘিরে রাখবে।'

গতকাল থেকে শুরু হয়েছে বাংলাদেশী প্রধানমন্ত্রীর পাকিস্তান সফর। আজ রাতে তাঁর সম্মানে রাষ্ট্রীয় ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। সেটা চার দেয়ালের ভেতর অনুষ্ঠিত হবে, তাই খুব একটা বিপজ্জনক বলে গণ্য করা হচ্ছে না। বিকেলে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়া হবে; গণ্যমান্য নাগরিকদের সঙ্গে পরিচিত হবেন তিনি, অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দেবেন পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার, জবাবে তিনিও দু'চার কথা বলবেন। এই অনুষ্ঠানটাই বিপজ্জনক, কারণ এটার আয়োজন করা হয়েছে পাকিস্তানী প্রাইম মিনিস্টারের সরকারী বাসভবনের তিনতলায়, রোজ গার্ডেনের পাশে বিশাল লাউঞ্জে। এই রোজ গার্ডেন আর লাউঞ্জ রানা দেখেছে, কাজেই জায়গাটা যে কতখানি অরক্ষিত ওর খুব ভাল

করেই তা জানা আছে। তবে এ-সব কথা কাউকে বলে কোন লাভ নেই। বহু চেষ্টা করেও সফর বাতিল করা যায়নি, এমন কি কোন অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রামও স্থগিত করা হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

তবে দুই প্রধানমন্ত্রীর জন্যে নিরাপত্তার আয়োজনে যে কোন ত্রুটি রাখা হয়নি এটা রানার মত খুঁতখুঁতে এজেন্টকেও স্বীকার করতে হলো।

সবাইকে একেবারে হকচকিয়ে দিয়ে গণ-সংবর্ধনার সময় পাঁচ ঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়েছে–বিকেল তিনটের বদলে সকাল দশটা। সিদ্ধান্তটা এসেছে সদ্য গঠিত যৌথ সিকিউরিটি কমিটির রুদ্ধদ্বার কক্ষের বৈঠক থেকে, ভোর পাঁচটায়। এই কমিটিতে সব ক'টা ইন্টেলিজেন্স সংস্থা, সেনাবাহিনী, সীমান্ত রক্ষীবাহিনী, পুলিস ও আনসার-এর প্রতিনিধি আছে। সময় বদলে যাওয়ায় নিমন্ত্রিত মেহমানদের সমস্যার কথা ভেবে ওই গোপন বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বাছাই করা মাত্র তিনশো নাগরিককে সেনাবাহিনীর গাড়ি পাঠিয়ে প্রাইম মিনিস্টারের সরকারী বাসভবনে নিয়ে আসা হবে, বাকি প্রায় সাতশো প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের কাছে রাষ্ট্রের তরফ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া হবে, বলা হবে দুই প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার স্বার্থে সময়টা এগিয়ে আনা হয়েছিল, এবং বুলেটপ্রুফ কার-এর অভাবে তাঁদেরকে অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি।

গণ-সংবর্ধনার অনুষ্ঠান ভালভাবেই শুরু হলো। সময়টা একেবারে পাঁচ ঘণ্টা এগিয়ে আনার কারণে নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবারই ধারণা, আততায়ী প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ পাবে না, ফলে তার পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বাধ্য।

সেনাবাহিনীর সাধারণ সিপাই থেকে শুরু করে মিলিটারি পুলিস, সাধারণ পুলিস, ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট–সবাইকে বিশেষ ধরনের পরিচয়-পত্র দেয়া হয়েছে। এই প্লাস্টিক কার্ড সবার বুকেই সাঁটা রয়েছে। সিকিউরিটি কমিটির নির্দেশে কাল রাতে সিকিউরিটি প্রেস থেকে এই কার্ড ছাপা হয়েছে। গোঁনা কার্ড। নকল করাও সম্ভব নয়।

সব ঠিক আছে। এত কড়া পাহারার মধ্যে কারও চোখে ধরা না পড়ে প্রাইম মিনিস্টারের সরকারী বাসভবনে একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত

ঢুকতে পারবে না। কিন্তু তারপরও রানার বিশ্বাস, বিছা ঠিকই আজ কামড় দেবে।

অন্তত চেষ্টার কোন ত্রুটি সে করবে না। আসলে ওটা তো রক্ত-মাংসের একটা রোবট, পরিবেশ-পরিস্থিতি কিছুই গ্রাহ্য করবে না, তাকে দেয়া নির্দেশ পালন করবে মাত্র–যে নির্দেশ দুই যুগেরও আগে দেয়া হয়েছে তাকে।

প্রায় বিশ মিনিট হলো তাবাসসুমের সঙ্গে রানার দেখা হচ্ছে না। আগেই ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে যার খুশি ঘুরে বেড়াবে, যার কাছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে সে সেটাই করবে। অনুষ্ঠান শুরু হবার আগে থেকেই লাউঞ্জে রয়েছে তাবাসসুম। রানা লাউঞ্জের চারপাশের বারান্দা, ঝুল-বারান্দা আর আশপাশের করিডরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝখানে একবার রোজ গার্ডেন থেকেও ঘুরে গেছে ও।

রানার ধারণা, আলভি ভেতরে ঢুকতে পারলে বিষাক্ত গ্যাস কিংবা গ্রেনেড ব্যবহার করবে।

এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেম এক্সপার্টদের দিয়ে আগেই চেক করানো হয়েছে, তারপরও সকাল আটটার কিছু পরে রানা নিজে একবার চেক করেছে। তিনতলার লাউঞ্জ ও আশপাশের এলাকা বোমা বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে দু'বার চেক করেছে, মেহমানদের কিছু বুঝতে না দিয়ে সংগোপনে আরও একবার চেকিং চলছে; এখন পর্যন্ত কোন বোমা বা বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি। ডিউটিরত প্রহরীরা শুধু যে স্বস্তি বোধ করছে তা নয়, ব্যাপারটাকে এত সিরিয়াসলি নেয়ায় তাদের অনেকেই মুচকি মুচকি হাসছে। তাদের সেই হাসি ধীরে ধীরে আইএসআই, পিএনএসএ, ডিবি, এসবি ও পুলিসের মধ্যেও সংক্রমিত হচ্ছে।

কিন্তু হাসতে পারা তো দূরের কথা, মুহূর্তের জন্যেও শান্ত হতে পারছে না রানা। ও ভাবছে, আলভিকে ওরা চেনে না। সে তো মানুষ নয়। এখন পর্যন্ত তাকে বা তার রেখে যাওয়া কোন বিস্ফোরক না পাবার সম্ভাব্য একমাত্র কারণ হলো ওরা এখনও ঠিক জায়গাটিতে তল্লাশী চালায়নি। রানা নিশ্চিত, শেষ হাসিটা ওই অমানুষটাই হাসবে।

রোজ গার্ডেনে ফিরছে রানা, পথ আটকাল দু'জন মিলিটারি পুলিস। বুকে প্লাস্টিক কার্ড সাঁটা আছে, কিন্তু তিনতলায় উঠতে বা

লাউঞ্জ ও রোজ গার্ডেনে ঢুকতে হলে ওই কার্ডও যথেষ্ট নয়, ব্যক্তিগত আই.ডি. কার্ডও দেখাতে হবে। মিলিটারি পুলিসের কাছে তালিকা আছে, শুধু তাদেরকেই এখানে ঢুকতে বা থাকতে দেবে তারা। এখান পর্যন্ত আসতে পাঁচবার নিজের ব্যক্তিগত পরিচয়-পত্র দেখাতে হয়েছে রানাকে।

অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে কার্ডটা পরীক্ষা করা হলো, ওদের কাছে যে ফটো আছে সেটার সঙ্গে ওর কার্ডের ফটো এবং দুই ফটোর সঙ্গে ওর চেহারাও মেলানো হলো, তারপর অনুমতি পাওয়া গেল ভেতরে ঢোকার।

এই সময় পিছন থেকে জোর করতালির শব্দ ভেসে এলো। পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার আগেই পৌঁছেছেন, এখন পৌঁছালেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। ধাপ বেয়ে স্টেজে উঠছেন তিনি, স্টেজের কিনারায় সরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন প্রাইম মিনিস্টার।

রোজ গার্ডেনে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে লাউঞ্জটা ভাল করে দেখে নিল রানা। সব কিছু স্বাভাবিক, বেমানান কিছুই চোখে পড়ছে না। খোলা লাউঞ্জের দিকে পিছন ফিরে রোজ গার্ডেনে নেমে এলো রানা। দাঁড়াল ঠিক যেখানটায় বসে পাকিস্তানী প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে মাত্র ক'দিন আগে আলাপ হয়েছিল ওর। এখানেও, ছাদের কিনারায়, রোজ গার্ডেন ও লাউঞ্জের দিকে পিছন ফিরে সেনাবাহিনীর লোকজন চারপাশে নজর রাখছে। একদম কাছাকাছি বহুতল বিল্ডিং খুব একটা বেশি নয়, সেগুলোর ছাদেও পাহারা দিচ্ছে রাইফেলধারী সৈনিকরা।

ছাদের কিনারায় চলে এলো রানা। সেনাবাহিনীর একজন লেফটেন্যান্ট চোখে বিনকিউলার তুলে দূরে তাকিয়ে আছে।

দু'দিক থেকে পুলিসের দুটো হেলিকপ্টার উড়ে এসে একটা আরেকটার উল্টোদিকে চলে গেল।

'আমি একটু দেখতে পারি?' লেফটেন্যান্টকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আলবত, সার,' বলে বিনকিউলারটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল তরুণ লেফটেন্যান্ট।

কাছেপিঠের ছাদগুলোর ওপর চোখ বুলাল রানা। প্রতিটি ছাদে

পুলিস আর সৈনিক প্রায় গিজ গিজ করছে, কাজেই ওদেরকে দেখে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে দূরে তাকাল রানা। প্রকাণ্ড একটা ছাদ দেখতে পেল ও, কয়েকটা সুপারস্ট্রাকচার আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে, কি যেন একটা নড়ছে সেখানে। কালো চুল, হাঁটাহাঁটি করছে, সম্ভবত একজন পুলিস। হ্যাঁ, এখন ইউনিফর্মটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

দম ছেড়ে বিনকিউলারটা লেফটেন্যান্টকে ফিরিয়ে দিল রানা। 'ধন্যবাদ।'

রোজ গার্ডেনটা এক চক্কর ঘুরে লাউঞ্জে উঠে এলো ও। মঞ্চ সহ চেয়ার ফেলা গোটা এলাকা সৈনিকরা ঘিরে রেখেছে। মঞ্চটা একটু বেশি উঁচু লাগল রানার। এদিকটায় খেয়াল দেয়া উচিত ছিল। ওটা এত উঁচু হওয়ায় আশপাশের বিল্ডিং থেকে একজন স্নাইপারের সহজ টার্গেটে পরিণত হতে পারেন দুই প্রধানমন্ত্রী। সৈনিক আর পুলিসরা তো ছাদে পাহারা দিচ্ছে, ছাদের নিচের শত শত জানালার সব ক'টার ওপর কি নজর রাখতে পারছে তারা?

করিডর হয়ে সিঁড়ি বেয়ে পাশের দালানের পাঁচতলায় উঠে এলো রানা। চার জায়গায় পরিচয়-পত্র দেখাতে হলো। পাঁচতলার ছাদে তাবাসসুমকে পেয়ে গেল ও। তার হাতে একটা ওয়াকি-টকি রয়েছে, যৌথ সিকিউরিটি কমিটির কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছে সে। ওকে দেখে হাসল, এগিয়ে আসছে। 'হাই, রানা। অনুষ্ঠান কেমন এগোচ্ছে?'

'এখন পর্যন্ত ভালই।' তাবাসসুমের কাঁধে হাত রাখল রানা। 'কি জানো, তাবাসসুম, তার হিসাব বা প্ল্যানটা আমি ধরতে পারছি না। বিশ্বাস করবে, এক ধরনের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগছি আমি? আজ যদি সে কাছেপিঠে···

একদম কাছ ঘেঁষেই লোকটা চলে যাচ্ছে। দেখামাত্র থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। সাদা সার্ভিং জ্যাকেট পরে আছে, হাতে স্যান্ডউইচ ভর্তি ট্রে। স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘ কাঠামো, শারীরিক গঠন পুরোপুরি মেলে আলভির সঙ্গে। হাতটা লম্বা করে দিয়ে খপ্ করে তার বাহু খামচে ধরল রানা, অপর হাতটা ওয়ালথারের হাতলে পৌঁছে গেছে।

লোকটা ঘুরল, পিস্তল দেখে ভয়ে ঝুলে পড়ল মুখ। চুল নকল নয়, মুখের পেশিও নয় ফোলা ফোলা, পরিষ্কার বোঝা যায় বড়শির মত বাঁকা নাকটাও জন্মসূত্রে পাওয়া। 'ইয়েস, সার?' প্রশ্ন করল সে।

'দুঃখিত,' বলল রানা, বিব্রত। 'আমারই ভুল, তুমি যাও।'

বিড় বিড় করে কিছু একটা বলে দ্রুত হেঁটে চলে গেল লোকটা। দু'জন আইএসআই এজেন্ট কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গোটা ব্যাপারটা দেখছিল, দু'জনেই রানাকে ব্যঙ্গ করে হেসে উঠল।

'আমি বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে আছি,' তাবাসসুমকে বলল রানা। 'লোকটা একেবারেই আলভির মত দেখতে নয়। তবে তোমাদের ফরেন মিনিস্টারের অফিস স্যুইটে যে জ্যানিটার ঢুকেছিল তার গায়ে সবুজ ইউনিফর্ম ছিল। এই লোকটার গায়ে সার্ভিং জ্যাকেট দেখে...'

থেমে গেল রানা। জ্যাকেট...একটা ইউনিফর্ম...নকল চুল।

ঝট্ করে ঘুরে দক্ষিণ-পুব দিকে তাকাল রানা, যেদিকটায় বেশ অনেক দূরে সারি সারি বহুতল ভবন আকাশ ছুঁয়েছে। খালি চোখে কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। এক পুলিসের অফিসারের দিকে ছুটল রানা। 'প্লীজ, একটু দেখি,' বলে প্রায় ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিল তার বিনকিউলার। মাথার ওপর দিয়ে আরেকটা হেলিকপ্টার যাচ্ছে, অফিসারের কথা কিছুই শুনতে পেল না।

'দুঃখিত,' বলে চোখে গ্লাস জোড়া তুলে সেই প্রকাণ্ড ছাদটার দিকে তাকাল রানা, কয়েকটা সুপারস্ট্রাকচার সহ যেটাকে রোজ গার্ডেন থেকে দেখেছিল ও।

এখন পাঁচতলা, আরও ছ'তলা ওপর থেকে দেখছে রানা, ফলে বিশাল ছাদের পুরোটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। এই মুহূর্তে ওখানে কোন রকম নড়াচড়া নেই। ছাদের আরও একটু দূরের মেঝেতে ফোকাস স্থির করল রানা, মনে হলো ওখানে কি যেন একটা বসানো হয়েছে। গ্লাস রি-অ্যাডজাস্ট করার সময় মুখের ভেতরটা শুকনো নিউজপ্রিন্ট হয়ে উঠল। ও তাকিয়ে আছে কোন ধরনের অস্ত্রের দিকে। সম্ভবত একটা মর্টার। আর সরাসরি এদিকেই সেটা তাক করা।

তারপর আবার নড়াচড়াটা ধরা পড়ল ওর চোখে। এ সেই লোকটাই, পুলিসের ইউনিফর্ম পরা: তবে এবার রানা কালো চুল,

গোঁফ, দেশলাইয়ের মত চৌকো কাঠামো, দীর্ঘদেহ–একে একে সবই লক্ষ করল। আর কোন সন্দেহ নেই। ও আলভি।

দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী একই মঞ্চে উপস্থিত; একজন মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন, আরেকজন পাঁচ হাত পিছনে সোফায় বসে হাসিমুখে শুনছেন। দূরের ওই ছাদ থেকে মর্টারটা সরাসরি এই মঞ্চের দিকে তাক করেছে আলভি। আরে, অবশ্যই তাই! প্রাইম মিনিস্টারের সরকারী বাসভবনে ঢোকার কোন প্ল্যানই সে করেনি। সামরিক ট্রেনিং নেয়া আছে, জানে কিভাবে দূর থেকে মানুষ মারতে হয়।

পুলিস অফিসারের হাতে বিনকিউলারটা ধরিয়ে দিল রানা। 'ধন্যবাদ।' লম্বা পা ফেলে হেঁটে এলো তাবাসসুমের সামনে। 'ওই বিল্ডিংটার নাম জানো,' নির্দেশ দিল তাকে, হাত তুলে দেখাল। 'ব্রিগেডিয়ার কাজেমিকে বলো মাঝারি পাল্লার একটা উইপন নিয়ে ওটার ছাদে রয়েছে আলভি। তারপর পাশের দালানের তিনতলায় গিয়ে মন্ত্রী-টন্ত্রী কাউকে ধরে বোঝাও যে অনুষ্ঠান বন্ধ করতে হবে। আরেকটা কথা। একটা হেলিকপ্টার তৈরি রাখতে বলো, আলভি পালাতে চেষ্টা করলে দরকার হবে। আমি তাকে ধরতে যাচ্ছি।'

কয়েকটা অভিজাত পাড়া ও রাস্তা পার হয়ে ওই দালানে পৌঁছতে হবে। আবাসিক এলাকার ফুটপাথে সকালের দিকে প্রচুর লোকজন। তাদেরকে ধাক্কা দিচ্ছে, কিন্তু ক্ষমা-প্রার্থনার সময় নেই। একটা সাইড স্ট্রীট পার হবার সময় পুলিস ভর্তি জীপ প্রায় গাঁয়ে উঠে পড়ছিল। অবশেষে পৌঁছল রানা। আবাসিক এলাকার ঠিক বাইরে দালানটা। একটা অসমাপ্ত হোটেল।

এলিভেটরের জন্যে রানা অপেক্ষা করছে যেন অনন্তকাল ধরে। টপ ফ্লোরে উঠল। তারপর সিঁড়ি ভাঙো। সিঁড়ির মাথা থেকে ছাদে বেরিয়ে আলভিকে দেখতে পেল মাত্র আঠারো কি বিশ গজ দূরে।

অস্ত্রটার ওপর ঝুঁকে পড়েছে সে, ফায়ার করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভয়াল ও কুৎসিতদর্শন তিনটে রকেট পড়ে রয়েছে ওটার পাশে। একটা রকেট মর্টার। তিনটে শেল থাকায় প্রাইম মিনিস্টারের তিনতলার লাউঞ্জে তৈরি মঞ্চটাকে উড়িয়ে দিতে আলভির ব্যর্থ হবার

কোন উপায় নেই। ঠিকমত লক্ষ্যস্থির করা হলে একটা শেলই লোকজন সহ গোটা মঞ্চ উড়িয়ে দেবে।

'হোল্ড ইট!' গর্জে উঠল রানা, হাতে বেরিয়ে আসছে ওয়ালথার।

আধ পাক ঘুরেই হাঁ হয়ে গেল আলভি। 'আবার তুমি!' দাঁতে দাঁত পিষে খেঁকিয়ে উঠল। প্রায় বিদ্যুৎবেগে বেল্ট থেকে একটা ব্রাউনিং অটোমেটিক বের করে আড়াল নিল মর্টারের পিছনে।

আলভি গুলি করতে যাচ্ছে দেখে পিছনের দেয়ালের গায়ে পিঠ সাঁটল রানা। ওর মাথার পাশে প্লাস্টার ভাঙল বুলেট, সিমেন্টের পাউডার সাদা করে দিল কাঁধ। পাল্টা গুলি করল ও, মর্টারের ব্যারেলে লাগায় তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ হলো।

আলভির কাছাকাছি আরেকটা সার্ভিস সুপারস্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে। আবার গুলি করল সে, টার্গেটে লাগল না দেখে আরও নিরাপদ কাভারের জন্যে ছুটল।

আলভি ছুটছে, রানা গুলি করছে–তার পায়ের দু'পাশের মেঝেতে ক্ষত সৃষ্টি হলো, একটা বুলেটও লাগল না।

'তোমার সময় শেষ, মোস্তাফা,' চিৎকার করে বলল রানা। 'ধরা দাও।'

আড়াল থেকে ঝুঁকে বেরিয়ে এসে গুলি করল আলভি। এবার তার বুলেট রানার কাঁধের ওপর জ্যাকেটের খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে গেল। জ্বালা অনুভব করল রানা। হাত তুলে জায়গাটা স্পর্শ করতেই উষ্ণ রক্তে ভিজে গেল আঙুলটা।

নিজেকে আবার আড়ালে সরিয়ে নিয়েছে আলভি। একটা বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে ঘুরছে রানা, তার দৃষ্টিপথ থেকে সরে যাবার চেষ্টায়। সাবধানে ও নিঃশব্দে সুপারস্ট্রাকচারটা ঘুরে এলো ও, দেখল সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রক্ত-মাংসের কিলিং মেশিন, পাকিস্তানী সামরিক জান্তার তৈরি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন–মাত্র পনেরো ফুট দূরে।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, কাঁকরে ঘষা খেলো একটা জুতো। ঘুরেই গুলি করল আলভি, তাক করার সময়ও নিল না। পিছিয়ে এসে আড়াল নিল রানা। ছুটন্ত পায়ের শব্দ পেয়ে দেয়ালের কোণ থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল, দেখল মর্টারের কাছে ফিরে যাচ্ছে সে।

মর্টারের পাশে থেমে হাতের অস্ত্র বেল্টে গুঁজল আলভি, তারপর ঝুঁকে একটা রকেট তুলল। বোঝাই যাচ্ছে যে মর্টারটা জায়গা মত তাক করার কাজ সেরে রাখা হয়েছে।

গুলি করল অথচ আলভি মরল না, এই মুহূর্তে এরকম ঝুঁকি রানা নিতে পারবে না। বেল্টে পিস্তল গুঁজে তার দিকে ছুটল ও। কামানের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল রকেট, ঠিক এই সময় আলভি আর তার মর্টারের গায়ে একই সঙ্গে ধাক্কা মারল রানা।

ঠেকানো গেল না, কামান গর্জে উঠল। ইসলামাবাদের আকাশে সাদা ধোঁয়ার রেখা তৈরি করে ছুটল রকেট। তবে ঠেকাতে না পারলেও, কামানের ব্যারেল সামান্য হলেও ঘুরিয়ে দিতে পেরেছে রানা।

রকেটটা প্রাইম মিনিস্টারের সরকারী বাসভনের পাশ ঘেঁষে ছুটে গেল, বিস্ফোরিত হলো কাছাকাছি ছোট একটা পার্ক এরিয়ায়।

চোখ দুটো রকেটের ভ্রমণপথ অনুসরণ করছে, রানার চোয়ালে একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়ে শরীরটা মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল আলভি। এক লাফে সিধে হলো সে। 'মউত তুমকো ইয়াহাঁ বুলায়া,' হিসহিস করে বলল সে, অর্থাৎ বলতে চাইল–মৃত্যু তোমাকে এখানে ডেকে এনেছে। হাতে আবার বেরিয়ে এলো ব্রাউনিং, রানার দিকে তুলছে।

গুলি করল আলভি,' রানা গড়ান দিল। বুলেটটা রানার পিছনের ছাদের কিনারায় লাগল। আলভি দ্বিতীয় গুলি করছে না। রোটরের বিকট আওয়াজ তুলে একটা হেলিকপ্টার উড়ে এলো, ঝুলে থাকল ছাদ থেকে মাত্র কয়েক ফুট ওপরে। ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ রানা, ঠিক সময়মতই পুলিসের কপ্টার পৌঁছেছে।

রশির মইটা নেমে আসছে দেখে রানার ভুলটা ভাঙল। অপেক্ষায় ছিল, ধরেই প্রায় তরতর করে উঠে যাচ্ছে আলভি। কপ্টারও এরইমধ্যে সরে যেতে শুরু করেছে।

আলভি আঁচড়াআঁচড়ি করে কেবিনে উঠে পড়ছে। রানার গুলি তাকে লাগল না। শব্দ শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখল আরেকটা হেলিকপ্টার ছুটে আসছে। খালি হাত তুলে নামার ইঙ্গিত করল রানা। ওটা পুলিসেরই। দু'এক মুহূর্ত ঝুলে থাকার পর নামল ছাদে।

ছুটল রানা, ঘুরন্ত রোটরের নিচে মাথা নামিয়ে খোলা দরজার ভেতর তাকাল। লাফ দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় পাইলট ছাড়াও তাবাসসুমকে দেখতে পেল ও। হাত তুলে আলভির কপ্টারটা দেখাল পাইলটকে, শহর থেকে বেরিয়ে পশ্চিমদিকে ছুটছে। 'ফলো ইট!' বলল ও।

ছাদ থেকে উঠে ইউ টার্ন নিয়ে ধাওয়া শুরু করল পুলিস কপ্টার। ইতিমধ্যে অনেক দূরে চলে গেছে ওটা, আকাশের গায়ে কালো একটা ফোঁটার মত দেখাচ্ছে।

ওদের কপ্টারের স্পীড বাড়াল পাইলট, সারি সারি পাহাড় ও গিরিখাদের ভেতর দিয়ে যাবার সময় দিক একটু বদলে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হলো, দুটো কপ্টারের দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে। পাইলট রেডিও অন করে যৌথ সিকিউরিটি কমিটির কন্ট্রোল রুমকে জানাল কি ঘটছে, তবে রানা জানে ব্যাপারটা সম্ভবত ওদেরকেই সামলাতে হবে।

রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছাতে দশ মিনিটও লাগল না। শহরের বাইরে বেরিয়ে আসার পর দুটো কপ্টারের মাঝখানে দূরত্ব দাঁড়াল একশো গজ। হাতের পিস্তল তুলে লক্ষ্যস্থির করল রানা। ভাবল, ইশ্, এখন যদি একটা রাইফেল থাকত হাতে! বিরতি না নিয়ে একটার পর আরেকটা, দুটো গুলি করল। লাগল বুলেট, কিন্তু এগুলো কপ্টারের কোন ক্ষতি করতে পারল না। আলভি আর তার পাইলটকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও।

'ওপেন ইট আপ!' পাইলটের দিকে ফিরে চিৎকার করল রানা।

দূরত্ব আরও খানিক কমল। দুটো কপ্টারই বাঁক ঘুরে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাচ্ছে, পিছিয়ে পড়ছে রাওয়ালপিণ্ডি। আফগান ও রুশ সীমান্ত ক্রমশ কাছে চলে আসায় স্বভাবতই রানা খুব উদ্বিগ্ন। আলভি যদি সীমান্ত পেরিয়ে অন্য কোন দেশে চলে যাবার প্ল্যান করে থাকে, ধরে নিতে হবে সেখানে ব্যবহারযোগ্য ফ্যাসিলিটি আছে তার, এমন কি ছদ্মনামে নাগরিকত্বও থাকতে পারে। রানা সীমান্ত পেরুনোর মত বেআইনী কাজ করতে চায় না, করলে যে লাভ হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।

রানা সিদ্ধান্ত নিল যা করার এখুনি করা দরকার। দূরত্ব পঞ্চাশ

গজের মধ্যে চলে আসতে নিচে ফাঁকা মাঠ আর ছোট্ট একটা গ্রাম দেখতে পেল ও। কপ্টার থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকল, তারপর গুলি করল আবার। এবার গ্যাস ট্যাংকে লাগাতে পেরেছে, কিন্তু কি কারণে কে জানে ফুয়েলে আগুন ধরল না। তবে ফুটো যখন একটা তৈরি হয়েছে, আলভির রক্ষা নেই।

রানা আশা করেছিল আলভিও পাল্টা গুলি করবে, কিন্তু করল না। সে হয়তো অ্যামো বাঁচাচ্ছে।

'ওকে এবার ল্যান্ড করতে হবে, সার,' রানাকে বলল পাইলট।

'দেখা যাক।'

পাইলটের কথাই ঠিক। সামনে ছোট একটা শহর দেখা যাচ্ছে, শহরের একটা ফাঁকা মাঠে নামছে আলভির কপ্টার।

'আমরা কি···এটা কি টাকসিলা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল তাবাসসুম।

মঠের পাশেই মেইন রোড, আরেক পাশে পাশাপাশি কয়েকটা কাঁচ ঘেরা শো-রুম, কার ও মোটরসাইকেল দেখা যাচ্ছে। শহর কিন্তু প্রায় ফাঁকা, লোকজন খুবই কম। টাকসিলা আসলে প্রাচীন কয়েকটা গ্রামের সমষ্টি, সেগুলোকে ঘিরে কয়েকটা ছোট শহর গড়ে উঠেছে শুধুই পর্যটকদের সার্ভিস দেয়ার জন্যে। যিশুর জন্মেরও ছ'শো বছর আগে পারস্য সাম্রাজ্যের অংশ ছিল টাকসিলা।

'নামাও আমাদের,' পাইলটকে নির্দেশ দিল রানা। 'তবে লক্ষ রাখো ও যেন সহজে আমাদেরকে টার্গেট করতে না পারে।'

আলভির কপ্টার মাটি ছুঁচ্ছে, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলো সে। পুলিসের কপ্টার নামল প্রায় ষাট গজ দূরে। পিস্তল রিলোড করছে রানা, কিন্তু ওদের পাইলট ধৈর্য হারিয়ে লাফ দিয়ে মাঠে বেরিয়ে এলো।

'মাথা নামাও!' রানার গলায় আর্তনাদ।

এরই মধ্যে দেরি হয়ে গেছে। একটাই গুলি করল আলভি, লাগলও সেটা সরাসরি পাইলটের বুকে—অকস্মাৎ যেন একটা ঘূর্ণিতে পড়ে মোচড় ও পাক খেলো তার শরীর, পা দুটো শূন্যে উঠে পড়ল।

মাথা নিচু করে ড্রাইভ দিল রানা, মাটিতে পড়ে স্থির হবার পর

দেখল রাস্তা পার হয়ে কয়েকটা গ্যারেজ ও শো-রুমের বাইরে দাঁড় করানো কার ও মোটরসাইকেলের দিকে ছুটছে আলভি।

পাইলটের ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা। জখম গুরুতর, তবে সময়মত হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে বেঁচে যাবার আশা আছে। ওয়াকি-টকির সাহায্যে আরেকটা হেলিকপ্টার ডাকতে বলে লোকটার কাছে তাবাসসুমকে থাকার নির্দেশ দিল রানা।

'কিন্তু তা কি করে হয়!' প্রতিবাদ জানাল তাবাসসুম, সুরে অসন্তোষের মাত্রা ক্ষীণ হলেও ধরা পড়ল রানার কানে। 'তোমাকে আমি একা যেতে দিই কিভাবে?'

'আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না,' বলল রানা, একটু কর্কশই শোনাল। 'তুমি পাইলটের একটা ব্যবস্থা না করে কোথাও যেয়ো না।'

রেগেমেগে কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে রাখল তাবাসসুম।

রাস্তার দিকে ছুটল রানা, দেখল একটা মোটরসাইকেলে উঠে স্টার্ট দিচ্ছে আলভি। তাকে ধরার জন্যে এতটাই মগ্ন ও মনোযোগী, কানের পাশ দিয়ে শিস বাজিয়ে বুলেটটা বেরিয়ে যাবার পর রানার মনে পড়ল আরও একজন পাইলট আছে। লোকটাকে দেখতে পেয়ে ছুটতে ছুটতেই ফায়ার করল ও। হোঁচট খেতে খেতে কয়েক পা পিছু হটল সে, মাটিতে পিঠ দিয়ে পড়ে আর উঠল না।

রানার ছোটার গতি আরও বাড়ল। তিনবারের চেষ্টায় স্টার্ট নিল আলভির মোটরসাইকেল, পাকা চত্বর থেকে রাস্তায় নেমে পশ্চিম দিকের পাহাড়ী রাস্তা ধরে ছুটছে।

রাস্তায় উঠে এসে থামল রানা, বাঁ হাতের ওপর পিস্তল ধরা ডান হাত রেখে গুলি করল। হোন্ডার হ্যান্ডেলের ওপর মাথা নামিয়ে রেখেছে আলভি, তা না হলে খুলিটা উড়ে যেত।

গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এসে মালিক-লোকটা কপাল চাপড়াচ্ছে দেখে তার দিকে এগোল রানা। 'চিন্তা কোরো না, তোমাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। আমরা পুলিসের লোক। ওটার এঞ্জিন কত সিসি ছিল?' আই.ডি. কার্ডটা বেরই করল শুধু, না দেখিয়ে আবার রেখে দিল

পকেটে।

'আশি সিসি, সার।'

'আরও শক্তিশালী কি আছে তোমার কাছে?'

''একশো সিসি।' হাত তুলে দেখাল গ্যারেজ মালিক।

'আমাদের লোক এসে তোমার ক্ষতির হিসাব করবে,' তাকে আশ্বস্ত করে বলল রানা। 'যদি পারো মাঠে আমাদের আহত লোকটার জন্যে একটা ডাক্তার ডাকো। দ্বিতীয় লোকটার কোন সাহায্য দরকার নেই।'

হ্যান্ডেলবার-এ একজোড়া গগলস্ ঝুলছে, ওটা পরে স্টার্ট দিল রানা। ডানে বা বাঁয়ে থাকল না ও, ব্যবহার করছে পুরো রাস্তাটা। আলভিকে ওর ধরতেই হবে, সম্ভব হলে অবশ্যই জ্যান্ত। যত ভয়ংকর আর নৃংশসই হোক, প্রকাশ হলে তার প্রতিক্রিয়া যতই ক্ষতিকর হোক, এমন কি জাতির সবাই জানতে পারুক বা না পারুক, সুযোগ পেলে অবশ্যই রানাকে জানতে হবে একাত্তর সালে স্পেশাল ক্র্যাক কমান্ডো ইউনিটের দুশো অমানুষ বাংলাদেশ জুড়ে ঠিক কি করে বেড়িয়েছিল। বেঁচে আছে এই একটাই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, রানা তাকে কথা বলাবার চেষ্টা করবে না?

ফাঁকা রাস্তা। কোন যানবাহন নেই। টাকসিলা থেকে আফগান সীমান্ত খুব কাছে, সেদিকেই যাচ্ছে আলভি।

হঠাৎ রিয়ার ভিউমিররে একটা কালো মার্সিডিজ দেখতে পেল রানা। তীর বেগে নয়, রকেটের বেগে পাশ কাটাল ওর মোটরসাইকেলকে। তাবাসসুম। কোন দিকে খেয়াল নেই, এক মনে গাড়ি চালাচ্ছে।

কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারল রানা। ডাক্তার পাওয়া গেছে, তার হাতে পাইলটকে তুলে দিয়ে শো-রুম থেকে একটা গাড়ি নিয়ে চলে এসেছে তাবাসসুম।

স্পীড বাড়িয়ে মার্সিডিজের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু তাবাসসুমের তাতে সমর্থন নেই, বোঝা গেল সে-ও স্পীড বাড়াতে।

সামনে আলভিকে এখন দেখা যাচ্ছে না। একটু পর মার্সিডিজকেও হারিয়ে ফেলল রানা—একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর, অকস্মাৎ, সামনের কোথাও থেকে ভেসে এলো পাকা রাস্তার সঙ্গে চাকার কর্কশ, গা রি-রি করা ঘর্ষণ আর প্রচণ্ড সংঘর্ষের আওয়াজ। রানার গলার কাছে কি যেন আটকে গেল। শব্দগুলোই বলে দিয়েছে মোটরসাইকেল নয়, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে বড় কোন গাড়ি। এ নিশ্চয়ই মার্সিডিজটা। তাবাসসুমকে বোধহয় আর জীবিত দেখা ওর কপালে নেই।

বাঁক ঘুরতেই ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখতে পেল রানা। এটায় নয়, পরবর্তী বাঁকের কাছে কাত হয়ে পড়ে আছে কালো মার্সিডিজ, একটা গাছকে প্রায় আলিঙ্গন করে থাকার ভঙ্গিতে। গাড়ির চাকাগুলো এখনও ঘুরছে। পাশ কাটাবার সময় স্পীড কমাল রানা, ওর মনের বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হলো—এ-ধরনের অ্যাক্সিডেন্টের পর কারও বেঁচে থাকা অসম্ভব। আলভির পিছু নিতে গিয়ে স্পীড না কমিয়ে বাঁক ঘুরতে চেষ্টা করায় অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছে। কিন্তু তাবাসসুমের চেষ্টা সফল হয়নি। রানা সিদ্ধান্ত নিল, লাশটা পরে উদ্ধার করবে; প্রথম কাজ আলভিকে ধরা।

পাহাড়ী রাস্তা এদিকে ঘন ঘন বাঁক নিয়েছে। স্পীড না কমিয়ে পাঁচ মিনিট ছোটার পরই আলভিকে দুশো গজ সামনের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা।

দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে, বুঝতে পেরে পাকা রাস্তা ছেড়ে মেটো পথ ধরল আলভি। পাথর ছড়ানো পথ, চওড়া হলেও ছোট ছোট গর্ত ভরা আর খুবই উঁচু-নিচু। দূরে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, মেটো পথটা ওই পাহাড়কে ঘিরে চোখের আড়ালে চলে গেছে।

পাহাড়টাকে পিছনে ফেলে এসে খোলা প্রান্তরে পড়ল ওরা। মাইলের পর মাইল পার হয়ে যাচ্ছে। তারপর সামনে পড়ল সমতল পাথরের বিস্তৃতি। প্রাচীন যুগের বহু প্রত্ন নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে। রানার মনে পড়ল টাকসিলা সারা দুনিয়ায় গান্ধারা (গ্রীকো-বুডিস্ট) শিল্প ও ভাস্কর্যের জন্যে বিখ্যাত। ঠিক এখানে না হলেও, কাছাকাছি কোথাও একটা মিউজিয়াম আছে। প্রাচীন পাথুরে শহরটায় চীনা পর্যটক ফা-হিয়ান চতুর্থ আর হিউয়েন-সাঙ এসেছিলেন সপ্তম খ্রিস্টাব্দে।

পাথুরে পাঁচিল, স্তম্ভ, ছাদের ভাঙা অংশ, সিঁড়ির ধাপ ইত্যাদির

পাশ ঘেঁষে যতক্ষণ পারা গেল মোটরসাইকেল চালাল আলভি, তারপর সেটাকে ফেলে ছুটোছুটি করে আড়াল নিল আর গুলি করে তফাতে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করল রানাকে।

রানাও মোটরসাইকেল ফেলে রেঞ্জের ভেতর পেতে চাইছে আলভিকে; শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবে এখুনি জানে না মেরে শুধু জখম করতে। সুযোগ আসছে, গুলিও করছে; তবে দু'জনের কেউই কাউকে লাগাতে পারছে না।

ঘেমে গোসল হয়ে যাচ্ছে রানা। সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে। দু'জনেই ওরা জানে কে কোথায় আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জায়গাটাকে প্রায় একটা গোলকধাঁধাই বলা যায়। সেজন্যেই রানাকে এখানে কৌশলে টেনে এনেছে আলভি। নিজের দেশের প্রাচীন সভ্যতার এই ধ্বংসাবশেষ তার চেনা, এখানের প্রতিটি পাথর, প্রতিটি গর্ত ও বাঁক তাকে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেবে।

প্রায় বিশ মিনিট ধরে লুকোচুরি খেলল ওরা। বুলেট বিনিময়ও কম হয়নি। মাঝখানে দু'জনকেই চমকে উঠে কিছুক্ষণের জন্যে থামতে হয়েছিল একটা হেলিকপ্টারের শব্দ শুনে। তবে সেটা কাছাকাছি বা এদিকে আসেনি। তারপরও বারো কি তেরো মিনিট পার হয়ে গেল।

এখন আবার একটা গুলি করল রানা।

আলভি পাল্টা গুলি না করায় ওর সন্দেহ হলো। সে কি আগের জায়গায় নেই? ঘুরে পিছন দিকে তাকাতে যাবে, বুঝল দেরি করে ফেলেছে।

'গুডবাই, রানা!' ওর পিছন থেকে বলল আলভি। ভাঙা পাথুরে পাঁচিলের আড়াল নিয়ে কখন এদিকে চলে এসেছে, রানা টেরই পায়নি।

জানে দেরি হয়ে গেছে, তবু ঘুরল রানা। গুলিও করল। কিন্তু জায়গামত লাগল না বুলেট। সোজা গিয়ে বিঁধল আলভির বাম কাঁধে। প্রায় একই সঙ্গে গুলি করেছিল প্রাক্তন কমান্ডো, কাঁধে গুলি খেয়ে কেঁপে ওঠায় গুলি চলে গেল রানার কয়েক হাত পাশ দিয়ে। জঘন্য ভাষায় বাপ-মা তুলে গালি দিয়ে উঠল আলভি। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ, আবার তুলল পিস্তল। রানা জানে ওর পিস্তলে আর গুলি

নেই, কাজেই ছুঁড়ে মারল ওয়ালথারটা ওর বুক লক্ষ্য করে। পাশ কাটাবার চেষ্টাও করল না আলভি, বুক পেতে নিল আঘাতটা।

'বিদায় রে, বেজন্মা বঙ্গালী!' ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল আলভির মুখে। 'শালারা পাকিস্তান ভেঙেছো, না? দেশটাকে হিন্দুস্থানের করদ রাজ্য বানিয়েছো, না? কিন্তু মরার আগে জেনে যা, পাকিস্তান এক হাজার বছর পর হলেও ঠিকই একদিন বাংলাদেশকে দখল করে আবার পূর্ব-পাকিস্তান বানাবে। তখন তোরা যারা হিন্দু হয়ে গেছিস তাদের নুনু কেটে মুসলমান বানাব আমরা। তবে তোকে হিন্দু হয়েই মরতে হবে। এখুনি নে, মর!' ট্রিগার টেনে দিচ্ছে আলভি।

হাসছে রানাও। হাতে বেরিয়ে এসেছে ছুরিটা।

'আউট-অভ-প্র্যাকটিস হয়ে পড়েছ, আলভি। ঢিলে হয়ে গেছ তুমি। হিসেব নেই যে, তোমার পিস্তলেও আর গুলি নেই। বলো এখন, সারেন্ডার করবে, নাকি ছুরি খেয়ে মরবে?'

'ভাঁওতাবাজির জায়গা পাস না, শালা?' বলেই ট্রিগারে টান দিতে গেল ও। ঠিক তখনই গুলির আওয়াজ এলো পিছন থেকে। শব্দটা প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ে পাহাড়ে। চমকে পিছন ফিরল আলভি।

দাঁড়িয়ে আছে একটা পাথরের পিলারের পাশে, হাতে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন; পিস্তলের মাজল থেকে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে, আর তাবাসসুমের চোখে-মুখে আশ্চর্য এক দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ। দুর্ঘটনায় মারা তো যায়ইনি, আহতও হয়নি সে। হেলিকপ্টারটা সম্ভবত তাকেই পৌঁছে দিয়ে গেল একটু আগে।

খেঁকিয়ে উঠল আলভি, অশ্রাব্য খিস্তি করল, ব্রাউনিং ঘুরিয়ে লক্ষ্যস্থির করল তাবাসসুমের দিকে।

তাবাসসুমের গুলিটা আলভিকে লাগেনি। লাগার কথাও নয়, কারণ দু'জনের মাঝখানে দূরত্ব খুব বেশি।

দ্রুত কাজ সারার তাগিদ অনুভব করল আলভি, ঝট্ করে ফিরল আবার রানার দিকে, রানাকে শেষ করে তারপর সামাল দেবে তাবাসসুমকে। ট্রিগার টিপেই কালো হয়ে গেল ওর মুখ।

পিস্তল খালি। গুলি শেষ, খেলাও শেষ। কয়েকবার ট্রিগার টানল সে, তারপর পিস্তল ফেলে বের করল ওর কমান্ডো নাইফ।

এগিয়ে আসছে তাবাসসুম, হাসছে। ওকে পিস্তল ধরা হাত উঁচু করতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল রানা।

'গুলি কোরো না, তাবাসসুম!'

রানার কথা যেন শুনতে পেল না মেয়েটা, চোখ দুটো আলভির ওপর স্থির।

'না! তাবাসুসম, না!' আবার চেঁচাল রানা।

ট্রিগারে চাপ দিল তাবাসসুম।

ঠিক এই সময় আড়াল পাবার আশায় লাফ দিল আলভি। কিন্তু বৃথা।

মাথায় ও বুকে, বুকে ও মাথায়; চারটে বুলেট। যেন আগে থেকে করে রাখা একটা হিসাব, একটা ছক, একটা···ষড়যন্ত্র? হ্যাঁ, তা-ও বলা যায়। তবে ব্যাপারটা রানা উপলব্ধি করতে পারল। নিজের দেশকে ভালবাসে তাবাসসুম; জাতির দুরপনেয় কলংক যতটা পারা যায় অপ্রকাশিত রাখতেই তো চাইবে সে।

এক হাত দিয়ে ইশারা করে নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকার অনুরোধ করল তাবাসসুম। শেষ ও পঞ্চম গুলিটা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা প্রায় মৃত আলভির কপালে মাজল ঠেকিয়ে করল সে।

কাছে এসে রানা বলল, 'কাজটা তুমি ভাল করলে না, তাবাসসুম। ওর সঙ্গে আমার কথা ছিল।'

'আমার ছিল না,' বলে ঘুরল তাবাসসুম। 'এসো।'

নিজের মোটরসাইকেলের কাছে ফিরে এসে রানা বলল, 'নিরস্ত্র অবস্থায় ওকে তুমি ওভাবে মেরে না ফেললেও পারতে,' তাবাসসুম। 'খুব ভাল হত ওর বিচার শুরু করা গেলে। অনেক গোপন তথ্য বেরিয়ে আসত, জানা যেত অনেক ওঅর ক্রিমিন্যালের পরিচয়···'

রানার মুখে হঠাৎ হাত চাপা দিল তাবাসসুম। 'একবাক্যে, অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি, এসপিওনাজ জগতের সুপারস্টার তুমি। কিন্তু রাজনীতি, অন্তত পাকিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই তুমি জানো না।'

'একটু যদি জানাতে,' এই মুহূর্তে রানা বিনয়ী।

'আমরা মধ্যযুগীয়, ধূর্ত, কর্কশ একটা জাতি, রানা,' বলল

তাবাসসুম। 'আমরা এখনও অন্ধকার যুগে বাস করছি।'

'আমি ঠিক এ-ধরনের কথা তোমার মুখ থেকে শুনব বলে আশা করিনি,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'তাছাড়া আমার রাজনীতি না বোঝার সঙ্গে তোমার এই উত্তরের কোন সম্পর্কও খুঁজে পাচ্ছি না।'

'আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ, তাদের সংখ্যা খুবই কম,' বলল তাবাসসুম, 'এই জাতিকে আলোর পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। আমি তাদের একজন বলে নিজেকে দাবি করি না, দাবি করি তাদের একজন নগণ্য অনুসারী বলে। এর মানে বোঝো, রানা?'

'না বললে কি করে বুঝব?'

'এর মানে হলো, যত খারাপই হোক, এটা আমার দেশ, আর আমি এই দেশটাকে ভালবাসি।' তাবাসসুমের চোখে-মুখে আশ্চর্য এক আলো ফুটে উঠেছে। 'আশা করি এর বেশি আর কিছু বলার দরকার নেই তোমাকে। তুমি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই পেয়ে গেছ।'

দু'জন দুটো মোটরসাইকেল নিয়ে রওনা হলো ওরা। একই পথ ধরে ইসলামাবাদ ফিরছে, কিন্তু ফিরছে ওরা দুই দুনিয়ায়। রানা ভাবছে, তাবাসসুম গুণী মেয়ে, ওকে আমি পছন্দ করি। তবে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, কারণ আমার সামনে কখনোই পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারবে না সে। আর তাবাসসুম ভাবছে, বিরল প্রজাতির আদর্শ একজন পুরুষমানুষকে পেলাম ঠিকই, কিন্তু ওকে যত তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলব ততই ভাল—কারণ আমাকে দেখলেই কষ্ট হবে ওর, মনে পড়ে যাবে জাতি হিসাবে আমরা ওদেরকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলাম।

দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বাংলাদেশের ন্যায্য পাওনা মেটানোর শর্ত ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে খসড়া চুক্তিটি চূড়ান্ত করা হলো, আনুষ্ঠানিকভাবে সেই চুক্তিতে তাঁরা স্বাক্ষরও করলেন। তবে টাকাটা পাবার জন্যে বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হবে, যতদিন বর্তমান প্রাইম মিনিস্টারের রাজনৈতিক দল পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারে। বলাই বাহুল্য যে চুক্তিটা সই করাতে পারায় ব্যাপারটাকে বাংলাদেশী কূটনীতির বিরাট

একটা সাফল্য হিসাবে গণ্য করা হবে, বিশেষ করে এতদিন যেখানে পাকিস্তান স্বীকারই করতে চায়নি যে বাংলাদেশ আদৌ কোন সম্পদ বা টাকা পাবে।

লাভ আরও একটা হয়েছে। বাংলাদেশ এখন দুটো খুদে অ্যাটম-বোমার অধিকারী, বিসিআই সেগুলো লুকিয়ে রেখেছে পাকিস্তানেরই মাটিতে। বাংলাদেশ পারমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র তৈরি ও মজুদের বিরোধিতা করে; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের ওপর অহেতুক যেভাবে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার পাঁয়তারা কষছে, তার মধ্যে অত্যাচারী ইজরাইলকে প্রশ্রয় দিয়ে মুসলমানদের এক হাত দেখে নেয়ার সুস্পষ্ট হুমকিও রয়েছে–কাজেই বোমা দুটো থাক। কখন কি কাজে লেগে যায়!

***

সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে

উড়ন্ত সসার, যৌন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান, আমি গুপ্তচর

বিশেষ দ্রষ্টব্য

ভলিউম ও রিপ্রিন্ট বাদে সেবা প্রকাশনীর প্রকাশিত গত চার বছর আগের প্রায় সকল বই পাঠক-পাঠিকার জন্য বিশেষ বর্ধিত কমিশনে বিক্রি হচ্ছে। আজই যোগাযোগ করুন। এই সুবিধা সীমিত সময়ের জন্য। অফিস চলাকালীন সময় সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।